ভগবানও ভুল করেন বৈ কি! সাধারণ মানুষের ভুল একদিন
রে নেওয়া যায়, বড় জোর তা অল্প দুচার জনের জীবনে বিপর্যয়
ষ্টি করে। তাদের সে ব্যথা-বেদনা আঘাত সংঘাতের ইতিহাস
রিয়ে যায় তাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু ভগবানের ভুল
ক একটা দেশ এক একটা জাতির জীবনে তার সাক্ষ্য রেখে যায়,
দূর ও অনাগত ভবিষ্যৎ সে ভুলের পরিণাম বহন করে; মানুষের
ইতিহাস থেকে মোছে না তার চিহ্ন।

বিশিষ্ট মানুষ যখন মর্ত্যভূমে আসে তখন সে সৃষ্টিকর্তার বিশেষ
নদ নিয়ে আসে। যে জননায়ক হবে, যে জাতির নেতা হবে,
শের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজন করবে, ঘুরিয়ে দেবে জাতীয়
বনের মোড়, তাকে তার কর্ম ও কীর্তির উপযুক্ত হাতিয়ার দিয়েই
ঠাতে হয়; তার চরিত্র, তার মেধা, তার বুদ্ধি, তার বীর্য ও শৌর্যই
তার সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া বিশেষ সনদ, শানিত হাতিয়ার।
তোর এমন মানুষ যখন সৃষ্টি করেন বিধাতা তখন তার উপযুক্ত সঙ্গিনীও
ন করেন। কিন্তু কখনও কখনও দৈবের যোগাযোগে সে সঙ্গিনীর
তির মিলন ঘটে না, বিশ্ববিধাতার সামান্য অনবধানতায় যাদের
ক্ত হবার কথা তারা পরস্পরের থেকে ছিটকে চলে যায়
আয় কোন্ দূরে, হয়ত এ জীবনে কোনদিন আর মিলতে পারে
তার মিলেও সঙ্গিনী হিসেবে কাজে লাগে না, জীবনের জ্বালা আর
রা যায়

গজনফর জঙ্গ্—তার হাতে তাঁরা তো বন্দীই হয়েছিলেন সকলে। তখনই নিহত হবার কথা, শুধু গজনফর জঙ্গের অতিরিক্ত লোভই তাঁদের বন্দীদশা বিলম্বিত করেছিল। কী মূল্যে এতগুলি প্রাণ বেচতে পারেন সেইটেই যাচাই ক'রে দেখছিলেন গজনফর জঙ্গ্। বাদশা মহম্মদ শা যদি একটু ত্বরা করতেন তাহলে পেশোয়া বাজীরাও-এরও সাধ্যের অতীত হয়ে পড়ত তাঁদের বাঁচানো। সে সুযোগই পেতেন না তিনি।

সে হয়ত ভাগ্যেরই ফল—তবু পেশোয়া বাজীরাও যে সেই ভাগ্যেরই দূত হিসাবে এসেছিলেন সে কথা ভুললে তাদের ধমনীর রাজপুত রক্ত, ক্ষত্র রক্তকেই অস্বীকার করা হবে যে! চারিদিকে অন্ধকার দেখে রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা গোপনে স্বীয় বন্দীদশা থেকে তাঁকে যে দুই ছত্র চিঠি পাঠান সে চিঠিও দেখেছেন রাজকুমাররা। একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গিয়েছিল হয়ত—সেটা আজ মনে হচ্ছে কিন্তু সেদিন মনে হয় নি। বিপুল বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি, সিংহাসন, রাজ-ঐশ্বর্য সবই যেতে বসেছিল সেদিন—গিয়েই তো ছিল কার্যত—তার সঙ্গে এতগুলি প্রাণ; স্বর্গত রাজা চম্পৎ রায় বুন্দেলার বংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত—যদি বাজীরাও না এগিয়ে আসতেন। চিঠি যখন পাঠানো হয় তখন ওঁদের চরম আপৎকাল—তখন তো কিছুই বাড়াবাড়ি বলে মনে হবার কথা নয়—তারপরেও হয় নি। প্রাণ মান সিংহাসন—এতগুলি যিনি তাঁদের দান করেছেন, যে রাজ্যখণ্ড অনায়াসে নিজেই রেখে দিতে পারতেন, অন্তত আশ্রিত বা করদরাজ্য হিসাবে স্বীকার করিয়ে নিতে পারতেন—সেই রাজ্য বিনাশর্তেই যে বিজয়ী দিয়ে দেয়—বর্তমান কালের লোভ-লোলুপতা-উদগ্রলালসার দিনে সে লোক নারায়ণ ছাড়া কি?

হ্যাঁ—নারায়ণই বলেছিলেন বাজীরাওকে রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা। পুরাকালে যেমন অভিশপ্ত গজেন্দ্রকে উদ্ধার করবার জন্য* নারায়ণ

*দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যভারতে এই বিচিত্র পৌরাণিক কাহিনীটির প্রভাব খুব

আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই ভাবেই বাজীরাওকে এই সংকটকালে আবির্ভূত হবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন রাজা ছত্রসাল। লিখে পাঠিয়েছিলেন ঃ—

"যো গত গ্রহ গজেন্দ্র কী, সো গত ভাই হে আজ।
বাজী যাত্ বুন্দেলাক্কী—রাখো বাজী লাজ ॥"

অর্থাৎ "পুরাকালে গজেন্দ্রর যে অবস্থা হয়েছিল—আজ আমরাও সেই অবস্থা। বুন্দেলার বিজয় গৌরব আজ যেতে বসেছে, হে বাজীরাও, তুমি তার লজ্জা নিবারণ করো।"

তা নারায়ণের সঙ্গে উপমা করা কিছু অন্যায়ও হয় নি ছত্রসালের। ঐ দুটি ছত্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিন ত্রাণ-কর্তা বিষ্ণুর মতোই এসে পড়েছিলেন তরুণ পেশোয়া। বহু কষ্ট স্বীকার ক'রে বহু বিপদ তুচ্ছ ক'রে উদ্ধার করেছিলেন ওদের প্রাণ, ওদের সিংহাসন—ওদের ইজ্জৎ। এবং বিনা শর্তেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই রাজ্যাধিকার, যার সবটাই তিনি রাখতে পারতেন—অন্তত তার ওপর খানিকটা অধিকার কায়েম করতে পারতেন।

সেদিন সে জয়লাভ খুব সহজসাধ্য ছিল না। বাজীরাও অনেকখানিই ঝুঁকি নিয়েছিলেন। মহম্মদ খাঁ এমনভাবে নিজের শক্তি সুদৃঢ় করেছিলেন, ওদের কারাজাত ক'রে এমন ভাবেই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে আত্মরক্ষার জন্য প্রথমটা তেমন কোন চেষ্টাও করেন নি। মহম্মদ শাহ্ বাদশাও সময় থাকতে কোন সাহায্য পাঠানো উচিত বিবেচনা করেন নি। তিনি যেন এটাকে স্বাভাবিক, তাঁর প্রাপ্য বিজয় বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত মহম্মদ খাঁর স্ত্রী ও পুত্রের প্রাণপণ চেষ্টায় মহম্মদ খাঁর প্রাণটা যখন রক্ষা হ'ল, বাদশা তখন বিরক্ত হয়ে ওঁকে বরখাস্তই ক'রে দিলেন, কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখালেন না।

বেশী। যেখানেই নারায়ণ বা বিষ্ণুমূর্তি আছে সেখানেই একদিন তাঁর গজোদ্ধার বেশের ব্যবস্থা করা হয়। মাঘী-পূর্ণিমার দিন পুরীতে জগন্নাথদেবের ঐ বেশ হয়।

সুতরাং খুব সহজ ছিল না, খুব সহজ হয় নি বাজীরাও-এর—তাঁদের উদ্ধার করা।

অবশ্য এতটার জন্য যেমন প্রস্তুত ছিলেন না ছত্রসাল—এতখানি উদারতা ও মহানুভবতার জন্য—তেমনি তিনিও কিছুমাত্র পিছিয়ে আসেন নি তার মূল্য দিতে, নিজের ঋণ স্বীকার করতে। তরুণ বাজীরাওকে পুত্র বলে, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুত্র বলে বুকে টেনে নিয়েছিলেন, সর্বসমক্ষে তাঁর দুই প্রিয় পুত্র হৃদয় শা ও জগৎরাজের সঙ্গে সমান ভাগ ক'রে এক তৃতীয়াংশ রাজ্য দান করেছিলেন। সে বড় কমও নয়—সাগর, কালপী, ঝাঁসী, সিরোঞ্জ, হারাদ বা হৃদয়-নগর—ভাল ভাল জায়গাগুলি দিয়েছিলেন বাজীরাওকে।

সে-দান মাথা পেতেই নিয়েছেন বাজীরাও। পিতা বলে সম্বোধনও করেছেন রাজা ছত্রসালকে। সবিনয়ে, রাজার পিছনে পিছনে তাঁর অন্য পুত্রদের সঙ্গে বিজয় শোভাযাত্রার অংশ হিসেবেই সসৈন্যে ও সপার্ষদ আজ রাজধানী পান্নায় প্রবেশ করেছেন,—দরবার কক্ষে তিনিই প্রথম রাজাকে প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কৈ, কোথাও তো তার মধ্যে এতটুকু বেসুর বাজে নি।

তবে? তবে এমন কেন হ'ল?

এতদিন ও এতক্ষণ ধরে সবদিক বজায় রাখার পর এ কী ক'রে বসলেন বাজীরাও! হঠাৎ এমন সাংঘাতিক অপমান করে বসলেন রাজাকে! আর ঠিক সেই মুহূর্তে—যখন তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দেখাতে উদ্যত হয়েছেন প্রবীণ রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা!

প্রথম দরবার ভঙ্গ হবার পর বাজীরাওকে সসম্মানে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে এসেছেন ছত্রসাল। মধ্যাহ্ন ভোজনের আমন্ত্রণ। পান্নার রাজপ্রাসাদকে লোকে এমনিই ইন্দ্রভুবনের সঙ্গে তুলনা দেয়। সেই রাজপ্রাসাদেরও বিস্ময় এই দরীখানা ভোজন-মহল। তার মধ্যে দুটি সুবর্ণমণ্ডিত আসনের সামনে

সোনার চৌকীতে পাশাপাশি দুটি লোকের আহার্য সাজানো। উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃতে প্রস্তুত রাজভোগ। রাজার নিজস্ব সূপকার কর্তৃক প্রস্তুত। দুটি মাত্র লোকেরই ব্যবস্থা। বাকী যাঁরা, তাঁরা এই জায়গার এক ধাপ নিচে বসবেন। তাঁদেরও অন্নব্যঞ্জন সাজানো হয়েছে। এঁরা বসলে তাঁরা গিয়ে নিজেদের আসন পরিগ্রহণ করবেন। এখানে তাঁদের বসবার অধিকার নেই। কোন দিনই এখানে আর কেউ বসে না, শুধু আজই দুজনের মতো ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পান্নার রাজপ্রাসাদের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। রাজা এখানে একক, স্বতন্ত্র। ঈশ্বরের মতোই একক। ঈশ্বরের মতোই সর্ব উর্ধ্বে। কখনও কোনদিনই কেউ তাঁর পাশে বসে খায় না। যত সম্মানিত অতিথিই হোক না কেন একটু ব্যবধান থাকেই। রাণীদের তো এখানে প্রবেশাধিকারই নেই। এ দরবারী ভোজকক্ষ বিশেষ বিশেষ দিনে ব্যবহার করা হয় শুধু। রাজা যেদিন অন্তঃপুরে নিভৃতে আহার করেন—সেদিন রানীরা সামনে উপস্থিত থাকতে পারেন, মাত্র ব্যজনকারিণী বা তদ্বিরকারিণী হিসাবে—রাজার সঙ্গে বসে খাওয়ার কথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না।

কিন্তু এতদিনের ঐতিহ্য ভাঙ্গা হ'ল যাঁর জন্য—তিনি এ সম্মানের অভাবনীয়তায় অভিভূত হওয়া তো দূরের কথা, সে সম্মান রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। একবার এক নজর মাত্র চারদিকে দেখে নিয়েই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন, তারপর মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে ধীরে ধীরে অথচ বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন, 'ক্ষমা করবেন মহারাজ, আপনার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে আমি খেতে পারব না। শুনেছি আপনার মুসলমানী উপপত্নী আছে, কখনও কখনও আপনি তার মহলে বসে পান-ভোজনও করেন। আমি ব্রাহ্মণ, ভগবান্ গণপতির সেবক—রণে বনে দুর্গমে কখনও ত্রিসন্ধ্যা পালনে ত্রুটি করি নি, আমি আপনার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে ঐ আহার্য আমার

ইষ্টকে নিবেদন করলে ভগবান গণপতি রুষ্ট হবেন—সমাজে আমার দুর্নাম হবে। আমি রাজার অমাত্য, দেশের শাসক—দেশবাসীরা আমাকে জাতীয় নেতা বলে মনে করেন। আমি স্বধর্ম-ও আচার-বিচ্যুত হ'লে তাঁরা আমাকে হীন-চক্ষে দেখবেন। আপনি বসুন, আপনার সম্মানরক্ষার্থ আমিও আপনার পাশে বসছি কিন্তু দয়া ক'রে ও অন্ন আমাকে গ্রহণ করতে বলবেন না।'

অনেকক্ষণ দেরি লাগল এই আঘাত সামলে উঠতে। অশীতিপর রাজা ছত্রসালের আরক্ত মুখে দেখতে দেখতে বিন্দুবিন্দু ঘর্ম জমে উঠল, রাজকুমাররা অধীরভাবে নিজেদের ঠোঁট নিজেরা কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুললেন, উপস্থিত কোন ব্যক্তিই এ রূঢ় অসৌজন্য বরদাস্ত করতে পারলেন বলে মনে হ'ল না। চারদিকেই আরক্ত মুখ, উত্তেজিত দৃষ্টি। একে অতিথি তায় মহা-উপকারী ত্রাণকর্তা, নইলে পেশোয়া বাজীরাও যতই শক্তিশালী হোন না কেন আজ অক্ষতদেহে এখান থেকে ফেরা সম্ভব হ'ত না।

কিন্তু দেখা গেল রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা বৃথাই এই দীর্ঘকাল রাজনীতি নিয়ে চর্চা করেন নি বা বৃথাই বাদশা আলমগীরের সঙ্গে দেশে দেশে লড়াই ক'রে বেড়ান নি। তাঁর নিজের স্নায়ুর ওপর দখল অপরিসীম, আত্মদমনের ক্ষমতা অত্যাশ্চর্য। উপস্থিত সকলে তাঁর ওপর যে এই অপমানের প্রতিক্রিয়া আশঙ্কা করেছিল তার কিছুই হ'ল না। তিনি অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়লেন না, বা একটি কঠিন বাক্যও উচ্চারণ করলেন না ; এই অকারণ অপমানের উত্তরে অতিথিকে অধিকতর অপমানিত করবারও চেষ্টা করলেন না। তাঁর গৌরবর্ণ মুখের সে রক্তোচ্ছ্বাস যেমন এসেছিল তেমনিই মিলিয়ে গেল। সে জায়গায় ফুটে উঠল অতি মধুর একটি রহস্যময় হাসি।

হেসেই বললেন রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা, 'আমারই অন্যায় হয়েছিল বৎস, তোমাকে আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল আমার।

কিন্তু এই মধ্যাহ্নে অভুক্ত ফিরে যাবে—। তা আমার তোষাখানে দেববিগ্রহ আছেন, তাঁর নিত্য সেবা ভোগ হয়। সেখানে যদি তোমাকে প্রসাদ দেবার ব্যবস্থা হয়—আপত্তি আছে কি?'

রাজার ধৈর্য ও সহ্যগুণে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলেন। এতটা তাঁরা সুদূর কল্পনাতেও আশা করেন নি। বিস্মিত হলেন পেশোয়া বাজীরাও নিজেও। তিনি এতগুলি আরক্ত উত্তেজিত ও বিদ্বিষ্ট দৃষ্টির সামনে উদ্ধত শির সোজা ক'রেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই সুমিষ্ট হাসির সামনে মাথা নামাতে বাধ্য হলেন। একটু লজ্জিতও হলেন বোধ হয়। ঘাড় হেঁট ক'রে বললেন, 'সেখানে যাবার দরকার হবে না—যদি প্রসাদ দেন, এইখানেই আমি একটু দূরে বসছি। এক পংক্তি না হ'লেই হ'ল।'

'বেশ তো। সে তো আরও আনন্দের কথা।' প্রশান্ত মুখে রাজা উত্তর দিলেন।

সেই মতোই ব্যবস্থা করা হল।

রাজার ইঙ্গিতে আগেকার সাজানো খাদ্য সামগ্রী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। একটু দূরে—রাজা ও রাজপুত্রদের মাঝামাঝি নতুন ক'রে আসন পাতা হ'ল একটি। তারপর পূজারী ব্রাহ্মণ এসে পলাশ পাতায় সাজিয়ে দিয়ে গেল নানা রকমের পাকা প্রসাদ। বাজীরাও ওদিক থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে সে আসনে বসলেন।

এতক্ষণ সকলেই অন্নব্যঞ্জন সামনে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। অতিথি আসন পরিগ্রহ করতে তাঁরাও যে যার আসনে বসলেন। শুধু দেখা গেল যে ইতিমধ্যে এঁদের সকলকারই যেন আহারে রুচি চলে গিয়েছে। আহার্য নিয়ে নাড়াচাড়াই করলেন সকলে। শুধু ধীরে সুস্থে আহার করলেন পেশোয়া বাজীরাও এবং বর্ষীয়ান রাজা ছত্রসাল। এঁদের কোন রকম ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

আহারান্তে বিদায় নেবার সময় আর একবার মিষ্ট মধুর

হাসলেন ছত্রসাল। বললেন, 'বৎস তুমি তো ভক্ত মানুষ, আজ একবার সন্ধ্যার পর আমাদের মন্দিরে এসো না। আজ অনন্তচতুর্দশী —সন্ধ্যারতির পর ভজন গান হবে, কিছু কিছু নৃত্যাদির ব্যবস্থাও আছে। এলে খুশীই হবো।'

অতিথি ও উপকারীর প্রতি অসৌজন্য প্রকাশে বিরত থাকা এক জিনিস, আর অপমানকারীর প্রতি অকারণ সৌজন্য প্রকাশ করা অন্য জিনিস। এ আমন্ত্রণের কোনই হেতু ছিল না। রাজকুমার-সেনাপতি-অমাত্যের দল বিস্মিত হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, অদম্য উষ্মায় হৃদয় শার রগের শিরা দুটো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। জগৎরাজ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন।

কিন্তু বাজীরাও এসব কিছুই লক্ষ্য করলেন না। করবার কথাও নয়। হয়ত বা তখন তিনি নিজের রূঢ় আচরণের জন্য কিছুটা অনুতপ্তও হয়েছেন। তাই যে কোন রকমে হোক, তখন ছত্রসালের সামান্য একটু আনুগত্য দেখাতে পারলে বা প্রিয় আচরণ করতে পারলেও বেঁচে যান যেন। তিনি সাগ্রহে সম্মতি জানালেন, 'নিশ্চয় আসব। এ তো আনন্দের কথা।'

'বেশ, তবে তুমি এখন বিশ্রাম করগে যাও। যথাসময়ে আমার লোক গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসবে।'

তারপর—পাছে অন্য কোন কুটিল সংশয়ের বীজ কোথাও অঙ্কুর তোলে তাঁর পুত্রসম অতিথির মনের মধ্যে—বর্তমান কালের রাজনীতিতে এ ধরণের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস বিরলও নয়—তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, 'তুমি একাই বা কেন, তোমার সঙ্গী সহচর বয়স্য বা সহকর্মীদেরও—যাদের আনতে চাও অনায়াসে আনতে পারো। আমার অমাত্য গিয়ে তাঁদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসবেন।'

'যে আজ্ঞে।' বলে মাথা নত ক'রে রাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেলেন তরুণ মারাঠি নেতা—পেশোয়া বাজীরাও।

॥ ৩ ॥

বিরাট মন্দির—সবটা জড়িয়ে। প্রকাণ্ড গর্ভদেউল বা মণিকোঠা; তার সামনে প্রশস্ত ও বিস্তৃত বারান্দা। সেইটেই নাটমন্দিরের কাজ করে। কিন্তু সেখানে নিম্ন বর্ণের বা অহিন্দু দর্শকের ওঠা নিষিদ্ধ। তাই তার খানিকটা নিচে, কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে বিস্তৃততর ও প্রশস্ততর প্রাঙ্গণ। এইখানে দাঁড়িয়েই জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রজারা বিগ্রহ দর্শন করেন। আরতি বা শৃঙ্গার দেখার ঔৎসুক্য অহিন্দু প্রজাদেরও কম নয়।

আজ কিন্তু এখানে ঠিক আপামর সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। আজ ওপরের বারান্দা বা নাটমন্দিরে হয়েছে বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথিদের বসবার বন্দোবস্ত। গোটা নাটমন্দির জোড়া দুগ্ধ-শুভ্র ফরাসের ওপর ভেলভেটের কার্পেট বিছিয়ে তিনটি পৃথক শয্যা বা আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার একটিতে বসবেন মারাঠী অভ্যাগতরা, একটিতে বসবেন সপার্ষদ রাজা ছত্রসাল এবং মধ্যেরটিতে বসবেন বিখ্যাত ভজনগায়ক রামদাস ও তাঁর সঙ্গতীরা।

আর নিচের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ জুড়ে আর একটি বড় আসর পড়েছে। সে আসর দেখলেই বোঝা যায় যে শুধুই গীত নয়—কিছু কিছু নৃত্যেরও ব্যবস্থা আছে আজ। মাঝের প্রশস্ত শয্যাটির যত্নকৃত মসৃণতার দিকে চাইলে সে সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকে না। তাছাড়া নাচের আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্রও সাজানো রয়েছে সে শয্যার এক কোণে। সেই বিশেষ শয্যার চারিপাশ ঘিরে আমন্ত্রিত বা রবাহুত বিশিষ্ট নাগরিকদের বসবার স্থান করা হয়েছে।

সন্ধ্যারতির পর আরম্ভ হ'ল ভজন। সুললিত কণ্ঠের ভক্তিতদ্গত নামগানে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হলেন। বাজীরাও যদিচ একাধারে কূট-রাজনীতিক এবং বীর যোদ্ধা—বয়সের তুলনায় অনেক বেশী

শা[redacted] বুদ্ধিমান—তবু তিনিও মনে-প্রাণে ভক্ত মানুষ। ভজন শুনতে শুনতে তাঁরও নিমীলিত নেত্র জলে ভরে আসতে লাগল বারবার।

তন্ময় হয়েই শুনছিলেন তাই লক্ষ্য করেন নি কখন নিচের আসরে শিল্পীরা এসে আসন পরিগ্রহণ করেছেন—শুরু হয়েছে নাচের আয়োজন। অকস্মাৎ একটি ভজনের সঙ্গে তালে তালে নূপুর বেজে উঠতেই চমক ভাঙ্গল তাঁর। অবাক হয়ে চোখ মেলে চেয়ে দেখলেন কখন ইতিমধ্যে একটি কিশোরী মেয়ে নাচতে শুরু করেছে।

বিস্মিত হয়েই চেয়ে দেখেছিলেন কিন্তু সে বিস্ময় কিছুই নয়। দেখার পর আরও অনেক বেশী বিস্মিত হলেন। চমকে উঠলেন একেবারে। আর সেই চমকের ঘোর তাঁর বিস্ফারিত দুই চোখ থেকে কাটতে চাইল না অনেকক্ষণ। ঐতিহাসিকরা বলেন সে বিস্ময় ইহ জীবনেই কাটে নি আর।

যুবতী নর্তকী নয়, সাধারণ বাইজী বা বাজারের নাচওয়ালী তো নয়ই। এ নিতান্তই একটি কিশোরী মেয়ে। ফুলের মতো কোমল, পুষ্পদণ্ডের মতোই ভঙ্গুর। কোথাও কৃশতা বা অপূর্ণতা নেই দেহে—তবু কেমন যেন তন্বঙ্গী বলেই মনে হয়। ছিপছিপে নমনীয় দেহ, নৃত্যের যে কোন ভঙ্গিমায় সমস্ত দেহ ইচ্ছামতো বেঁকে চুরে যাচ্ছে—অস্থির কাঠিন্য বা মেদের বাহুল্য বাধা দিচ্ছে না কোন অবস্থাতেই।

মেয়েটিকে দেখে ঊষার কথাই মনে পড়ল পেশোয়া বাজীরাও-এর। লজ্জারুণারক্তা স্বর্ণজ্যোতিঃ ঊষা ছাড়া অন্য কোন উপমা মনে আসে না একে দেখে। তেমনিই এক সুবিপুল সম্ভাবনা এর মধ্যে নিষুপ্ত আছে যেন, তেমনিই দীপ্তি ও দহনের সম্ভাবনা। তেমনি একটি পবিত্র ভাবও মনে জাগে একে দেখে। এর ভজনতন্ময় ভক্তিতদ্‌গত মুখের দিকে চাইলে মনে হয় সাক্ষাৎ কিশোরী রাধাই নেমে এসেছেন, নৃত্যের ছন্দে তাঁর অন্তরের প্রেমার্ঘ্য নিবেদন করতে।

মুগ্ধ হয়ে গেলেন বাজীরাও। মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রইলেন ওর দি[redacted]া চেয়েই রইলেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপলক চোখে।

মেয়েটি আপনমনেই নাচছিল, বিগ্রহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে। প্রণামের ভঙ্গীগুলির সময় চোখ দুটি অর্ধ-নিমীলিত হয়ে পড়ছিল শুধু। তারই মধ্যে হঠাৎ একসময়, যেন অদৃশ্য কোন অমোঘ আকর্ষণে চেয়ে দেখল বিশিষ্ট দর্শকদের দিকে, আর তারই মধ্যে রূপবান তরুণ পেশোয়ার চোখে চোখ পড়ে গেল।

বিধাতারই যোগাযোগ! অন্তত তাই বলতে হবে।

দুটি জোড়া চোখ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল যেন। কয়েকটি লহমার জন্য কোন চোখেই পলক পড়ল না। নৃত্যের তাল ভঙ্গ হ'ল, নর্তকী ভুলে গেল যতি সমের সূক্ষ্ম হিসাব, ভুলে গেল সামনের দেব বিগ্রহ এবং পূজ্য নরপতিকে—এই বিরাট আসরের বিপুল জনতার কারুর কথাই মনে রইল না আর। স্থান কাল পাত্র সব ভুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে।

এই বে-আদপিতে বিস্মিত হয়ে থেমে গেল ক্রুদ্ধ সারেঙ্গী ও বিরক্ত তবলচী। বিস্মিত হয়ে গান থামালেন গায়ক রামদাস। সমস্ত দর্শকদের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন জাগল। শুধু সব চেয়ে যাঁর বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হবার কথা সেই রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা স্মিত প্রসন্ন মুখে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন অল্পবয়সী এই দুটি ছেলেমেয়ের কীর্তি।

একটু পরেই চমক ভাঙ্গল নাচিয়ে মেয়েটির। অস্ফুট একটা সলজ্জ উক্তি ক'রে সামান্য জিভ কেটে নিজের দুই কানে হাত দিয়ে বোধকরি বা অপরাধ স্বীকার করল উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের কাছে। তারপরই আবার শুরু করল তার নাচ। আবার সারেঙ্গী তাঁর যন্ত্র তুলে নিলেন, আবার তবলচী তবলায় হাত দিলেন। রামদাসও তানপুরায় আঘাত করলেন আবার।

কিন্তু বাজীরাও-এর আর কোন বাহ্যজ্ঞান রইল না। তিনি সমস্ত আদবকায়দা, সমস্ত লোকলজ্জা নিজের মর্যাদা সব ভুলে এক দৃষ্টে চেয়েই রইলেন মেয়েটির দিকে। চোখে যেন পলক পড়ে না, একটি নিমেষও হারায় না সে দৃষ্টি।...

এমনই আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন যে কখন গান থেমেছে, নর্তকী প্রণাম করে বসে পড়েছে—কিছুই খেয়াল করেন নি। একেবারে রাজা স্বয়ং সামনে এসে দাঁড়াতে, তাঁর অনুচর ও সঙ্গীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে পড়তে, খেয়াল হল তাঁর।

যেন অনিচ্ছাতেই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন পেশোয়া বাজীরাও। তারপর রীতিমাফিক সৌজন্য-বিনিময়ের পর পেশোয়া তাঁর একান্ত-সচিবকে বিগ্রহের প্রণামী ও গায়ক বাদকদের উপযুক্ত পুরস্কার দেবার ইঙ্গিত ক'রে এগিয়ে নেমে গেলেন দু ধাপ, মেয়েটির দিকে। পরক্ষণেই বুঝি হুঁশ হ'ল তাঁর, রাজদরবারের ভব্যতার কথা মনে পড়ল। রাজার দিকে ফিরে বললেন, 'যদি অনুমতি করেন মহারাজ, নর্তকীকে আমি নিজের হাতে বকশিশ দিতে চাই। তাতে কোন দোষ হবে না তো?'

ততক্ষণে অনামিকা থেকে সুবৃহৎ হীরকাঙ্গুরীয়টি খুলে নিয়েছেন বাজীরাও।

অপাঙ্গে একবার সেদিকে চেয়ে নিয়ে মধুর আশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন রাজা, 'না না, দোষ হবে কেন? সাধারণ নর্তকী হ'লেও না হয় দোষ হ'ত—ও তো আমার কন্যা।'

'আপনার কন্যা!'

বিস্মিত বাজীরাও বিহ্বলকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ—ও যে মস্তানী, আমার মুসলমান উপপত্নীর গর্ভজাত কন্যা। কিন্তু হিন্দুদের দেবদেবীর কাহিনী, পুরাণাদি খুব ভাল ক'রে পড়েছে ও—এ সব নাচে তাই ওর তুলনা নেই। কোন ভুলও হয় না।

মস্তানী, একটু এগিয়ে এসো মা, বৎস বাজীরাও তোমাকে পুরস্কার দিতে চাইছেন!'

বিহ্বল, যন্ত্রচালিতের মতোই হাতটা বাড়িয়ে আংটিটা ফেলে দিলেন বাজীরাও—স্থলকমলের মতো রক্তাভ সেই দুটি কোমল করপুটে।

চেয়ে দেখতেও পারলেন না, সুখে আনন্দে লজ্জায় মস্তানীর মুখে কী অপরূপ রক্তিমাভা ফুটে উঠল। কোন দিকেই যেন চাইতে পারছেন না আর তিনি। এক বিপুল লজ্জা যেন তাঁর মাথা তুলে চাইবার ক্ষমতাকে চিরকালের মতো গ্রাস করেছে।

অবশেষে একদা বাজীরাও-এর যাত্রার দিন ঘনিয়ে এল। স্বয়ং রাজা ছত্রসাল তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে অতিথি মহলে এসে উপস্থিত হলেন।

অশ্রু-ছলছল চোখে গম্ভীর মুখে বাজীরাওয়ের কাঁধে দুটি হাত দিয়ে গাঢ় কণ্ঠে রাজা বললেন, 'পুত্র, তুমি আমার যা করেছে, সে তুলনায় কোন প্রতিদানই দেবার শক্তি আমার নেই। যদি বয়স থাকত, আরও অনেকদিন বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা থাকত তাহ'লে হয়ত চেষ্টা করতাম যে প্রাণ তুমি রক্ষা করেছ সেই প্রাণ দিয়েও তোমার কোন প্রত্যুপকার করার। যে রাজ্যখণ্ড তোমাকে দিয়েছি সে তো তোমারই কাছ থেকে পাওয়া। সুতরাং এই বিরাট কৃতজ্ঞতার ঋণ নিয়েই বোধকরি আমাকে যেতে হবে। শোধ করার কোন সুযোগই পাব না। তবু···তোমাকে অনুরোধ, যদি এই শেষ মুহূর্তে কিছু চাইবার থাকে তোমার নিঃসঙ্কোচে চাইতে পারো। যা চাইবে, তা যদি আমার দেওয়ার শক্তি থাকে নিশ্চয়ই দেব। সেও আমার ঋণ স্বীকার করা হবে মাত্র, ঋণ শোধ হবে না।'

কিসের একটা সঙ্কোচ ও সংশয়ে গত কয়েকদিন যেন ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হচ্ছিলেন বাজীরাও। মুখ-চোখের চেহারা গিয়েছিল

বদলো। শুষ্ক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। রাজা ছত্রসালের কথা শুনে নিমেষ মধ্যে যেন আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখ-চোখ।

'দেবেন মহারাজা, যা চাইব তাই দেবেন?'

'হ্যাঁ—দেব। যদি আমার সাধ্যে কুলোয়।'

তবু শেষ মুহূর্তে কথাটা যেন ঠোঁটের মধ্যে আটকে যায়। বিশ্বের সঙ্কোচ এসে কণ্ঠ-রোধ ক'রে ধরে।

কোনমতে ঘাড় হেঁট ক'রে জানান তাঁর প্রার্থনাটা—'আমি আপনার কাছে মস্তানীকে ভিক্ষা চাইছি।'

কথাটা বলে, বলে ফেলতে পেরে, যেন বেঁচে যান বাজীরাও যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন। দ্বিধা ও অস্থির-চিত্ততার যে গুরুভার পাষাণের মতো বুকে চেপে ছিল, সেটার হাত থেকে অন্তত অব্যাহতি পেলেন তিনি 'হ্যাঁ কি না' দুটোর একটা উত্তর পেলেই সুখে না হোক নিশ্চিন্ত হয়ে যাত্রা করতে পারেন।

রাজা ছত্রসাল মুহূর্ত দুই নীরব হয়ে রইলেন,—বাজীরাও-এর মনে হ'ল দুই দীর্ঘ যুগ—তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'মস্তানী আমার প্রিয় কন্যা, রাজপুত্রীর মতোই তাকে মানুষ করেছিলুম। অন্য যে কেউ এ প্রার্থনা করলে বিবাহের প্রশ্ন তুলতুম। কিন্তু তোমার কথা স্বতন্ত্র, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই—আমি নিঃশর্তেই তাকে দান করলুম তোমার হাতে।'

তারপর একটু থেমে, যেন বাজীরাও-এর অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরেই মৃদু হেসে বললেন, 'এ আমি জানতুম পুত্র। কতকটা অনুমানই করেছিলুম। তাই মস্তানীকে প্রস্তুতই রেখেছি। তুমি যাত্রা করলেই তার শিবিকাও তার মহল থেকে বেরোবে। তুমি কিছু চিন্তা ক'রো না।'

॥ ৪ ॥

'কী বললে ? দু'টো ঘোড়া !···দু'টো ঘোড়া তৈরী ক'রে এনেছ ?' বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে পেশোয়ার, 'দু'টো ঘোড়ার কথা আবার কে বললে তোমাদের ? আমি তো শুধু আমার ঘোড়াই সাজাতে বলেছি !'

বলতে বলতেই তাঁর কণ্ঠস্বর যেন আরও কঠিন হয়ে ওঠে, নিরুদ্ধ রোষের চিহ্নস্বরূপ দুই রগের দু'টো শিরা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্রমশ, 'তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ ? তুমি শোন নি কারুর কাছে যে আমার হুকুম তামিলে কোনরকম গাফিলতি আমি সহ্য করি না ? আমি তো তোমাকেই বলেছিলাম আমার ঘোড়ার কথা ?'

খুব বেশী দিন পেশোয়ার খাস এলাকায় আসে নি নাগোজী পন্থ এটা ঠিক—তবু সে এই সরকারে কাজ করছে সাত-আট বছর, পেশোয়ার মেজাজের খবর সে রাখে। আর যত সামান্য দিনই সে 'শানোয়ার ওয়াড়া'য় আসুক—ওঁর এই কণ্ঠস্বর ও রগের শিরা ফুলে ওঠার অর্থ ও পরিণাম সে জানে ; সুতরাং সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল, এই অভিযোগের জবাবে একটা কথাও বলতে পারল না। বলতে পারল না যে, সে হুকুম মতোই কাজ করেছে এবং হুকুম শুনতেও তার কিছুমাত্র ভুল হয় নি। পেশোয়ার হুকুমের চেয়েও বড় হুকুম আছে এখানে আর সেই হুকুমই সে তামিল করেছে মাত্র।

সহজ সত্য কথাটাও বলবার সাহস হ'ল না এই কারণে যে, সে শুনেছে, সত্য হোক মিথ্যা হোক পেশোয়া কোনরকম প্রতিবাদ বা মুখের ওপর জবাব সহ্য করতে পারেন না। মিথ্যা বা না-করা অপরাধের জন্য যত শাস্তিই ভোগ করতে হোক, একেবারে অসহ্য

কিছু হবে না। কিন্তু জবাব দিতে গেলে এখনই সদ্য পদাঘাত এবং পরে কঠিনতর দণ্ড অবধারিত।

অবশ্য চুপ ক'রে থেকেও হয়ত সহজে অব্যাহতি পেত না নাগোজীপন্থ—কারণ পেশোয়ার রগের শিরা ছু'টো ইতিমধ্যে আরও উঁচু হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ ক্রোধের মাত্রা বাড়ছেই তাঁর। ব্যাপারটা তুচ্ছ, একটা ঘোড়ার জায়গায় ছু'টো ঘোড়া তৈরী হয়েছে, কাজে না লাগে দ্বিতীয় ঘোড়ার সাজ খুলে ফেলতে অর্ধদণ্ডও সময় লাগবে না কিন্তু পেশোয়া বাজীরাওয়ের কাছে এটুকু তথ্যই সব নয়। তিনি নিজে অসাধারণ কর্মদক্ষ মানুষ, অপরের কাজে বা আচরণে কোন-রকম ত্রুটি বা শৈথিল্য সহ্য করতে পারেন না। কুলিশ-কঠিন নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী তিনি—তা না হ'লে এই অল্পবয়সেই সারা ভারতে এতখানি প্রতিপত্তি লাভ করতে পারতেন না—একাধারে রণনিপুণ বীর সেনাপতি ও সুদক্ষ শাসনকর্তা হিসাবে বিখ্যাত হয়ে উঠতেন না। তিনি জানেন, কোথাও বিন্দুমাত্র শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিলে ভবিষ্যতে বিপুল বিশৃঙ্খলা সহ্য করতে হবে--সামান্য গাফিলতি অসামান্য অপটুতা হয়ে উঠবে। মানুষ তার কর্তব্য সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে পালন করবে—এইটেই স্বাভাবিক তাঁর কাছে; সেই জন্য বাজীরাও কারও কর্মনিপুণতার প্রশংসা করেন না—ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য কঠিন ভর্ৎসনা করেন।

এ ক্ষেত্রেও তিনি কঠিনতর ভর্ৎসনার বাক্যই উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলেন—হয়ত সেই সঙ্গে কিছু শাস্তির নির্দেশও—কিন্তু সে সুযোগ মিলল না, তার আগেই সে ঘরে একটি অভিনব আবির্ভাব ঘটল; এ রাজ্যে, পেশোয়ার অনুচরদের কাছে পেশোয়ার আদেশের চেয়েও যাঁর নির্দেশ বড়, সেই অপরূপা নারী ও-পাশের পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর আবির্ভাব সব অবস্থাতেই অভিনব কিন্তু আজ আর একটু বিশেষত্ব ছিল, যে বেশে তিনি পেশোয়ার সঙ্গে রণাঙ্গনে যান সাধারণতঃ সেই বেশেই অশ্বারোহণের উপযুক্ত সজ্জায়

সজ্জিত হয়েই এসেছেন, রেশমের শৌখীন চাবুকটি নিতেও ভুল হয় নি তাঁর।

তাঁকে দেখেই পেশোয়ার উগ্র পরুষদৃষ্টি কোমল হয়ে এল। সর্বদা সকল অবস্থাতেই তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়ে ওঠে—এই মেয়েটিকে দেখলে। সেই প্রথম দিন থেকেই এক আশ্চর্য প্রসন্নতা অনুভব করছেন তিনি—সেই যেদিন পান্নার রাজপ্রাসাদে রাজা ছত্রসাল বুন্দেলার এই জারজ-কন্যাটিকে প্রথম দেখেছিলেন বাজীরাও। নিষ্ঠাবান আচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ পেশোয়া একদা প্রবীণ রাজা ছত্রসালের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে আহার করতে রাজী হন নি—বসতে গিয়েও উঠে চলে এসেছিলেন—রাজার মুসলমানী রক্ষিতা ছিল বলে। সে অপমানেরই শোধ নিয়েছিলেন রাজা ছত্রসাল—দেবমন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখাবার নাম ক'রে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলেন তাঁর সেই মুসলমানী উপপত্নীর কন্যা নৃত্যপরা মস্তানীকে।

সেই যে কী শুভ বা অশুভ লগ্নে দেখা হয়েছিল তাঁদের—তখনও-তরুণ বাজীরাও-এর সঙ্গে কিশোরী মস্তানীর—সেই থেকেই তাঁদের দু'জনের জীবনে গ্রন্থি পড়ে গেছে। পেশোয়া মনে করেন সে ক্ষণটি তাঁর জীবনে শুভ—কারণ ঐ কিশোরীই তাঁর ভবিষ্যতের সমস্ত কীর্তির প্রেরণা,—আর তাঁর আত্মীয়-পরিজনরা মনে করেন যে এক সর্বনাশা ক্ষণেই মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছিল পেশোয়ার সামনে—সেই থেকে তাঁর সমস্ত কীর্তির পথ রোধ ক'রেই দাঁড়িয়ে আছে সে আজও পর্যন্ত, অত বড় বীর যোদ্ধা ও তীক্ষ্ণধী রাজনীতিকের সকল শৌর্য সকল প্রচেষ্টা স্তম্ভিত হয়ে আছে ওর ঐ দু'টি রক্তাভ নৃত্য-চটুল চরণে। ওকে লঙ্ঘন ক'রে অগ্রসর হওয়ার সাধ্য আর তাঁর নেই।

এ অভিযোগের মূলে কোন সত্য থাক বা না থাক—এটা ঠিক যে, সেদিন বাজীরাওয়ের দৃষ্টিতে সেই অসামান্য রূপ আর অলোক-সাধারণ লাবণ্য যে মোহের ঘোর লাগিয়ে ছিল—সে ঘোর আর কোনদিনই কাটে নি ; সেই মুহূর্ত থেকে আজও, ভারতত্রাস পেশোয়া

সেই রূপসী কন্যার মুগ্ধ ক্রীতদাস হয়ে আছেন। সেই যে চোখে চোখ পড়েছিল, সে চোখ আর ফেরাতে পারেন নি অন্য কোনও দিকে, অন্য কারও মুখে।

এখনও কয়েক মুহূর্ত শুধু মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলেন পেশোয়া বাজীরাও। তারপর বোধ হয় এই সাজসজ্জার সম্যক অর্থটা মাথায় গেল তাঁর। তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ কি? তুমি কোথায় যাবে?'

'আপনার সঙ্গে।' শান্ত ভাবে জবাব দিল মস্তানী, পেশোয়ার খুশির সমুদ্র থেকে ওঠা হৃদয়লক্ষ্মী। পেশোয়া আদর করে ওর নামের মহারাষ্ট্রীকরণ করেছেন—খুশিবাঈ, কখনও ডাকেন মস্তিবাঈ বলেও।

'সে কি? আমার সঙ্গে কোথায় যাবে! আমি তো যাচ্ছি সাতারা দুর্গে, ছত্রপতি রাজা শাহুর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে তুমি কোথায় যাবে'—বলতে বলতেই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে, 'ও, তুমিই বুঝি দু'টো ঘোড়া আনতে বলেছিলে?'

'বলেছিলুম বৈ কি! নইলে আমি যাব কিসে? আপনি বুঝি সে জন্যে বকছিলেন বেচারী নাগোজীকে? বা রে, ওর কি দোষ!'

'হুঁ, সেটা এখন বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তুমি যাও নাগোজী—বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো গে। আমরা যাচ্ছি এখনই।'

তারপর নাগোজীপন্থ পুনর্জন্ম লাভের সুদুর্লভ অভিজ্ঞতা অনুভব করতে করতে চোখের বাইরে চলে গেলে পেশোয়া পুনশ্চ বললেন, 'না না, লক্ষ্মীটি—এসব মতলব ছাড়, আজ আর যেতে চেয়ো না আমার সঙ্গে—'

'কেন পেশোয়া, দোষ কি? আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যদি যেতে পেরে থাকি, রাজসভায় যেতে পারব না? শত্রুর কামানের চেয়েও কি ছত্রপতির দৃষ্টি বেশী ভয়ঙ্কর? আর যদি তাই

হয়—না হয় তাঁর দৃষ্টির অনলে ভস্মীভূতই হব। তার চেয়ে বেশী কিছু তো সম্ভব নয়!'

'তার চেয়ে বেশীও হ'তে পারে মস্তিবাঈ, শুধু তুমি নয়, সে অনলে আমিও ভস্মীভূত হ'তে পারি শেষ পর্যন্ত!'

'ইস? ছত্রপতির উষ্মার আগুনে ভস্মীভূত হবেন পেশোয়া বাজীরাও!···ছত্রপতির মাথার ওপরে রাজছত্র যে আজও শোভা পাচ্ছে—সে কার দৌলতে তা কি তিনি জানেন না? এত নির্বোধ নন তিনি নিশ্চয়ই। যে সিংহাসন আজ ইচ্ছা করলে অনায়াসে আপনিই নিয়ে নিতে পারতেন, সেটা তো নিতান্ত স্নেহবশতই তাঁকে দিয়ে রেখেছেন—তাই নয় কি?'

'চুপ!' ঈষৎ একটু ধমক দিয়েই ওঠেন পেশোয়া, অবশ্য তাঁর খুশিবাঈকে যতটা ধমক দেওয়া সম্ভব। তারপর দু' কানে আঙুল দিয়ে বলেন, 'এ কথা আর কখনও, কোনদিনও ব'লো না, এ আমাদের শুনতে নেই। তাঁর সিংহাসন তিনিই রক্ষা করছেন, যদি কিছু আমি করতে পেরে থাকি—সে তাঁরই আশীর্বাদে আর প্রেরণায়। তা ছাড়া তুমি জান না মস্তি, সমস্ত মারাঠা জাতির হৃদয়ের মণি রাজা শাহু বীর্যে শৌর্যে রাজনীতিতে কারও চেয়ে কম নন। আমি আছি বলেই তিনি হয়ত নিশ্চিন্ত আছেন—কিন্তু প্রয়োজন হ'লে এ ভার তিনি অনায়াসে বহন করতে পারবেন।···না, তাঁকে অপ্রসন্ন করা চলবে না। এ খেয়াল তুমি ছাড়। জিনিসটা—জিনিসটা বড়ই অশোভন হয়ে দাঁড়াবে!'

'বা-রে!' অভিমানক্ষুব্ধ সোহাগে মস্তির ঠোঁট দু'টি বিচিত্র ভঙ্গী ধারণ করল, 'আমি বলে সেজেগুজে তৈরী হয়ে আছি কখন থেকে রাজসভায় যাব বলে—! তা আমি না হয় খুবই অপবিত্র জীব—কিন্তু তাই বলে কি রাজদর্শনেরও অধিকার নেই আমার? রাজ-সভাতে যে সব সাধারণ প্রজা নিত্য যায়—তারা কি সকলেই নিষ্পাপ মহাপুরুষ? ছত্রপতির নিজেরও তো নর্তকী আছে শুনেছি, তারা

কখনও কখনও নিশ্চয় দরবারেও নাচে—? আপনি না হয় আমাকে আপনার নর্তকী বলেই পরিচয় দেবেন! তাতেও তিনি রুষ্ট হন্—শাস্তি দিতে চান—সে শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব!'

'হ্যাঁ—তা না হয় নেবে বুঝলাম কিন্তু এমনও হ'তে পারে, রাজরোষটা তোমার কাছ পর্যন্ত আদৌ এসে পৌঁছল না—নামল সোজা আমারই মাথায়?···তুমি—তোমাদের ভগবান এমনই কতকগুলি স্বাভাবিক বর্ম দিয়েছেন যাতে কোন পুরুষের—তা সে রাজাই হোক আর ঋষি বা দেবতাই হোক—কারুর রোষই হয়ত বেঁধে না, সেটা প্রতিহত হয়ে আমাদের মতো অভাগাদের ওপরই এসে পড়ে!'

'কেন, আমার ওপরের রাগটা আপনার ওপর এসে পৌঁছবে কেন?'

'এ কেন তোমাকে বোঝাতে পারব না। লক্ষ্মীটি, তুমি জেদ করো না—আমাকে একাই যেতে দাও—'

'বেশ, আপনি একাই যান—আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই না। আমি আলাদাই যাব। আপনার পরিচয় না দিলেই হ'ল তো। সাধারণ প্রজা—যে-ই যাক্ শুনেছি তিনি তার আর্জি শোনেন। সেইভাবেই যাব তাঁর কাছে। না হয় বারাঙ্গনার পরিচয়েই যাব—তারাও তো ওঁর প্রজা! লোকে যে বলে শাহু ছত্রপতির দরবারে সকলের অবারিত দ্বার—সে কি মিথ্যা তাহ'লে?'

চুপ ক'রে রইলেন বাজীরাও। তাঁর সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত ললাটে দুশ্চিন্তার ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল। এর ফলাফল তিনি জানেন, এতকাল বৃথাই রাজকার্যে দিন কাটান নি—অথচ এই অবিমৃষ্যকারিতায় বাধা দেবারও শক্তি নেই বুঝি তাঁর।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ, চলো তাহ'লে—কিন্তু এখনও বলছি, একটু ভেবে দেখলে ভাল করতে!'

'আপনি যান পেশোয়া; আমি পরে যাব। কোন একজন ভৃত্য

সঙ্গে ক'রে যাব—আপনি চলে যান।'

'না, তা হয় না।' দৃঢ়কণ্ঠে বলেন পেশোয়া, 'সে সম্ভব নয়। গেলে আমার সঙ্গেই যাবে।' তারপর একটু ম্লান হেসে ব্যাপারটা পরিহাস-তরল করার চেষ্টা করে বলেন, 'আমি ছাড়া অন্য কোন ভৃত্যের সঙ্গে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না।...তারাও তো মানুষ।'

তবুও অভিমান যেতে চায় না মস্তিবাঈয়ের। আরও কি বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু এবার—বাজীরাওয়ের কণ্ঠে পেশোয়ার আদেশই ধ্বনিত হয়, 'না, আর কথা নয়। দরবারের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি চলো।'

মস্তানী এ কণ্ঠস্বর চেনে। সে বিনা-প্রতিবাদে তাঁর পিছু পিছু বেরিয়ে এসে ঘোড়াতে চড়ল।

॥ ৫ ॥

ছত্রপতি শাহু প্রথমটা বুঝতে পারেন নি। কারণ অদ্যাপি তিনি তাঁর পেশোয়ার এই প্রিয়তমাকে চোখে দেখেন নি। যে-সব বর্ণনা শুনেছেন তাতে একে চেনার কথা নয়—সে-সব বর্ণনার সঙ্গে কিছুই মেলে না এর। এ অনেক, অনেক বেশী সুন্দর। তার চেয়েও বড় কথা এ মেয়ে সাহসিনী, বুদ্ধিমতী—এর হৃদয় আছে। এক কথায় এ অসাধারণ। বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণদর্শী শাহু এক নজরে মেয়েটিকে বুঝে নিলেন—এবং সেই কারণেই চমকে উঠলেন! শাহুর স্বভাব অলস কিন্তু—বাজীরাও যা প্রায়ই বলেন—তাঁর সাহস, শৌর্য বা বুদ্ধির অভাব নেই।

তা না হলে, তাঁর প্রথম পেশোয়ার মৃত্যুর পর, প্রবল আপত্তি এবং আপাত-যোগ্যতর প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও কুড়ি-একুশ বছরের তরুণের হাতে শাহু এই বিশাল রাজ্য তথা বিশালতর সমস্যার বোঝা তুলে দিতেন না।

সাধারণ কোন মেয়ে নয় তা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই, বাজীরাও-এর সঙ্গে প্রবেশ করার তথ্যটা মিলিয়ে—ছুই আর দুইয়ে যোগ করার মতো—মেয়েটির আসল পরিচয় বুঝতেও বিলম্ব হ'ল না। চারিদিকে সভাসদ্‌দের চোখে যে উষ্মা, লজ্জা, ধিক্কার এবং ঈর্ষা প্রকট হয়ে উঠল,—তা থেকে নিজের ধারণার সমর্থনই পেলেন। এই নিশ্চয়ই সেই মস্তানী বা মস্তিবাঈ—পেশোয়া বাজীরাও-এর মুসলমানী রক্ষিতা!···

চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই শাহুর স্বভাব-প্রসন্ন মুখ কঠিন ও ভ্রূকুটি-কঠোর হয়ে উঠল। তিনি সরাসরি বাজীরাওয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রতিনিধিকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'শ্রীপৎ রাও, আমাদের মহামান্য পেশোয়া ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ করতে করতে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বোধ হয়—নইলে যে শিষ্টাচার, শালীনতাবোধ এবং রাজকীয় মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতনতার জন্য উনি বিখ্যাত, তাতেই এত বড় ত্রুটি ঘটতে পারত না। তুমি আজ আমার নাম ক'রে রাজবৈদ্যকে বলো পেশোয়াকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে এবং পেশোয়াকেও বলো কিছুদিন বিশ্রাম করতে!'

শুধু বিমুখ হয়েই নিরস্ত হলেন না ছত্রপতি, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দরবার ত্যাগ করার জন্যও প্রস্তুত হলেন। তাঁর পক্ষে তাঁর পেশোয়ার ওপর বিরক্ত হওয়া বা পেশোয়াকে তিরস্কার করা একটা অঘটন। দরবারের মধ্যে এ আচরণ পেশোয়ার পক্ষেও দারুণ অপমানকর। আর এর ফলাফলও সুদূরপ্রসারী। হঠাৎই ক'রে ফেলেছেন শাহু এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুতপ্ত হয়েছেন। কোন কারণে অনুতাপ করার প্রয়োজন হলে তাঁর বড় অস্বস্তি বোধ হয়। আরও সেই কারণেই—আত্মধিক্কারের গ্লানিতে বিরক্ত, এবং আজ প্রভাতটা নষ্ট হয়ে গেল ভেবে ক্ষুব্ধ হয়েই তিনি সভা থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন।

কিন্তু সেদিন সে দরবারের ভাগ্যে আরও অঘটন অপেক্ষা করছিল।

বোধ করি বিনা মেঘে শুধু নয়, বিনা আয়োজনে ও বিনা-প্রস্তুতিতেও—সেই সভাকক্ষের মধ্যে বজ্রপাত হ'ল।

কেউ কিছু বোঝবার কি রক্ষীরা কোন বাধা দেবার আগেই, পেশোয়ার অনুগামিনী সেই নারী—বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে পেশোয়ার পথরোধ করল, নতজানু হয়ে সামনে বসে পড়ে নতমুখেই বলল, 'দাঁড়ান ছত্রপতি, আপনি রাজা, আপনি মহান শিবাজীর আসনে বসেছেন তাঁর আদর্শ রক্ষার প্রতিজ্ঞা ক'রে। আপনার রাজ্যের কীট-পতঙ্গও আপনার কাছ থেকে সুবিচার আশা করে। আমি যতই অধম যতই ঘৃণ্য হই, আমিও আপনার প্রজা। আমি এই প্রকাশ্য দরবারে আপনার কাছে প্রশ্রয় ও সুবিচার প্রার্থনা করছি।'

কথাগুলো নতমুখেই বলল মস্তানী, ভাষাতেও কোথাও রাজসম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হ'ল না কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, একে সামান্যা বারনারী রোধে অবজ্ঞা করা চলবে না, এ-মেয়ে তার প্রাপ্য আদায় করতে, নিজের সম্মান রক্ষা করতে জানে।

পারিষদরা সন্ত্রস্ত, বিভ্রান্ত। তাঁরা সকলেই, এমন কি স্বয়ং প্রতিনিধি সুদ্ধ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। সবচেয়ে বিপন্ন অবস্থা রক্ষীদের। এক্ষেত্রে রাজ-অভিপ্রায়ে এই অশোভন বাধাদান-কারিণীকে এখনই বলপ্রয়োগে অপসারিত করাই বিধি, কিন্তু যে কারণে দরবারে প্রবেশ করার সময়ও তারা অনুমতি-পত্র বা নিদর্শন চাইতে পারে নি, সেই কারণেই ঐ নারীর দেহে হস্তক্ষেপ করতে পারল না তারা। তারা জানে মহামান্য পেশোয়া সম্মানে রাজার থেকে কিছু ছোট কিন্তু শক্তিতে ছোট নয়। পেশোয়ার ক্রোধ জাগ্রত হ'লে কতদূর কি হ'তে পারে তাও তাদের জানা আছে। তারা শুধু দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল, আর কিছুই করতে পারল না।

ছত্রপতি শাহুরও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এই কুসুমাদপি সুকোমল নারীদেহে এতটা বজ্রাদপি কাঠিন্য আছে—তা তিনি কল্পনা করেন নি। মনে মনে তাঁকে মানতেই হ'ল যে এ নারী

সিংহের উপযুক্ত সিংহিনী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ বিধাতার মিলিয়ে দেওয়া মানিকজোড়।

ক্ষণকালের জন্য যেন আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন রাজা—তাই উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হ'ল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে ছত্রপতি উত্তর দিলেন, 'বেশ, বলো তোমার কি বক্তব্য। কোন্ সুবিচার তুমি আশা করো—তাও জানাও।'

'মহান্ ছত্রপতি, আমি জানি এইমাত্র আপনি আপনার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সেবককে যে অপমান করলেন তার জন্য আমিই দায়ী। এটা তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, তাই তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে চান নি। আমিই জোর ক'রে এসেছি। আমি জানতাম ছত্রপতি শাহু সুবিচারক ও সুবিবেচক, সেই জোরেই পেশোয়ার সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করি নি। কিন্তু আমি কি তা'হলে ভুল বুঝেছি?'

'এ তো তোমার বিচার প্রার্থনা হ'ল না বৎসে, এ তো অনুযোগ মাত্র!···তোমার সুস্পষ্ট অভিযোগ কি?'

'আমি অভিযোগ করছি আপনারই বিরুদ্ধে রাজাধিরাজ। আপনার কাছেই আমি আপনাকে অভিযুক্ত করছি। কেন, কী কারণে আপনি পেশোয়ার প্রতি বিমুখ হবেন—কোন্ অধিকারে?'

এবার প্রতিনিধি শ্রীপৎ রাও যেন বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাঁর এক্ষেত্রে কিছু করণীয় আছে—সেটা মনে পড়ল তাঁর। তিনি ঈষৎ রুষ্টস্বরে বললেন, 'প্রজার অধিকারে বিচার প্রার্থনা করা যায় কিন্তু ধৃষ্টতা প্রকাশ করা যায় না। রাজসম্মুখে ধৃষ্টতা প্রকাশের শাস্তি কঠিন।'

'তা জানি মহামান্য প্রতিনিধি। কিন্তু আমি নারী হয়ে, ছত্রপতির অগণ্য প্রজার মধ্যে নগণ্যতমা হিসাবে শুধু বিচার নয়—কিঞ্চিৎ প্রশ্রয়ও প্রার্থনা করেছি। এ প্রশ্ন আমার সেই প্রশ্রয়ের জোরেই

করেছি—উত্তর দেওয়া না দেওয়া ছত্রপতির ইচ্ছা। তবে এ-ও বলে রাখছি, আপনি আমাকে ভাল রকমই জানেন, আপনার সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয় নয়—ছত্রপতি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বা বিচার না ক'রে চলে যেতে চান তো আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে চলে যেতে হবে। রক্ষী প্রহরীরা আমাকে সরাতে পারবে না—আপনারাও নন। আমি সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হয়েই সভাতে এসেছি—কোন নীচ হস্ত আমার অঙ্গ স্পর্শ করার আগেই আমি এ দেহ ত্যাগ করব।'

বলতে বলতেই মস্তানী তার সুরনারী ঈর্ষিত বক্ষের মধ্যে থেকে একটি হস্তিদন্তমণ্ডিত তীক্ষ্ণধার ছোরা বার করল। ছোরাটি ছোট—কিন্তু তার তীক্ষ্ণতা কম নয়, একটি নারীর আত্মহত্যার পক্ষে যথেষ্ট।

ছত্রপতি যত দেখছেন এ নারীকে, তত মুগ্ধ হচ্ছেন। যেন মনের কোন্ গোপনপ্রান্তে ঈর্ষাও বোধ করছেন কিছু। তাঁরও রক্ষিতা আছে—একাধিক—তাদের কারও কারও সম্বন্ধে দুর্বলতাও তাঁর যথেষ্ট, কিন্তু তারা কেউই এর পায়ের কাছেও দাঁড়াবার যোগ্য নয়।

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসে পড়লেন আবার সিংহাসনে। তারপর সকলকে বিস্ময়ের ওপর বিস্মিত ক'রে তিনি আশ্চর্য কোমলকণ্ঠে বললেন, 'তুমি উত্তেজিত হয়ো না বৎসে, রাজা ছত্রপতি কোন আশ্রয়-প্রার্থিনী নারীকে বিমুখ করেছেন, একথা তাঁর অতিবড় শত্রুও বলবে না।...কিন্তু তোমার ও প্রশ্নের উত্তর তুমি আমার মহামাত্যের কাছেই পেতে পারতে—রাজদরবারে গণিকা কি বারাঙ্গনা নিয়ে রাজ্যের কোন প্রধান পুরুষেরই আসতে নেই, তাতে প্রজাদের মনে মন্দ প্রতিক্রিয়া হয়। এ রাজ্যের যিনি প্রধান অমাত্য তিনি যদি এ আচরণ করেন—অপরে কি শিখবে, কার আদর্শ অনুসরণ করবে তারা?'

'রাজাধিরাজ, প্রজারা আদর্শের জন্য সর্বপ্রথম রাজার দিকেই তাকায়, আগে রাজা তারপর রাজপুরুষ। আগে রাজ্যপ্রধান পরে

অমাত্যরা। আমি যতদূর শুনেছি আপনার প্রাসাদেও আপনার প্রসাদপুষ্ট গণিকা আছেন কেউ কেউ, আপনার প্রিয় রক্ষিতা হিসাবে। এ কি ভুল শুনেছি আমি?'

প্রশ্নটা শুনে অথবা শুনতে শুনতেই রাজা শাহুর মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করল। সভাসদরা সকলে চঞ্চল হয়ে উঠলেন,—অস্বাভাবিক একটা নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল সভাতে—তার মধ্যে দু-একটি অস্ত্রের ঝনৎকারও শোনা গেল। এমন কি স্বয়ং পেশোয়াও যৎপরোনাস্তি বিচলিত বোধ করলেন।

এ কী অসহনীয় স্পর্ধা সামান্য এক পণ্যা নারীর! এ ধৃষ্টতা কতক্ষণ সহ্য করবেন তাঁরা? রাজা শাহুই বা এতখানি সহ্য করছেন কি ক'রে? মহামাত্যকে কি তাঁর এতই ভয়?

কিন্তু শাহু যতই রুষ্ট হোন—রোষ দমন করারও আশ্চর্য শিক্ষা তাঁর—তিনি সেই উদ্যত বিপুল রোষ দমনই করলেন, কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব শান্ত ও অবিচলিত রেখে উত্তর দিলেন, 'বৎসে, সাহস ভাল কিন্তু দুঃসাহস ভাল নয়। তুমি যে-কথা তুলেছ, তার উত্তর না দিলেও অন্যায় হ'ত না। রাজার ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গ তোমার মতো লোকের আলোচনার যোগ্য নয়। এ প্রশ্ন তোমার পক্ষে ধৃষ্টতা বলেই মনে করি। তবু শোন, উত্তরই দিচ্ছি আমি। আমার রক্ষিতা আছে, তা গোপনও করতে চাই না আমি, কিন্তু তারা আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে কোথাও যাবার কি প্রকাশ্য দরবারে বসবার স্পর্ধা রাখে না। এমন কি তাদের আমি বন্ধুবান্ধবদের মজলিসেও বার করি না, অথবা তাদের মনোরঞ্জন করাই না। কিন্তু আমার মহামাত্য ক'রে থাকেন শুনেছি। শুনেছি তিনি তোমার সংস্পর্শে এসে এতদূর কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়েছেন যে ভগবান গণপতির পূজার দিন বহু লোকের সম্মুখে তোমাকে দিয়ে সেই পূজামণ্ডপে নৃত্য করান। এতকাল সেটা বিশ্বাস করি নি, কিন্তু আজ করছি। অর্থাৎ আমার মহামাত্য শুধু তাঁর রাজার সম্মানহানি করারই স্পর্ধা রাখেন

না—ভগবানকেও অবজ্ঞা করার সাহস রাখেন !'

কথা বলতে বলতেই ছত্রপতি শাহুর কণ্ঠস্বর শাণিত ও শীতল হয়ে উঠল, অর্থাৎ অন্তরের উষ্মা কোনমতেই ঢাকা রইল না। কথা শেষ ক'রে তিনি কঠিন দৃষ্টিতে মস্তানী ও বাজীরাও-এর দিকে তাকালেন। উপস্থিত সকলেই বুঝল—এ যাত্রা এ মেয়েটিকে ত্যাগ না করলে বাজীরাওয়ের নিষ্কৃতি নেই।

যাকে উপলক্ষ করে এই রোষ—সে স্ত্রীলোকটি কিন্তু শান্তভাবেই সব শুনল। রাজার বক্তব্য শেষ হ'তে আবার আভূমি নত হয়ে অভিবাদন ক'রে বলল, 'রাজাধিরাজ আপনার কাছে আমাদের অপরাধ অনেক—তা বুঝলাম। আপনার মহামাত্য তাঁর সম্বন্ধে অভিযোগের জবাব দেবেন, আপনার অনুমতি নিয়ে আমার কথা আমিই বলতে চাই। ছত্রপতি, আমি সামান্যা গণিকা বা বারনারী নই। মহারাজ ছত্রসাল আমার পিতা। সে কথা তিনি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন। চিরদিন তিনি আমায় কন্যা বলেই পরিচয় দিতেন। দেবতার সামনে নৃত্য করার নির্দেশও তিনিই দিয়েছেন, আবাল্য সেই নৃত্যের শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা তাঁরই। মহারাজ, শাস্ত্রে আছে শুনেছি বাল্যে স্ত্রীলোকরা পিতার অধীন থাকবে—যৌবনে স্বামীর। পিতার আদেশে আমি দেবতার সামনে নৃত্য করেছি, পিতার আদেশেই আমি আপনার মহামাত্যর সঙ্গে পিতৃগৃহ ত্যাগ করেছি। তিনি হাতে ক'রে আমাকে দান করেছেন—কন্যা হিসাবে। মহামান্য পেশোয়া ছাড়া আমি কোন দ্বিতীয় পুরুষের দিকে লুব্ধ কটাক্ষপাত করেছি এ অপবাদ আমার শত্রুরাও দিতে পারবে না।···শাস্ত্রমতে আমাদের বিবাহ হয় নি একথা সত্য—কিন্তু যে মুহূর্তে পেশোয়াকে আমি দেখেছি সেই মুহূর্তে, দেবতার সামনে, আমি তাঁকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি। সেটা গোধূলি বেলা, বিবাহের সুপ্রশস্ত লগ্ন—তার উপর সামনে দেবতা, মাথার উপর স্বয়ং ভগবান সাক্ষী। পিতা নিজে আমাকে তাঁর হাতে সম্প্রদান

করেছেন। সুতরাং আমি ন্যায়িত ধর্মত পেশোয়ার বিবাহিতা পত্নী। আমাকে বারাঙ্গনা হিসাবে গণ্য ক'রে রাজাধিরাজ আমাকে এবং মহামাত্যকে অসম্মান করেছেন—আমি সেই অকারণ অবিচারেরই বিচার চাইছি আপনার কাছে।'

মস্তানী নীরব হ'তে বহুক্ষণ সেই বিশাল দরবার-গৃহও নীরব হয়ে রইল। সে সময় একটি সামান্য ছুঁচ পড়লেও সে আওয়াজ সারা দরবার গৃহে প্রতিধ্বনিত হ'ত বোধ হয়—এমনিই সে নিস্তব্ধতা।

তারপর ছত্রপতি কথা কইবার আগেই প্রতিনিধি শ্রীপৎ রাও ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলেন, 'অন্যায় ন্যায়ের কথা আলাদা কিন্তু ধর্মত কোন মুসলমানী হিন্দু ব্রাহ্মণের বিবাহিতা পত্নী হ'তে পারে—এ সংবাদ আমাদের কাছে নূতন, এ কথা আমরা কখনও শুনি নি!'

ঠিক সমান ব্যঙ্গের সুরে উত্তর দিল মস্তানী, 'প্রতিনিধি দিবা-রাত্র রাজকার্যে ব্যস্ত থাকেন, পড়াশুনো করবার সময় হয় না তাঁর। নইলে যদি সামান্যও ইতিহাস পড়া থাকত তাহ'লে জানতে পারতেন যে এ ধরণের ঘটনা এ দেশে নতুনও নয়, প্রথমও নয়। আকবর বাদশার প্রধানা মহিষী নিত্য যমুনায় স্নান করে হিন্দু দেবতাদের আরাধনা করতেন, হিন্দু ব্রত-নিয়ম পালন করতেন—এ কথা মহামাত্য ছাড়া বহু লোকই জানেন। একটু খোঁজ করলে তিনিও জানতে পারবেন!'

ক্রুদ্ধ প্রতিনিধি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, রাজা শাহু ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন তাঁকে। বললেন, 'বৎসে, তোমার কথায় কিছু যুক্তি আছে আমি মানছি। তবে একটা কথা—তুমি যেমন নিঃসন্দেহে মহামাত্যকে পতিরূপে বরণ করেছ তিনি কি তোমাকে বিবাহিতা পত্নী বলে গ্রহণ করতে পেরেছেন? বোধ হয় না। তা হলে এ ভাবে প্রকাশ্যে তোমাকে নিয়ে রাজসভায় আসতেন না। কোনও সভাসদ বা রাজপুরুষ কখনও আসেন না—তা বোধ হয় লক্ষ্য ক'রে থাকবে।'

'হ্যাঁ মহারাজ, তা লক্ষ্য করেছি বৈ কি! মহামাত্যও আপনার

মতোই ক্ষুদ্র সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাই তিনি কিছুতেই আমাকে নিয়ে আসতে চান নি! আমিই জোর ক'রে এসেছি। রাজাধিরাজ, আমার হিন্দু পিতা শুধু দেবতার মনোরঞ্জন করারই শিক্ষা দেন নি, উপদেশছলে, স্নেহবশে বহু পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়েছেন, বহু গ্রন্থও পাঠ করিয়েছেন। আপনাদের শাস্ত্র-পুরাণাদি যদি আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পেরে থাকি তো—তারা এই শিক্ষাই কি দেয় না যে স্ত্রীর উচিত সর্বদা ছায়ার মতো স্বামীর অনুগমন করা? নইলে সীতা কেন বনে যাবেন, দময়ন্তী কেন স্বামীর অনুগামিনী হবেন, সাবিত্রী কেন যমালয় পর্যন্ত সঙ্গে যাবেন সত্যবানের! আমি অজ্ঞান মূর্খ স্ত্রীলোক, হয়ত আমি ভুলই বুঝেছি—রাজা ছত্রপতি যদি এ বিষয়ে একটু শিক্ষা দেন তো অনুগৃহীতই হবো।'

রাজা শাহুর মুখ থেকে পূর্বের মেঘ অনেকখানিই কেটে গিয়েছিল, এবার সেখানে প্রসন্ন সূর্যকিরণ ঝলমল ক'রে উঠল। তিনি বললেন, 'বৎসে, তোমার যুক্তি অকাট্য। তুমি আমাদের পুরাণাদির শিক্ষা ঠিকই গ্রহণ করতে পেরেছ, কোথাও কোন ভুল হয় নি। আমি তোমার এই দরবারে আসার যোগ্যতা স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। কিন্তু তুমি রাজা হিসাবে যেমন আমার কাছে প্রশ্রয় ও সুবিচার দাবী করেছ, আমিও তেমনি রাজা হিসাবেই কিছুটা অধিকার দাবী করছি। তোমার কাছে আমার আদেশ নয়—অনুরোধ, তুমি আর ভবিষ্যতে এভাবে দরবারে এসে আমার মহামাত্যকে বিব্রত ক'রো না।

প্রসন্ন মস্তানী রাজা শাহুর পায়ের ওপর নত হয়ে প্রণাম ক'রে বলল, 'মহারাজ, আপনার অনুরোধ আমার কাছে পিতার আদেশের মতোই অলঙ্ঘ্য। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আর কখনও আপনাকে এ মুখ দেখিয়ে আপনার অপ্রীতির কারণ ঘটাবো না। যেটুকু অনুগ্রহ আজ পেলাম, তাইতেই আমি কৃতার্থ। কিন্তু আপনার আদেশ মাথা পেতে নিয়েও আমি একটি অনুরোধ ক'রে

যাচ্ছি—না, ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে। গণপতি পূজার দিন দেবতার সামনে নৃত্য করি আপনি তা শুনেছেন—আমার প্রার্থনা একদিন আপনি সে আসর আপনার উপস্থিতিতে পবিত্র ক'রে তুলুন। আপনি তা দেখার পর যদি আদেশ করেন, আমি তাও ছেড়ে দেব।'

রাজা শাহু এ কথার প্রত্যক্ষ উত্তর এড়িয়ে গেলেন তার পরিবর্তে ইঙ্গিতে তাঁর কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, 'রাজা ছত্রসালের এই দুহিতা আমার পুত্রবধূর তুল্য। আজ প্রথম এঁকে আমি দেখলাম। তুমি যৌতুক-স্বরূপ একটি মুক্তার মালা অবশ্য অবশ্য আমার হয়ে এঁকে পৌঁছে দেবে।'

মস্তানী আর একবার তাঁকে প্রণাম ক'রে সভাগৃহ ত্যাগ করল।

বলাবাহুল্য, এর পর সেদিন আর দরবার বেশীক্ষণ জমল না। সামান্য কিছু জরুরী কাজ সেরেই ছত্রপতি দরবার ভঙ্গের আদেশ দিলেন। যে অপ্রীতিকর নাটকের অভিনয় এই মাত্র হয়ে গেল—সে সম্বন্ধে রাজা কোন্ ইঙ্গিতমাত্র করলেন না আর। পেশোয়ার সঙ্গে জরুরী কথাবার্তা কইলেন খুব সহজভাবেই। পেশোয়াও অনর্থক আর সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না। তাঁদের দু'জনের ভাব দেখে মনে হ'ল আদৌ এরকম কোন ঘটনা ঘটে নি।

দরবারের পর বাজীরাও দ্রুতপদে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন, মস্তানী তখনও ঘোড়ার পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর অপেক্ষা করছে।

বাজীরাও কাছে এসে অপেক্ষমান সহিসের হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম নিয়ে বললেন, 'চলো, আর দেরি কি?'

'একটু দাঁড়ান পেশোয়া—আপনার এক মাননীয় বন্ধু আসছেন!'

'আমার মাননীয় বন্ধু! সে আবার কে?'

বিস্মিত হয়ে মস্তানীর মুখের দিকে চাইলেন পেশোয়া, আর

সঙ্গে-সঙ্গেই, তার দৃষ্টি অনুসরণ করতে তাঁর নজরে পড়ল সত্য সত্যিই স্বয়ং প্রতিনিধি—শিবিকায় না চড়ে পদব্রজে তাঁদের দিকেই আসছেন।

প্রতিনিধি কাছে এসে একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে বললেন, 'মস্তানী—তুমি, তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে?'

খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল মস্তানী। যেন হেসে লুটিয়ে পড়ল সে, বলল, 'ভয় নেই মহামান্য প্রতিনিধি, আমি রাগই করি আর গোসাই করি—পেশোয়া আপনার যথার্থ অনুরাগী বন্ধু, আমার নাচের আসরে আপনার নিমন্ত্রণ কখনও বন্ধ হবে না!'

সে প্রতিনিধিকে অভিবাদন ক'রে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বসল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রতিনিধি বললেন, 'পেশোয়া ভাগ্যবান!'

ঘোড়ায় চড়তে চড়তে বাজীরাও জবাব দিলেন, 'নিঃসন্দেহে।'...

প্রাসাদসীমার বাইরে এসে নির্জন পাহাড়ী পথে নামতে নামতে মস্তানী প্রশ্ন করল, 'পেশোয়া কি আমার ওপর রাগ করলেন?'

'রাগ!...তুমি যে আমার খুশিবাঈ, তোমাকে ঘিরেই আমার দিবারাত্রির—আমার জীবন-মরণের যা কিছু খুশি, তোমার ওপর আমার কিছুতেই কখনই রাগ হয় না মস্তানী!'

তারপর, কেমন এক রকমের গাঢ় গদ্‌গদকণ্ঠে বললেন বাজীরাও, 'ভগবানের আশীর্বাদে আমার এই স্বল্পদিনের জীবনে বহু সৌভাগ্যই লাভ করেছি, কিন্তু তুমিই আমার জীবনে সর্বাধিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যরূপে এসেছ। তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য, কৃতার্থ!'

খুশিবাঈ সত্যকারের খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল।

কথাটা বিশ্বাস করা তো কঠিন বটেই, বুঝতেও বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল ছত্রপতি শাহুর। তিনি একটু অবাক হয়েই চেয়ে রইলেন সংবাদদাতার মুখের দিকে, হঠাৎ তখনই কোন কথা কইতে পারলেন না। আর তাতে সংবাদদাতাও একটু হতভম্ব হয়ে পড়ল, কারণ এটাও অস্বাভাবিক। ছত্রপতি শাহু শুধু বীরই নন—পুরোপুরি রাজা। ঈশ্বর তাঁকে রাজোচিত মহিমার কোন লক্ষণই দিতে ভোলেন নি। কোন সংবাদেই তিনি বিচলিত হন না বা বিস্মিত হন না। হ'লেও—অন্তত তা প্রকাশ করেন না। তাঁর পক্ষে এতখানি অবাক হওয়া অঘটন বৈকি।

অবশ্য বিস্ময়ের প্রথম আকস্মিকতাটা কেটে যেতেই সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর আচরণ একটু বিসদৃশ হয়ে পড়ছে বুঝতে পারলেন। প্রাণপণ চেষ্টায় সামলেও নিলেন নিজেকে। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক করার চেষ্টা ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'রাধাবাঈ? রাধাবাঈ আমার সঙ্গে দেখা করতে চান? মানে স্বর্গত পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ রাওয়ের বিধবা?'

কণ্ঠস্বর যতই সহজ করার চেষ্টা করুন অবিশ্বাস চাপা থাকে না কণ্ঠে। বিস্ময় আর অবিশ্বাস। সেটা তাঁর নিজের কানেও ঠেকে, একটু বিসদৃশ ঠেকে তাঁর নিজেরই। আর সেটা ঢাকতেই বোধকরি, শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ান তিনি। কতকটা অর্ধ-স্বগতোক্তির মতই বলে ওঠেন, 'তা তাঁর এত কষ্ট করে আসবার প্রয়োজন কি ছিল! আমাকে জানালে তো আমিই—'

হ্যাঁ—তিনিই যেতে পারতেন। তাতে এমন কিছু বিস্ময়েরও কারণ ঘটত না। তাঁর প্রাক্তন অমাত্যের স্ত্রী এবং বর্তমান অমাত্যের মা-ই শুধু নন, রাধাবাঈ তাঁর নিজের পরিচয়েও অনন্যা। মহীয়সী

মহিলা তিনি ; বুদ্ধিতে, বিবেচনায়, ঔদার্যে, ধর্মপরায়ণতায়, সভ্যতা-সহবতে, চরিত্রতেজে তিনি পুণার নারী-সমাজে অগ্রগণ্যা। তাঁর খ্যাতি দেশে-বিদেশে বিস্তৃত। তাঁর পিতৃপরিচয়ও সামান্য নয়। সবাই বলে উপযুক্ত সিংহের উপযুক্ত সিংহিনী তিনি, এবং সিংহশিশুর উপযুক্ত স্তন্যদায়িনী।

এ হেন রাধাবাঈ ছত্রপতির দর্শন চান, নিভৃতে নিবেদন করতে চান তাঁর বক্তব্য—এ রীতিমত অঘটন বৈকি !

বিত্তের অভাব নেই তাঁর। তাঁর নিজের সম্পত্তিই আছে যথেষ্ট, পিতৃদত্ত স্বামীদত্ত স্ত্রীধনের পরিমাণ নগণ্য নয় আদৌ। ছেলে বাজীরাও প্রচুর অর্থ দু হাতে ছড়িয়ে কিছু ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন বটে, তবু তাঁর এমন দুরবস্থা নিশ্চয় হয় নি যে মা-র প্রাপ্য মাসোহারা বন্ধ করবেন। নিজের মতোই তিনি মার মর্যাদা বিচার করেন, আর সে মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি রীতিমতোই সচেতন।

যে ব্রাহ্মণ-বংশের বিধবা নারীর অমন দিক্‌পালের মতো পুত্র—এক নয়, একাধিক এবং তারা সকলেই কৃতী, যশস্বী—যাঁর ঐহিক কোন অভাব নেই, যিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়া ও প্রণম্যা—যাঁর সঙ্গে বিবাদ করতে বা যাঁর অশান্তির কারণ হ'তে সাহস করে এমন একজনও নেই এ রাজ্যে—তাঁর কী এমন কারণ ঘটল একা এভাবে এসে রাজার দর্শনার্থিনী হবার ? কী এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে তাঁর জীবনে, কী এমন দুঃখ ?···

কিন্তু বিস্ময়ের কারণ কৌতূহলের কারণ যতই থাক, দেরি করার সময় নেই একেবারেই। রাজারও অধিকার নেই এ ক্ষেত্রে দর্শনা-ভিলাষিণীকে বসিয়ে রাখার। রাজমহিষীরা ছাড়া রাজ্যের সমস্ত মহিলার মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠা ও পদবীতে জ্যেষ্ঠা। অকারণে তাঁকে অপেক্ষা করানো, এমনকি রাজার পক্ষেও অশোভন ও অন্যায়।

রাজা ছত্রপতি উঠে দাঁড়িয়ে পাদুকা খুঁজছেন—এটাও বিস্ময়কর ঘটনা, কারণ তিনি শৌর্যে বীর্যে সাহসে কারও চেয়ে কম না হ'লেও

শুধু শুধু বেশী ওঠা-হাঁটা বা চলাফেরা পছন্দ করেন না; বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিয়মকে লঙ্ঘন করতে চান না কোনমতেই; ধীরস্থির শান্ত মানুষ—অনুত্তেজনা জীবনের সাধনা ক'রে তুলেছেন বলতে গেলে; সুতরাং তিনি দর্শনার্থিনীকে এখানে আনতে আদেশ না ক'রে নিজেই উঠে যেতে উদ্যত হবেন—এটা অবিশ্বাস্য বৈকি!

সংবাদদাতা প্রতিহারীও সেজন্য প্রভূত ব্যস্ত হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি হাতজোড় ক'রে বলল, 'আজ্ঞে, তাঁকে না হয় এইখানেই —মানে, কেউ তো এখন নেই—এখানেই তো তিনি আসতে পারেন।'

'ছিঃ! তাঁর মর্যাদা ভুলে যেও না, তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা আর তাঁর পদবী। তিনি এক মহামাত্যের স্ত্রী—এক মহামাত্যের মা। তিনি আমারও গুরুজন-স্থানীয়া। তিনি এই প্রমোদ-কক্ষে আসবেন কি! তাঁকে সসম্মানে আমার পূজার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও, বলো যে আমি এখনই আসছি তাঁর আদেশ শোনবার জন্য। আর বলো যে তিনি অকারণে এই কষ্ট স্বীকার করায় ছত্রপতি যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। যে-কোন সিপাহী বা ভৃত্যের মুখে সংবাদ পাঠালেও আমি নিজে যেতুম।'

নিজেও সেই কথাই বললেন ছত্রপতি শাহু।

প্রাক্তন মহামাত্যের নতমুখী বিধবা মহিষীর সামনে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে রাজা শাহু বললেন, 'এ আপনি কেন করলেন মা! আমাকে ডেকে পাঠালে আমিই যেতুম। তাতে আমার কিছুমাত্র গৌরব হানি হ'ত না।'

বিনয়ে রাধাবাঈও কম যান না। আশৈশব রাজনীতি ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যেই তাঁর জীবন কেটেছে বলতে গেলে। সুতরাং কথার পৃষ্ঠে কথা তিনি ভালই জানেন। তিনি জিভ কেটে বললেন, 'আপনি

আমার মালিকের মালিক, স্বামীর মনিব, আপনি আজও আমার বংশের অন্নদাতা। দেশের রাজা আপনি, ঈশ্বরের প্রতিনিধি।… আপনাকে ডেকে পাঠাবার মতো ধৃষ্টতা যেদিন প্রকাশ করব, সেদিন বুঝতে হবে যে আমার চিকিৎসা প্রয়োজন হয়েছে।…এমনিতেই, তুচ্ছ ব্যক্তিগত কারণে আপনাকে বিরক্ত করতে হ'ল বলেই লজ্জায় মরে যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমি জানি যে স্বর্গগত মহামাত্য বালাজী বিশ্বনাথ রাও-এর সহধর্মিনী নিতান্ত তুচ্ছ কারণে আমাকে বিরক্ত করতে আসেন নি। আমি তাই সাগ্রহেই আপনার আদেশের অপেক্ষা করছি। তবে তার আগে আপনি আসন পরিগ্রহ করুন। অন্য কোন আতিথেয়তা—যদি ইচ্ছা করেন তো দেবী ভবানীর প্রসাদী শরবৎ একটু দিতে বলি পূজারীকে—'

'দেবী ভবানীর প্রসাদ সর্বদাই শিরোধার্য কিন্তু প্রয়োজন কিছু নেই। আর আসন—রাজাধিরাজ আসন গ্রহণ না করলে তাঁর সামনে আর কারুও যে বসবার অধিকার নেই—তা তো আপনি জানেনই।'

'তা বটে।' ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবেই তাড়াতাড়ি বসে পড়লেন শাহু ছত্রপতি তাঁর আসনে। তারপর ইঙ্গিতে সামনের আসনটি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এবার বলুন, আপনার কোন্ প্রিয়সাধন করতে পারি।'

রাধাবাঈ দেবতার মূর্তিকে প্রণাম জানিয়ে, আর একবার ছত্রপতিকে নমস্কার ক'রে নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসলেন, কিন্তু তখনই কোন কথা বলতে পারলেন না। বরং, মুখ আনত থাকা সত্ত্বেও, মনে হ'ল তাঁর চোখে জল এসে গেছে।

ছত্রপতিও তখনই কিছু পীড়াপীড়ি করলেন না। বুঝলেন যে, স্বয়ং রাধাবাঈকে কষ্ট ক'রে আবেগ সংবরণ করতে হয় যে প্রসঙ্গে, সেটা খুব সামান্য কোন কথা নয়। এ ক্ষেত্রে আবেগ নিজে থেকে সামলাবার জন্য সময় দেওয়াই উচিত।

অবশ্য রাধাবাঈ বেশী সময় নিলেন না। একটু পরেই কথা বলার মতো নিজেকে সামলে নিলেন খানিকটা, যদিও তাঁর কণ্ঠ থেকে সে আবেগের চিহ্নটাকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করা গেল না কিছুতেই।

তিনি সেই প্রায়-রুদ্ধস্বরে বললেন, 'রাজাধিরাজ, আমার স্বামী তাঁর যথাসাধ্য আপনার সেবা ক'রে গেছেন তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত। আপনি সেই জন্যই, স্নেহবশত তাঁর তরুণ পুত্রের কাঁধেই একদা এই বিপুল রাজ্য—সাম্রাজ্য বলাই উচিত—পরিচালনার ভার তুলে দিয়েছেন—অনেক আপত্তি, অনেক বাধা অগ্রাহ্য ক'রেও। আমার পুত্রও আপনার সে বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে—তার প্রাণপণ ক'রে। অযথা বিনয় করার প্রয়োজন নেই—সেজন্য সেআপনার প্রীতি-ও আস্থা-ভাজন। আপনি তাকে সন্তানেরই মতো স্নেহের চোখে দেখেন—তা আমি জানি। মহারাজ, আমি আজ আপনার কাছে আমার সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্যই ছুটে এসেছি। আপনি আপনার মহামাত্য, আপনার স্নেহভাজন সন্তান, আপনার সেবককে রক্ষা করুন, বাঁচান তাকে, বাঁচতে দিন। মহাসর্বনাশের হাত থেকে প্রাক্তন পেশোয়ার বংশ ও আপনার সিংহাসনকে উদ্ধার করুন।'

বলতে বলতেই রাধাবাঈ আসনের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করলেন।

এবার আর একবার বিস্মিত হবার পালা ছত্রপতি শাহুর। কথাটা ঠিক তিনি বুঝতে পারলেন না। যতদূর তিনি খবর পেয়েছেন—রাজকার্যে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ পায় নি মহামান্য পেশোয়ার। কোথাও তিনি যুদ্ধেও পরাজিত হন নি। তাঁর দ্বারা মহারাষ্ট্রের গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে—এমন খবরও তিনি পান নি। তবে রাধাবাঈয়ের এ কথাগুলোর অর্থ কি?

ছত্রপতি শাহু তাঁর মনোভাব দমন করার জন্যই বিখ্যাত। ঈশ্বর তাঁকে রাজোচিত সমস্ত মর্যাদা ও গুণের অধিকারী ক'রে পাঠিয়েছেন

পৃথিবীতে, কিছুতেই কোন অবস্থাতে বিচলিত না হবার শক্তি তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এই তৃতীয়-ব্যক্তি-হীন কক্ষে তাঁর বিস্ময়-বিহ্বলতা গোপন করার চেষ্টা মাত্র করলেন না শাহু, খানিকক্ষণ রাধাবাঈয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'বিপদ ! পেশোয়া বাজীরাও-এর সর্বনাশ আসন্ন !···সে কি ? কই, আমি তো তেমন কোন কথা শুনি নি। কী হয়েছে তাঁর ? কোন কঠিন অসুখ হয়েছে কি ?···কিন্তু তাহলে আমি অন্তত খবর পেতাম। আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না মা ! যদি একটু খুলে বলেন যে বাজীরাও-এর কি হয়েছে এবং আমার কি করণীয় আছে সে ক্ষেত্রে— তো আমি আমার কর্তব্য স্থির করতে পারি।'

'মহারাজচক্রবর্তী,' এতক্ষণে রাধাবাঈয়ের কণ্ঠ অনেকটা পরিষ্কার এবং দৃঢ় হয়ে উঠেছে, 'মায়ের কণ্ঠে পুত্রের যশোগাথা যত সহজে প্রকাশ পায় তত সহজে অপযশ বা অগৌরবের কথা পায় না। পাওয়া উচিতও নয়। তাই আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলতে পারি-নি। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি তার মা—এবং এই রাজ্যের প্রাক্তন মহামাত্যের স্ত্রী। সব কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না।···তাছাড়া ভেবেছিলাম, বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ ছত্রপতি সবই জানেন, ইঙ্গিতে বুঝে নেবেন কথাটা।'

এই পর্যন্ত বলে আরও একবার থামলেন রাধাবাঈ। বোধকরি শেষ মুহূর্তের সঙ্কোচটুকু কিছুতেই যেতে চাইছিল না তাঁর। কিন্তু শাহুকে তখনও নীরব থাকতে দেখে শেষ অবধি বলতেই হ'ল আবার, 'ছত্রপতি, আপনার অনুমান মিথ্যা নয়—সত্যই সে অসুস্থ। আর সেই জন্যেই আজ এমন ভাবে, ব্যাকুল হয়ে, সমস্ত লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে ছুটে এসেছি আপনার কাছে। কিন্তু সে ব্যাধি সাধারণ নয়, অথবা ব্যাধির মূলটা সাধারণ নয়। মানব জীবনের আদিমতম— বোধকরি সর্বপ্রধান রিপুর কাছে আমার বীর পুত্র সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ক'রে বসে আছে। আর সমস্ত শত্রুই তার পদানত—

কিন্তু এই শত্রুর পদানত সে নিজে। মহারাজ, আমার ছেলের যশোরশ্মি চন্দ্রকিরণের মতই উজ্জ্বল—তাই বুঝি চন্দ্রের কলঙ্কের মতোই তার চরিত্রও আজ কালিমালিপ্ত। কিন্তু সে যদি শুধুই অপযশের প্রশ্ন হ'ত, অগৌরবের প্রশ্ন হ'ত, তাহলে আমি এমন ক'রে ছুটে আসতুম না রাজাধিরাজ। সে কলঙ্ক পুরাণোক্ত মহাব্যাধির মতোই আমার পুত্রের জীবন এবং যৌবনকে ক্ষয় ক'রে ফেলছে দিনে দিনে, পরমায়ু নষ্ট করছে তিলে তিলে। তাই আমার এ উদ্বেগ, এ উৎকণ্ঠা। মহারাজ, আপনার সেবককে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করুন।'

তবুও বিহ্বলতা কাটে না শাহু ছত্রপতির দৃষ্টি থেকে। ঠিক-মতো আন্দাজ করতে পারেন না রাধাবাঈয়ের বক্তব্যের পূর্ণ অর্থটা। শুধু এবার যেন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট একটা আভাস পান মাত্র।

তখনও মহারাজচক্রবর্তী শাহু তাঁর মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন দেখে রাধাবাঈ মাথা হেঁট করলেন, মাটির দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বললেন, 'ছত্রপতি, এ রাজ্যের কোন রহস্যই আপনার অজ্ঞাত নেই শুনেছি, আপনি কি পেশোয়া বাজীরাওএর মুসলমানী রক্ষিতার কথা শোনেন নি?'

ও হো হো—ঠিক বটে, ঠিক!

এবার বুঝতে পারেন শাহু। সবটা পরিষ্কার হয়ে যায় তাঁর কাছে। রাধাবাঈয়ের এতক্ষণকার সব কথার সব হেঁয়ালীই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'ও, আপনি মস্তিবাঈয়ের কথা বলছেন? হ্যাঁ, শুনেছি বৈকি! দেখেওছি তাকে একবার।'

'হ্যাঁ, তা জানি রাজাধিরাজ। সে লজ্জার কথা, পুত্রের সে কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মত্ততার কথা আমরাও শুনেছি। কামে উন্মাদ হয়ে—নিজের ও আপনার, রাজ্যের ও রাজ্যের মালিকের সমস্ত মর্যাদা ভুলে গিয়ে সে সেই বাঁদীটাকে নিয়ে নাকি প্রকাশ্য দরবারেও গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন কেন সে ধৃষ্টতার শাস্তি দেন নি মহারাজ,

কেন সে কুলটার নাক-কান কেটে মাথা মুড়িয়ে শহরের বার ক'রে দেন নি !…কী ক'রে সেই অসহ স্পর্ধা সহ্য করলেন আপনি ?'

শাহু বোধ করি এতটা প্রচণ্ড উষ্মার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কেমন একটু মনের মধ্যেই থতিয়ে গেলেন যেন। সেদিনের ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে এ রকম মনোভাবের কারও হ'তে পারে— তা তিনি ভাবেন নি।

না, সত্যিই খুব অসহ্য লাগে নি শাহু ছত্রপতির। সামান্য কুলটার মতো আচরণ করতেও পারেন নি তার সঙ্গে। বরং—বরং তার সঙ্গে কথা কয়ে, তার বুদ্ধিতে, সাহসে, বাক্‌পটুতায় মুগ্ধই হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। তাকে বাঁদী বা রক্ষিতা, বা গণিকা কোনটাই মনে হয় নি তাঁর। বরং বিপরীত মনোভাবই জেগেছিল। কে জানে সে কথাটা শুনেছেন কিনা রাধাবাঈ, শুনলে খুশী হবেন না নিশ্চয়ই—সেদিন সেই প্রকাশ্য সভায় তাকে পুত্রবধূ বলেই স্বীকার করেছিলেন এ রাজ্যের ন্যায়-নীতির রক্ষাকর্তা, দণ্ডমুণ্ডের মালিক। সেই হিসাবে খেলাতেরও ব্যবস্থা করেছিলেন কিছু, পুত্রবধূর মুখ-দেখানি হিসেবে।

নিজের কার্য বা আচরণের জন্য লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই রাজার, সে-রকম অভ্যস্তও নন তিনি—তবু রাধাবাঈয়ের এই প্রবল ধিক্কারের সামনে তিনি যেন একটা কুণ্ঠাই বোধ করতে লাগলেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'কিন্তু সে তো বলল সে রাজা ছত্রশাল বুন্দেলার কন্যা, রাজা তাকে ধর্মসাক্ষী রেখে বাজীরাও-এর হাতে সম্প্রদান করেছেন—'

'কন্যা! কন্যা কাকে বলেন মহারাজ! ছত্রশাল বুন্দেলার মুসলমানী দাসীর গর্ভে জাত জারজ সন্তান। বারাঙ্গনার মেয়ে বারাঙ্গনা! আর সম্প্রদানের কথা বলছেন রাজাধিরাজ! চিৎপাবন ব্রাহ্মণের হাতে বারাঙ্গনার গর্ভজাত অবৈধ সন্তান সম্প্রদান করবেন —এত ধৃষ্টতা রাজা ছত্রশালেরও ছিল না নিশ্চয়। খুশী হয়ে তিনি উপকারীকে নাচওয়ালী ক্রীতদাসী দান করেছেন—বকশিশ।

পথের কুকুরকে যদি কেউ মাথার ওপর তোলে তো সে তারই মাথার দোষ, তাতে কুকুরীর কুকুরত্ব ঘোচে না।'

ছত্রপতি নীরব রইলেন। বাদানুবাদে অভ্যস্ত নন তিনি। পুরুষ হ'লে তাঁর প্রশান্ত ললাটের পরিবর্তন—সামান্য ভ্রূকুটিটুকুর আভাস পেয়েই চুপ ক'রে যেত। আরও বেশী দুর্বিনীত বা ধৃষ্ট কেউ হ'লে তাকে চুপ করিয়ে দিতে পারতেন। শাসকদের সহজাত শিক্ষা এটা। কিন্তু তাঁর সামনে উপবিষ্টা এই মহিলা একে স্ত্রীলোক তায় মাননীয়া—ওঁকে তিনি মাতৃ-সম্বোধন করেছেন—এক্ষেত্রে কিছুই করবার নেই তাই—ধৈর্য ধরে ওঁর বক্তব্য শোনা ছাড়া।

রাধাবাঈও সম্ভবত ও-পক্ষ থেকে কোন উৎসাহ-বাক্য বা প্রশ্নের আশায় চুপ ক'রে রইলেন কিছুক্ষণ। বোধ করি প্রভুর সামনে এতটা উত্তেজনা প্রকাশের অশোভনতা বুঝে ঈষৎ অপ্রতিভও হয়ে পড়েছিলেন। ফলে এবার যখন কথা কইলেন তখন কণ্ঠস্বর অনেক শান্ত হয়ে এসেছে, অনেক অনুত্তেজিত।

মাথা আবার নত ক'রে ধীর কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ আমাকে সামান্য পল্লীরমণীর মত ঈর্ষাতুর বা কলহপরায়ণা ভাববেন না। আমাদের ঘরে সপত্নী বা স্বামীর উপপত্নী নতুনও নয়—আশ্চর্যও নয়। তাতে আমরা অভ্যস্ত। শুধু যদি আমার ছেলের চরিত্রের প্রশ্ন হ'ত তো আমি এত বিচলিত হতাম না। আমি জানি তার চরিত্রে এত গুণ আছে যে ওটুকু যে-কেউ অনায়াসে ক্ষমা করতে পারবে। তার কর্মচারী, প্রজা, এমন কি তার মালিক পর্যন্ত ক্ষমা করেওছেন। কিন্তু এ তার জীবন-মরণের প্রশ্ন, সেই জন্যই এত বিচলিত হয়েছি। আর বিচলিত হয়েছি বলেই কিছু হয়ত অভব্যতা বা ধৃষ্টতা প্রকাশ ক'রে থাকব—মহারাজ নিজ গুণে সেটা ক্ষমা করবেন।...মহারাজ, সাধক কবি নারীর সম্বন্ধে বলেছেন, তারা দিনে মোহিনী রাতে বাঘিনী—দুনিয়ার পুরুষ পাগল হয়ে শখ ক'রে সেই বাঘিনী পোষে, বুকের রক্ত দিয়ে সেই বাঘিনীকে খাওয়ায়। কথাটা এতদিন অতিরঞ্জন বলেই

জানতাম। কিন্তু এখন ছেলের দিকে চেয়ে বুঝতে পারছি—সবাই না হোক, এমন বাঘিনীকে দু-চারজন শখ ক'রে পোষে ঠিকই—আর আমার বুদ্ধিমান রাজনীতি-বিশারদ রণকুশল পুত্র, আমার গর্ভের গৌরব, আমার বংশের গৌরব সেই নির্বুদ্ধিতাই করেছে।...ছত্রপতি মহারাজ, ইদানীং কিছুকালের মধ্যে আপনার মহামাত্যকে দেখেছেন?'

ছত্রপতি ঠিক তখনই কোন জবাব দিতে পারলেন না। মনে মনে হিসাব করতে হ'ল তাঁকে। না, বেশ-কয়মাস তিনি দেখেন নি বাজীরাওকে। বোধহয় সেই যে সভাতে এসেছিল—সেই মস্তানীকে নিয়ে—তার পর থেকেই দেখেন নি আর।

সেই কথাই বললেন তিনি। স্বীকার করলেন অন্তত ছ-সাতমাস দেখা হয় নি তাঁর মহামাত্যর সঙ্গে। তবে সে যে খুব অসুস্থ এমন কথাও তো শোনেন নি কারও কাছে!

'কার কাছে শুনবেন রাজাধিরাজ? সকলেই তার ভয়ে ভীত। তার আর তার ঐ বাঁদীটার ভয়ে। কে বলবে সাহস ক'রে—বলে অপ্রীতিভাজন হবে রাক্ষসীর। তার ক্রোধ দেখেন নি আপনি—একেবারে পিশাচী হয়ে ওঠে সে। কিন্তু তার কথা যাক, তার কথা বলাও আমার পক্ষে পাপ। আমি আমার পুত্রের কথা বলতে এসেছি। মহারাজ তাকে একবার ডেকে পাঠান দয়া ক'রে, তার দিকে চান। তাকে দেখলে চিনতে পারবেন না আপনি। মাত্র ছ'মাস আগেও যা দেখেছেন তার তিন-পঞ্চমাংশ রক্তমাংসও নেই তার দেহে। কঙ্কালসার হয়ে গেছে সে, চক্ষু কোটরগত, চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে গেছে রক্তহীনতায়। আমার সেই বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান পুত্র, যাকে দেখবার জন্য, হিন্দুস্থানের সর্বত্র, সম্ভ্রান্ত পুরললনারা পর্যন্ত পাগল হয়ে বেরিয়ে আসতেন অলিন্দে বা ঝরোকার ধারে, শিল্পী পাঠিয়ে যার চিত্র আঁকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বাদশা মহম্মদ শাহ্, ছবিতে দেখেও ভয় পেয়ে শিউরে উঠেছিলেন, নিজাম-উল-মুলুককে

আদেশ করেছিলেন যে-কোন শর্তে সন্ধি ক'রে কলহ মিটিয়ে নিতে—সেই অমিতবীর্য সিংহসদৃশ ছেলে আমার এক অকালবৃদ্ধ যক্ষ্মা-রোগীতে পরিণত হয়েছে। মহারাজচক্রবর্তী, আপনি অনেক করুণ দৃশ্য নিশ্চয় দেখেছেন জীবনে—কিন্তু আমার ছেলেকে দেখলে আজ আর অশ্রুসংবরণ করতে পারবেন না। এমন কৃশ, এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে সে!'

বলতে বলতেই দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন রাধাবাঈ—উত্তেজনাতে নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হ'তেই বোধকরি খানিকটা থামতে হ'ল তাঁকে। তবে সে মুহূর্ত দুইয়ের বেশী নয়, সামান্য একটু দম নিয়েই আরম্ভ করলেন, 'ঐ পিশাচী ওকে শুষে খাচ্ছে ছত্রপতি। প্রতিদিন, অহর্নিশ শুষছে। একদিন এক মুহূর্তের জন্যও রেহাই দেয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্ত সঙ্গে যায়। পুরুষের বেশে অশ্বারোহণে পাশে পাশে থাকে সে। এ কী শুধুই সাহস ছত্রপতি? এ লোভ, দুর্জয় দুর্বার লোভ। লোভ আর আশঙ্কা। একমুহূর্তও চোখের বার করতে সাহস হয় না, পাছে জাদুর মায়া কেটে যায়। রণক্ষেত্রে অসংখ্য মৃতদেহের মধ্যেও ওদের জন্য তাঁবু পড়ে—নয়ত নির্লজ্জা, অপরাধ ক্ষমা করবেন রাজাধিরাজ, নির্লজ্জা উন্মুক্ত প্রান্তরেই রাত্রিবাস করে। দিবা-রাত্র ঐ সর্পিনীর নিশ্বাস সহ্য ক'রে ক'রে জর্জরিত হয়ে পড়েছে ছেলে আমার, তার দেহে এতটুকু রক্ত কি এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই আর। ধনে-প্রাণে মারছে ডাকিনী—। শান্‌ওয়ার ওয়াড়ার মস্তানী-মহল তৈরি করতে সতেরো লাখ টাকা খরচ হয়েছে, আজ পর্যন্ত বোধহয় ছত্রপতি তাঁর কোন মহিষীর মহল বানাতে এতটাকা খরচ করেন নি।···বিপুল ঋণ তার মাথায়, লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ, সম্ভবত কোটি টাকারও ওপর। এত ঋণ আমার ছেলে কোনদিন শোধ করতে পারবে না—তা সে-ও জানে। সে চিন্তাতেও সে জীর্ণ হয়ে পড়ছে অন্তরে অন্তরে—অথচ কোন প্রতিকার করতে পারছে না। প্রতিকারের সাধ্য নেই তার—ও মায়াবিনী

সামনে থাকতে কোন কিছুরই প্রতিকার করতে পারবে না—এইভাবে সর্বনাশের পথে নেবে যাবে। সর্বনাশ আর অকালমৃত্যু—এ আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। মা হয়ে সন্তান সম্বন্ধে এ ধরনের অশুভ কথা মুখে উচ্চারণ করতে নেই—কিন্তু বাধ্য হয়েই করতে হচ্ছে আমাকে। সে যে কতদূর অধঃপাতে গেছে, কতদূর আত্মবিস্মৃত হয়েছে তা একটা কথাতেই বুঝতে পারবেন—রক্ষিতা বারনারীর প্রাসাদ সাজাতে ফিরিঙ্গী আয়না আর আসবাব কিনেছে পটবর্ধন সাহেবের কাছ থেকে শতকরা ত্রিশটাকা সুদে তিন লাখ টাকা ধার ক'রে। সে সুদও নাকি চক্রবৃদ্ধি হারে চলবে। মহারাজ, কত টাকা তন্‌খা পায় আপনার মহামাত্য? এ বিপুল ঋণ কি তার জীবনে সে শোধ করতে পারবে? এ তো মাত্র একটা। শুনেছি সন্ন্যাসী মোহান্ত ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীর কাছে পর্যন্ত ছুলাখ আড়াই লাখ টাকা দেনা হয়ে গেছে ওর।'

এক নিশ্বাসে একটানা এতগুলো কথা বলতে ওঁর দম শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার বাধ্য হয়েই থামতে হল রাধাবাঈকে। শুধু থেমেই নিশ্বাস নিতে পারলেন না, দু' হাতে বুক চেপে ধরে নিঃশেষিত-শক্তি ফুসফুসে শূন্যতার যন্ত্রণা নিবারণ করতে লাগলেন।

কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি ছিল না ছত্রপতি শাহুর। এবার তিনিও চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। এত কথার কিছুই জানতেন না তিনি, কোন খবরই রাখেন নি এসব ব্যাপারের। যদি এসব কথার অর্ধেকও সত্য হয়, তাহলে রাজ্য ও রাজ্যেশ্বর—উভয়ের পক্ষেই চিন্তার কথা। যার হাতে রাজ্যের সমগ্র রশ্মি—যার ইঙ্গিতে এই বিপুল সাম্রাজ্য চালিত পরিচালিত হচ্ছে, তার যদি দৈহিক, আর্থিক এবং মানসিক অবস্থা এই হয় তো এ সাম্রাজ্য দাঁড়াবে কিসের ওপর, কার ওপর?

গম্ভীর মুখে সামান্য ভ্রূকুটি—রাধাবাঈয়ের চোখ এড়ায় নি। তিনি শান্ত ও আশ্বস্ত হলেন। বড় ভয় ছিল তাঁর, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন ছত্রপতিকে সহজে তাঁর মহামাত্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন করা যাবে না—

এটাই ধরে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতৃহৃদয়ে আরও একটা দুশ্চিন্তা দেখা দিল। সাধারণ স্ত্রীলোক হ'লে কিছুই ভাবতেন না। আবাল্য রাজনীতি ও কূটনীতির মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছেন বলেই এ সংশয়। তিনি সন্তানের একদিক দিয়ে উপকার করতে গিয়ে আর একদিক দিয়ে অপকার ক'রে বসলেন না তো? পেশোয়ার অমাত্য-পদ নিয়ে টানাটানি পড়বে না তো? শত্রু চারিদিকে। রঘুজী ভোঁসলে প্রবল শত্রু। সে আবার ছত্রপতির বিশেষ প্রিয়পাত্র। তার লোলুপ দৃষ্টি এই পেশোয়া পদের দিকে আছে বহুদিন থেকেই। এই সুযোগে সে এসে জেঁকে বসবে না তো তাঁর স্বামী-পুত্রের গৌরবোজ্জল আসনে? ইতিমধ্যেই রঘুজী বাজীরাওকে পিছন থেকে ছোরা মেরেছে বলতে গেলে—তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার নিজস্ব এলাকায় লুঠ-তরাজ চালিয়েছে।

তিনি ঈষৎ উৎকণ্ঠিত মুখেই আবার বললেন, 'তার একটা অসুস্থতার আরও কারণ—দেবী ভবানী ও ভগবান গণপতির দয়ায় আপনার রাজ্যের সীমা- ও শক্তি-বৃদ্ধি। প্রবলের শত্রু চারিদিকে, চারিদিকেই তাই অষ্ট-প্রহর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। বাজীরাও যখন দেশের শাসনভার নিয়েছিলেন তখনকার থেকে এখন কাজ অনেক বেড়েছে। সে কাজে যদি কিছু অবহেলা করত, যদি কাজ ফেলে ব্যসন নিয়ে থাকত, তাহলে শরীরটা অন্তত এত ভাঙত না। কঠোর পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা ও ঐ ডাকিনীর সংস্পর্শ—তিনে মিলে বাছাকে আমার শেষ ক'রে এনেছে। এই অল্প বয়সে—এখনও যে ওর চল্লিশ বছরও বয়স হয়নি—এই বয়সেই সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। ঐ রাক্ষসী, ঐ রাহুর কবল থেকে ওকে মুক্ত করুন—ও আবার স্বাভাবিক শক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরে পাবে, এ আমি জোর ক'রে বলছি।'

একটু শিথিল শোনাল বৈকি! একটু জোড়াতালি দেওয়া মনে

হ'ল কথাগুলো। উৎকণ্ঠাটাও চাপতে পারলেন না ভাল ক'রে—তাঁর মনের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল গলার আওয়াজে, চোখের দৃষ্টিতে। আর রাধাবাঈও তা বুঝলেন।

তবে সৌভাগ্যক্রমে সেদিকে বা তাঁর দিকে মন ছিল না ছত্রপতির। তিনি ভাবছিলেন বাজীরাও-এর কথা। নিজের চোখে সবটা দেখা দরকার। অবস্থাটা কতদূর গিয়েছে এবং কোথায় দাঁড়িয়েছে, নিজের জানা দরকার। দেখা দরকার বাজীরাওকে আর তার ঐ পত্নী বা উপপত্নীকে। ডাকিয়ে এনে নয়—তাদের ঘরে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে। সেদিনের কথাটা মনে পড়ছে। মস্তানীর কথাটা। তার চেহারাটা, তার কথাগুলো, তার সেই বিনত অথচ তেজোদৃপ্ত ভঙ্গী। রাজকন্যা, রাজবংশের কন্যা, তাতে কোন সন্দেহ নেই ছত্রপতি শাহুর। না হলে ও তেজ, ও কথার বাঁধুনী সম্ভব নয়। সেদিনের সব কথা—আদ্যোপান্তই—মনে পড়ছে ছত্রপতির। সেই প্রথম সভায় প্রবেশ করা থেকে শেষ পর্যন্ত। ঐ মেয়ে ডাকিনী, মায়াবিনী, জাদুকরী? বিশ্বাস হয় না। পুত্রের স্ত্রী বা তার প্রণয়িনী সম্বন্ধে জননীদের একটা স্বাভাবিক বিরূপতা থাকে—এও কি সেই রকম কিছু? এই অভিযোগ অনুযোগ?

আবার ভাবেন, রাধাবাঈ তো সাধারণ ঘরের সাধারণ জননী নন। তিনি যখন এতটা বলছেন, তখন তার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে নিশ্চয়। বাজীরাও-এর অসুস্থতাটাই হয়তো সত্য—কারণটা নয়।

একটা কথা মনে পড়ছে তাঁর। ত্র্যম্বকজী পিঙ্গলের কথাটা। কামরূপের কাহিনী শুনেছিলেন ছেলেবেলা থেকেই। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা নাকি ভয়ঙ্কর, মনের মতো পুরুষ পেলেই তারা ভেড়া ক'রে দেয়, আর পোষা ভেড়া হিসেবে বেঁধে রাখে। সুদর্শন বা বীর কোন পুরুষ গেলেই তারা আটকে ফেলে—তাকে আর বেঁচে ফিরে আসতে হয় না। এ কিম্বদন্তী বহুকালের। বহুলোকের

মুখে বহুবার শুনেছিলেন শাহু ছত্রপতি। তাই ত্র্যম্বকজী পিঙ্গলকে কামাখ্যা দর্শন ক'রে ফিরতে দেখে বিস্ময়ের সীমা ছিল না তাঁর। ত্র্যম্বকজী বহুকালের লোক, তাঁর চেয়ে বয়সে বড়—কিন্তু যখনকার ঘটনা তখনও ত্র্যম্বকজীর যৌবনের বীর্য বা কান্তি একেবারে লোপ পায় নি। এমন লোক সেই কুহকের দেশ ডাকিনীর দেশ থেকে ফিরে এল কী ক'রে ?

প্রশ্ন করেছিলেন তিনি ত্র্যম্বকজীকে—সোজাসুজি, সরল প্রশ্ন : 'আপনি যে ফিরে এলেন বড় ? আপনাকে তারা সহজে ছেড়ে দিল, ভেড়া ক'রে রাখল না ? তবে যে শুনেছি—সবাই বলে—'

প্রশ্নটা শুনে খুব খানিকটা হেসেছিলেন ত্র্যম্বকজী। বলেছিলেন, 'তবে যে কী শুনেছিলে ছত্রপতি, কামরূপ-বাসিনীরা পুরুষমাত্রকেই ভেড়া বানিয়ে দেয়—জাদুমন্ত্রে ?' হা হা ক'রে হেসেছিলেন তিনি আবারও। তারপর ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সেবা ও যত্ন ছাড়া অন্য কোন জাদু নেই তাদের। ওখানকার মেয়েরা যে নিটোল সেবা ও যত্ন ক'রে অতিথি মাত্রকেই, মন বুঝে ও সময় বুঝে—ঠিক প্রয়োজনমতো জিনিসটি যুগিয়ে দেয় হাতের কাছে—তাতে পুরুষমাত্রই অভিভূত হতে বাধ্য। ওখানকার গৃহস্থ-বধূরা বৃথা লজ্জার ধার ধারে না, অকারণ পর্দাও নেই—অথচ তারা বেহায়া বা ব্যাপিকা নয়, দারুণ পরিশ্রমী ও সেবাপরায়ণা। তার ওপর স্বভাবটিও মধুর, অক্লান্ত পরিশ্রম করে হাসিমুখে। তারা জানে পুরুষকে সেবা করা, তাকে সুখী করাই মেয়েদের প্রধান ধর্ম। সে ক্ষেত্রে কোন্ পুরুষ না ভেড়া বনে থাকতে চাইবে, কোন্ পুরুষ না অভিভূত মুগ্ধ হবে ?... আজ এতকাল পরে সেই কথাটাই মনে পড়ে গেল ছত্রপতির।

তিনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন ঐ মেয়েটিকে দেখে, সমস্ত বিরূপতা, সমস্ত সংস্কার মুছে গিয়েছিল তার কথা শুনে। কন্যা সম্বোধন করেছিলেন তিনি স্বেচ্ছায়। ও মেয়ে যদি বাজীরাওকে মোহগ্রস্ত করে রাখে, বাজীরাও যদি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য হয়ে তাকে

ভালবেসে থাকেন তো তার মধ্যে ডাকিনীর মায়া অনুমান করার কোন কারণ নেই।

তবু, অভিযোগও বড় গুরুতর। যাঁর মুখ থেকে বেরোচ্ছে কথা বা মতামতও উড়িয়ে দেবার মত নয়।

ভয়ও হচ্ছে বৈকি। বড় বেশী নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন তিনি। এতটা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা কোন নৃপতিরই উচিত নয়।

নিজের চোখেই দেখা দরকার।

কিন্তু কী উপলক্ষে যাবেন তাদের ওখানে? নৃপতির যেমন সর্ব-বিষয়ে সর্বোচ্চ অধিকার, যেমন সকলের ওপর আধিপত্য—তেমনি তাঁর দায়িত্ব ও সম্মানও বড় কম নয়। কোন প্রজা বা রাজকর্মচারীর ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে গিয়ে পড়া, তার সম্বন্ধে এতটা কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করা বড় মর্যাদাহানিকর। বিশেষ বিনা আমন্ত্রণে কোন কর্মচারীর বাড়ি গিয়ে পড়া—তা হোক না সে আত্মীয়ের মতো বা আত্মীয়াধিক।

বিপন্ন ও বিব্রত হয়ে যখন উপায় চিন্তা করছেন ছত্রপতি, অজুহাত খুঁজছেন ওদের বাড়ি গিয়ে পড়বার, তখন অকস্মাৎ অজুহাতের সন্ধান রাধাবাঈই দিয়ে দিলেন। এতক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ ক'রে আবার বললেন, 'সে গণিকা যে শুধু রাজাকে মানে না তাই নয়, তার অসহনীয় স্পর্ধায় সে দেবতাকেও তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে। ছত্রপতি নিশ্চয়ই শুনেছেন, তাঁকে নতুন করে শোনাতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা মাত্র—সে বিধর্মী হয়ে কুলটা হয়ে স্বচ্ছন্দে আমাদের কুল-দেবতা গণপতির মন্দিরে গিয়ে তাঁর সামনে নৃত্য করে—যে নৃত্যের অধিকার আমাদের দেশে আছে একমাত্র দেবতার পায়ে উৎসর্গীকৃতা দেবদাসীদেরই। এ স্পর্ধাও কি বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে হবে রাজাধিরাজ?'

ঠিক তো। এই কথাটাই তো মনে পড়ছিল না এতক্ষণ।

হঠাৎ যেন আঁধারে আলোর দিশা পেলেন ছত্রপতি, বিজন জটিল কান্তারণ্যে পেলেন পথের সন্ধান। মনে পড়ে গেল—মস্তানী তাঁকে বার

ত্র্যম্বকজ বিনয়-বচনে নিমন্ত্রণ করেছিল, গণপতির পূজা-বাসরে একবার ঘটনা তু ...ার জন্য, তার নাচ দেখবার জন্য। সে আমন্ত্রণ তিনি রাখেন নি, পায় রাখবার কথা ভাবেনও নি কখনো, সম্ভবত যে নিমন্ত্রণ করেছিল সে-ও ফি সে রকম আশা বা ভরসা করে নি। কিন্তু তা না করুক—অজুহাত হিসেবে এইটিই উত্তম।

আগামী কালই চতুর্থী তিথি, গণপতির বিশেষ পূজার দিন। নিশ্চয় শান্‌ওয়ার ওয়াড়াতেও সে আয়োজন হচ্ছে—বা হবে। এই উপলক্ষেই যাবেন তিনি, সাত মাস পূর্বের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

প্রসন্ন হয়ে উঠল ছত্রপতির মুখ। স্বভাবপ্রশান্ত ললাটের কুঞ্চন মিলিয়ে গিয়ে তা আবার পূর্বের উদার বিস্তৃতি ফিরে পেল। নিশ্চিন্ত হলেন শান্তিপ্রিয় ছত্রপতি। রাধাবাঈকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যান মা, আমি শীঘ্রই নিজে এ বিষয়ে তদন্ত করব, নিজে চোখে দেখব সমস্ত অবস্থাটা। তারপর আপনাকে জানাব আমার মতামত।'

যথোচিত আশীর্বাদ ও মঙ্গল কামনা ক'রে কৃতজ্ঞ রাধাবাঈ সেদিনের মতো বিদায় নিলেন।

ছত্রপতি নিজে সঙ্গে সঙ্গে সে মহলের দ্বার পর্যন্ত এসে তাঁকে তাঁর শিবিকায় তুলে দিয়ে গেলেন। তাঁর প্রাক্তন পেশোয়ার সহধর্মিনী ও বর্তমান পেশোয়ার গর্ভধারিনীকে এটুকু সৌজন্য প্রদর্শন কোন নরপতির পক্ষেই আতিশয্য নয়।

॥ ৭ ॥

শান্ত তড়াগ মধ্যে সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপের মতোই সেদিনকার সংবাদটা পেশোয়া প্রথম বাজীরাও-এর নবনির্মিত শান্‌ওয়ার

ওয়াড়া প্রাসাদে বিপুল চাঞ্চল্য ও অসংখ্য তরঙ্গাভিঘাতের সৃষ্টি করল।

খবর পৌঁছল সকাল বেলা—দিনের প্রথম প্রহর প্রায় শেষ ক'রে। আকারে ও শব্দগত অর্থে খবরটি খুবই ছোট এবং অকিঞ্চিৎকর। স্বয়ং ছত্রপতির শুভাগমন হবে আজ, তাঁর প্রধান মন্ত্রীর প্রাসাদে। আজকের বিনায়ক পূজা উপলক্ষে আয়োজিত প্রমোদানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন তিনি। আরতির সময় আসবেন —নৃত্যগীতাদি শেষ হ'লেই চলে যাবেন। পেশোয়া যেন ব্যস্ত না হন বা কোন আড়ম্বরের ব্যবস্থা না করেন। বিরাট কোন দলবল নিয়ে আসবেন না তিনি—প্রতিনিধি এবং আর তিন-চারজন মাত্র বন্ধু সঙ্গে থাকবেন।

শাহু যা-ই বলুন, রাজ-অতিথির আগমন হচ্ছে শুনলে যে-কোন লোকেরই ব্যস্ত হয়ে পড়বার কথা ; পেশোয়াও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। হুলস্থুল পড়ে গেল চারদিকে, সাজ সাজ রব উঠল। শান্‌ওয়ার ওয়াড়ার প্রাসাদ এমনিতেই নয়নাভিরাম, নব-নির্মিত প্রাসাদের পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান, তবু তাকেই সুন্দরতর ও উজ্জ্বলতর করে তোলবার আয়োজন চলতে লাগল, আলোক-সজ্জার ব্যবস্থা করতে তখন থেকেই ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল মশালচীরা, ফটকের সামনে অভ্যর্থনা-মণ্ডপ নির্মাণ শুরু হয়ে গেল—এবং যদি ছত্রপতি দয়া ক'রে গণপতির প্রসাদ গ্রহণ করতে সম্মত হন, এই সুদূর সম্ভাবনার কথা চিন্তা ক'রে পাকশালাতেও দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না।

প্রায় তিন-চার দণ্ড ধরে এই সব আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত ও তথ্যানুগ আদেশ-নির্দেশ দিয়ে যখন পেশোয়া অবশেষে ক্লান্ত ভাবে আসন গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর ললাটে বহু চিন্তা, বহু আশঙ্কা ও বহু অনুমানের জটিল জাল অসংখ্য কুঞ্চিত রেখার আকারে ফুটে উঠেছে। রাজনীতির কিছুই সরল ভাবে সহজ অর্থে গ্রহণ করতে নেই, কোন ঘটনাকেই তার বহিরঙ্গ দেখে বিচার করা

উচিত নয়, কোন বাক্যকেই তার শব্দগত অর্থে নয়—এইটেই হ'ল রাজনীতিকের প্রধান শিক্ষা।

কেন আসছেন ছত্রপতি ?

কী তাঁর উদ্দেশ্য ? এমন একটা কাণ্ড ক'রে বসতে গেলেন কেন তিনি ? যাঁকে সহজে নিজের প্রাসাদ থেকে নড়ানো যায় না—তিনি অকস্মাৎ আজ এতটা উদ্যমী হয়ে উঠলেন কেন ? এখানে আসার কী এমন কারণ ঘটল ? মহামাত্যের বাড়িতে আসায় রাজার দোষ নেই সত্য কথা—তবু যাকে অনায়াসে ডেকে পাঠানো চলে, তার বাড়িতে যেচে দেখা করতে আসার প্রয়োজন কি হ'ল ? মহামাত্যই হোন আর যাই হোন—রাজাধিরাজের কর্মচারী ছাড়া কিছু নন পেশোয়া। কর্মচারীর বাড়িতে উপযাচক হয়ে আসা মনিবের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় কি ?

নিশ্চয়ই কেউ কিছু লাগিয়েছে তাঁর নামে। হয়ত বা রাজস্ব অপহরণ ক'রে বিপুল ঐশ্বর্য-সঞ্চয়ের মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে। অথবা তাঁর ভোগবিলাস আড়ম্বরের কল্পিত চিত্র এঁকে দেখিয়েছে ছত্রপতিকে। তেমন বন্ধুর অভাব নেই পেশোয়ার। কিন্তু তবু, এর আগে ছত্রপতির প্রিয় অনুচর রঘুজী ভোঁসলে ও শ্রীপৎরাও তো বহুবার চেষ্টা করেছে বাজীরাও-এর নামে 'চুকলি খাবার'—কৈ, একবারও তো শাহু তা বিশ্বাস করেন নি বা বিচলিত হন নি। তাঁর স্বভাব-ঔদার্যে কথাটা এড়িয়ে চলে গেছেন, প্রিয় পারিষদদেরও যেমন কিছু বলেন নি—তেমনি বাজীরাওকেও না।

তবে, আজ এমন কে কী বলল ? কে কী বলতে পারে ?

নিজের মনের দিকে, জীবনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, ভাল ক'রেই তাকিয়ে দেখেছেন পেশোয়া, আজও দেখছেন, ন্যস্ত বিশ্বাসের এতটুকু অমর্যাদা তিনি করেন নি। নিজে আকণ্ঠ ঋণে ডুবে গেছেন সত্য কথা, কিন্তু রাজকীয় তহবিল তছরূপ করেন নি এক কপর্দকও।

না, কিছুই ভেবে কূল-কিনারা পান না যেন—কোন পথই

দেখতে পান না। শুধু ক্লান্ত শরীর যেন আরও অবসন্ন হয়ে আসে। অবশেষে একসময় মনে পড়ে সেই মানুষটির কথা—যে সর্বদা সকল অবস্থাতে তাঁর চিত্তকে প্রসন্ন ক'রে তুলতে পারে, যার অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও বুদ্ধির দীপ্তি যে-কোন অন্ধকার দূর ক'রে আশা ও আশ্বাসে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে পারে চারিদিক। সেই মস্তানী-মহলেই লোক পাঠান তিনি—অসামান্য অনন্যসাধারণ সেই মানুষটির খোঁজ।

খবরটা মস্তানীও শুনেছিল। তার মহল থেকে এই তোড়জোড় ও কর্মব্যস্ততাও দেখেছিল। হেসেছিল সে আপন মনেই—আর অপেক্ষা করছিল তার প্রিয়তমের ডাকটির। সে জানত যে তাকে নইলে পেশোয়ার চলবে না এ-সময়ে, এই আপাত-সংকটকালে বিশেষ মন্ত্রীটিকে কাছে চাইই তাঁর।

আজও, এই দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার মধ্যেও, মস্তানীকে দেখে নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পেশোয়ার মুখ। অন্তহীন সমস্যার জটিল রেখাগুলো দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল কোথায়। প্রসন্ন ও শান্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

'এই যে, এসেছ। বুদ্ধি দাও দিকি! মহা সমস্যায় পড়েছি।'

'কিসের সমস্যা?—ছত্রপতি হঠাৎ কেন আসছেন—সেই সমস্যা?'

'ঠিক তাই।' হাসি মুখেই বলেন পেশোয়া। এই জন্যই এই মেয়েটিকে এত তারিফ করেন তিনি। এক মুহূর্তও বৃথা সময় নষ্ট করে না সে—এর সঙ্গে কাজের কথা কয়ে তাই এত সুখ। বৃথা বা কপট বিনয়ও নেই।

'আমার নাচ দেখতে। তাঁকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলুম, মনে নেই?'

'সেটা তো গৌণ, বা প্রকাশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি?'

'আপনাকে দেখতে আসছেন তিনি।'

'আমাকে? কেন হঠাৎ আমাকে দেখতে আসার কী এমন জরুরী দরকার পড়ল তাঁর? আর তাও, আমাকে ডেকে পাঠালেই তো সে কাজটা হ'তে পারত।'

'ওগো, শুধু তো আপনি নন। আমাকেও যে দেখতে হবে তাঁর। দুজনকে মিলিয়ে—একসঙ্গে।'

'তার মানে?'

এবার খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে মস্তানী, রজতঝরা কণ্ঠে। তার পর অকস্মাৎ পেশোয়ার কোলে বসে পড়ে দুহাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'মহামান্য পেশোয়া দিল্লী থেকে মহীশূর, গুজরাট থেকে বাংলার প্রতিটি লোকের প্রত্যেকটি ঘটনার হিসেব আর খবর রাখেন, কিন্তু তাঁর ঘরে তাঁরই ছত্রছায়ায় যারা বাস করছে তাদের খবর রাখেন না একটুও! প্রদীপের নিচেই যে ছায়া—তা আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়।'

প্রেয়সী নারী কোলে বসেছে, গালের ওপর রেখেছে গাল—সুখে ও আরামে শরীর এলিয়ে আসছে পেশোয়ার। তবু তিনি বলেন, 'তার মানে।'

'জননী রাধাবাঈ যে কাল নিশীথরাত্রে শিবিকারোহণে প্রাসাদের বাইরে গিয়েছিলেন, সে খবর কি আপনি রাখেন?'

'রাখি।' অপ্রত্যাশিত উত্তর দেন বাজীরাও, 'রাত্রে প্রাসাদ থেকে যে কেউ বাইরে যাক—সে খবর আমার কানে ঠিক পেঁছয়।'

'কোথায় গিয়েছিলেন সেটা জানেন কি?'

'না, তা জানি না। মা কোথাও বিনা কারণে বা অন্যায় কাজে যাবেন না—এটা জানি বলেই খবর নিই নি আর।'

'খবর আমিও নিই নি। তবে অনুমান করতে পারি। দুইয়ের সঙ্গে কোন একটি সংখ্যা মিলে যখন দেখি চার হচ্ছে তখন সেই অজ্ঞাত সংখ্যাটিও যে দুই তা অনুমান করতে দেরি হয় কি? দেবী রাধাবাঈ নিশ্চয়ই ছত্রপতির কাছে গিয়েছিলেন।'

'যাঃ! কী বলছ তুমি? তা কি সম্ভব?'

'ঠিকই বলছি মহান পেশোয়া। যা অপর কোন রমণীর পক্ষে কল্পনাতীত তা রাধাবাঈ বার্ভের পক্ষে নিতান্তই তুচ্ছ—সহজ ব্যাপার। ভুলে যাবেন না পেশোয়া, আপনার জননী শিক্ষিতা, সামান্য সংস্কার কোন দিন তাঁর চিন্তা বা কর্মপ্রণালীকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি! সে সব গল্প তো কতবার আপনার মুখেই শুনেছি।...আপনার শরীর ভেঙে আসছে, আপনি ঋণে ডুবে যাচ্ছেন এ দেখেও কি কোন জননীর পক্ষে চুপ ক'রে থাকা সম্ভব? বিশেষ আপনার মা-র মতো তেজস্বিনী মহিলার? আমার প্রভাব কাটাতে এক মাত্র রাজার দ্বারাই হয়ত আপনাকে প্রভাবিত করা সম্ভব—এই ভেবেই নিশ্চয় ছত্রপতির কাছে গিয়েছিলেন তিনি,—আর তাই এতকাল পরে ছত্রপতির মনে পড়েছে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা!'

চুপ ক'রে থাকেন পেশোয়া। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না ঠিক, তবু কথাটা যে একেবারে অবিশ্বাস্য নয় তাও বুঝতে পারেন। রাধাবাঈয়ের পক্ষে সবই সম্ভব। সামান্য কোন মৌখিক সঙ্কোচে নিজের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হবেন—এমন স্ত্রীলোক নন তিনি। বরং —জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুত্রের কল্যাণের জন্য এ ধরনের কাণ্ড ক'রে বসা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সাহসের অভাব নেই তাঁর—একথাটা ঠিক। প্রচলিত সংস্কার ত্যাগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অসীম সাহসের কথা; সে সাহসও তাঁর আছে।...মনে পড়ে তাঁর বাল্যের একটি ঘটনার কথা। এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ সামন্ত মাহার জাতীয়া একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাস করেছেন এই নিশ্চিন্ত প্রমাণ পাওয়ার পর যখন অন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ সামন্তরা ক্ষুব্ধ এবং সেই লোকটিকে জাতিচ্যুত ও কর্মচ্যুত করতে উদ্যত, তখন এই রাধাবাঈই আশ্চর্য ঔদার্য দেখিয়ে স্বামী বিশ্বনাথ রাওকে ধরে মাত্র পাঁচ টাকা জরিমানায় অব্যাহতি দিইয়েছিলেন। কারণ দেখিয়েছিলেন—অবশ্য আড়ালে—ওরা সত্যিই ভালবাসে পরস্পরকে। সেই

রাধাবাঈ নিজের পুত্রের সত্যকার প্রণয়ে বিচলিত হয়ে এতখানি কাণ্ড ক'রে বসবেন—এইটেই বুঝি প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

বাজীরাও হাসেন মনে মনে।...

তিনিও চুপ ক'রে থাকেন, মস্তানীও। একজনের বুকে আর একজন বুক পেতে শোনে পরস্পরের বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠবার শব্দ। কপোলে কপোল রেখে অনুভব করে সীমাহীন স্নেহ ও পরিমাপহীন প্রেম। এমনি আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আছে বুঝি ওদের দুজনের হৃদয়ও। চিন্তা কল্পনা অনুভূতি স্বপ্ন সবই বুঝি ওদের এমনি জড়াজড়ি একাকার হয়ে গেছে কবে।

শেষে মস্তানীই এক সময় চুপি চুপি ডাকে, 'পেশোয়া।'

'উঃ—?' কোন্ তন্দ্রায় তলিয়ে যেতে যেতে যেন সাড়া দেন বাজীরাও।

'সত্যিই বড় কৃশ হয়ে গেছেন আপনি। বড় দুর্বল আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এই বিপুল দায়িত্ব, বিরামহীন চিন্তা আর বিরতিহীন কঠোর পরিশ্রম—এতে লোহার শরীরও ভেঙে পড়ে পেশোয়া। আপনার শরীর লোহার চেয়েও সুদৃঢ় তাই এখনও টিকে আছেন। কিন্তু সব সহ্যেরই সীমা আছে একটা। এর ওপর রমণী-সম্ভোগ কিছুতে আর সইছে না আপনার। অন্তত কিছুদিনের জন্য আমাকে দূরে কোথাও সরিয়ে দিন, খুব দূরে কোথাও, আপনার রাজ্যের প্রত্যন্তসীমায়—যেখানে আমি আপনার নাগাল পাব না, শুধু আপনার শক্তির ছায়াটা পাব। আমার জন্য ভাববেন না পেশোয়া, আমার ছেলে থাকবে সঙ্গে, মায়ে-পোয়ে বেশ কাটিয়ে দেব। আপনার শরীর একটু সারুক—আবার যেদিন ডাকবেন সেইদিনই চলে আসব আপনার পায়ের কাছে। এক বছর না হয়—ছ'টা মাসের জন্যেও আমাকে কোথাও নির্বাসন দিন, দোহাই আপনার।'

'আবার ঐ পুরনো কথা মস্তিবাঈ? কতদিন কতবার তোমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দেব? ক্লান্ত আমি ঠিকই—ক্লান্ত আর অবসন্ন, কিন্তু

সে তোমার জন্যে নয় মস্তি, সে ছত্রপতির আর মারাঠাজাতির সেবার পরিশ্রমেই। বরং তুমি আমার আত্মার আনন্দ, চিত্তের বিশ্রাম। ক্লান্তিতে তেজস্কর সুরার কাজ করে তোমার সঙ্গ। তোমার বুদ্ধি আমার অবসন্ন মস্তিষ্ককে নব-সঞ্জীবনী শক্তি যোগায়, তোমার মধ্যে আমি প্রাণ পাই, নিজের সেই পুরাতন বলিষ্ঠ সত্তাকে খুঁজে পাই। তুমি আছ বলেই আজও আমি আছি, আজও আমি ভারতত্রাস পেশোয়া বাজীরাও—নইলে এ জীর্ণ খাঁচাটা কবে ভেঙে-চুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেত, মুটা নদীর তীরে একমুষ্টি ছাই হয়ে যেত তোমার প্রিয় এই দেহখানা।'

'শুধু আমার নয় পেশোয়া, আপনার এ দেহ হিন্দুস্থানের বহু রমণীরই প্রিয়। শুনেছি মুঘল হারেমের নারীরাও আপনার তসবীর দেখে উন্মত্ত। হয়তো সেই বহু রমণীর ঈর্ষার বাষ্পেই আমার ভাগ্যের আকাশে মেঘ জমেছে আজ।'

তারপর ঈষৎ তিক্তকণ্ঠে বলল, 'অথচ কীই বা পেলুম—আপনার ভালবাসা ছাড়া। সব মেয়েই নিজের ছেলের কথা ভাবে—আপনি কথা দিয়েছিলেন আমার গর্ভজাত ছেলে যাতে সগর্বে তার পিতৃ-পরিচয় দিতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তবু কি তাকে জেনেউ দিতে পারলেন, পারলেন তাকে হিন্দু নামে পরিচিত করতে? আমি জোর করতে পারতুম, আপনাকে বিব্রত করা হবে বলে সে জিদ আমি করি নি—তবুও এই দুর্নামে আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেল যে, আমি নিজের স্বার্থের জন্যে আপনাকে ভুলিয়ে আপনার সর্বনাশ করছি, আপনার মৃত্যুর কারণ হচ্ছি। আপনার প্রিয়তমা মহিষী কাশীবাঈ আর আপনার জননী রাধাবাঈ সে কথা যখন-তখন কারণে-অকারণে বলে বেড়াচ্ছেন চারদিকে। নির্বোধ মূর্খের দল তা বিশ্বাসও করছে। একবারও ভাবে না যে আপনার মৃত্যু মানে আমারও মৃত্যু। ঈশ্বর করুন সে দুর্দিন যেন শতবর্ষেও না আসে, কিন্তু যদি তেমন দুর্ভাগ্য আমার কোনদিন হয়—ওরা কি

মনে ক'রে ভাগ্যের কাছে মাথা লুটিয়ে তার পরও আমি বেঁচে থাকব!'

'থাক থাক মস্তি, এমন মধুর প্রভাতটা তুমি নষ্ট করো না। এখানে থাকতে সকালে বা দিনে তো তোমার সঙ্গে দেখাই হয় না, সেইজন্যেই তো যুদ্ধযাত্রায় যেতে আমার এত উৎসাহ—এমন দুর্লভ সুযোগ যদি বা মিলেছে ছত্রপতির কৃপায়, না-ই বা সেটাকে তিক্ত ক'রে তুললে। আমরা আমাদের ভালবাসি, এসো না সেই বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরতার স্বর্গে দু দণ্ড বিশ্রাম করি এখন।'

'আপনি যে শুধু শৌর্যে ও বুদ্ধিতেই অপরাজেয় নন, বাক-পটুতাতেও অতুলনীয়—তা আমি আগেও মেনে নিয়েছি পেশোয়া, আজও নিচ্ছি। চিরদিনই আপনি চুম্বনে ও প্রেমগুঞ্জনে আমার রসনা স্তব্ধ ক'রে দিয়েছেন, আজও দেবেন—এ আর আশ্চর্য কি?'

মস্তি আরও নিবিড় আলিঙ্গনে চেপে ধরে বাজীরাওকে—যেন সেই ক্ষীণ দেহ সত্তায় নিজের যৌবন স্বাস্থ্য ও উৎসাহ সঞ্চারিত ক'রে দিতে, উজ্জীবিত ক'রে তুলতে তাঁকে নূতন উদ্যম ও কর্মপ্রেরণায়।

॥ ৮ ॥

ছত্রপতি সেদিন শিবিকায় না চেপে কেন অকস্মাৎ অশ্বারোহণে তাঁর মহামাত্যের বাড়ি এসেছিলেন তা কেউ জানে না। তবে সংবাদটা অশ্বারোহী সংবাদ-সংগ্রাহকদের ডাক-মারফৎ অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিল শান্‌ওয়ার ওয়াড়ায়। সুতরাং রীতি-অনুযায়ী বাজীরাওই এসে ঘোড়ার লাগাম ধরলেন ছত্রপতির, হাত ধরে নামালেন তাঁকে।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করলেন—কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠল ছত্রপতির শান্ত ও সদাপ্রফুল্ল মুখ। কারণটাও বুঝতে দেরি হ'ল না। প্রথমটা চিনতে পারেন নি ছত্রপতি তাঁকে—শেষ তাঁদের দেখার পর

এই ক'মাসে এতই পরিবর্তন হয়েছে। সেই বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় দুঃসাহসী যোদ্ধা বাজীরাওকে আজকের এই শীর্ণ অকালবৃদ্ধ প্রায়-কুব্জ—সামনের-দিকে-ঝুঁকে-পড়া মানুষটাকে চেনা সত্যিই কঠিন। চিনতে পারেন নি বলেই—সাধারণ কোন কর্মচারী ভেবে প্রথমটা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এই সৌজন্যটুকু রাজচক্রবর্তীর প্রাপ্য। তিনি যদি দয়া ক'রে কারও গৃহে অতিথি হয়ে যান তো—বাইরে এসে শিবিকা কি বাহন থেকে নামাবার দায়িত্ব গৃহস্বামীর। এই জেনেই ঘোড়ায় চেপে এসেছেন ছত্রপতি। শিবিকা এলে মহলের মধ্যে বিনায়ক মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত যাবে, সেখানে আলো-আঁধারিতে ভাল ক'রে দেখা মুশকিল। ঘোড়া থেকে নামাতে হ'লে বাইরে আসতে হবে, সেখানে অগণিত মশালের আলোতে ভাল ক'রে দেখা যেতে পারবে।

দেখা গেলও অবশ্য। চিনতেও পারলেন একটু পরেই। কিন্তু তাতেও ছত্রপতির মুখ প্রসন্ন হ'ল না। প্রসন্ন হবার কোন কারণও নেই। এ পেশোয়াকে দেখবেন তিনি—তা আশঙ্কা করেন নি একবারও। এ কে? এ তো তাঁর সেই দুর্ধর্ষ অপরাজেয় অমিত-শক্তিধর মহামাত্যের প্রেতাত্মা! এর ওপর ভরসা ক'রে তিনি বসে আছেন! এ আর ক'দিন! যদি বা বেঁচে থাকে কোনমতে আরও কয়েকটা মাস—এর কাছ থেকে কী কাজ পাবেন! কতটুকু করতে পারবে এ!

অবশ্য ঠিক নিজের স্বার্থের জন্যই এতটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন শাহু এটা বললে তাঁর ওপর অবিচার করা হবে। বাজীরাও তাঁর বন্ধু-পুত্র, প্রাক্তন পেশোয়ার সঙ্গে তাঁর একটা সখ্য ও পারস্পরিক নির্ভরতার ভাব গড়ে উঠেছিল—তা তিনি ভোলেন নি। সেই মনে ক'রেই আরও তিনি প্রায়-কিশোর বাজীরাওকে এনে এই উচ্চপদে বসিয়েছিলেন একদিন—বহু বন্ধু ও আত্মীয়ের সতর্কবাণী নিষেধ উপেক্ষা করে। সে জন্য পরে অনুতপ্ত হ'তে হয় নি কোনদিন—এও এই অপত্যাধিক স্নেহ গড়ে ওঠার আর এক কারণ।

সেই স্নেহই আজ এতটা বিচলিত ক'রে তুলেছে তাঁকে। সেই সঙ্গে কঠিন ক'রে তুলেছে তাঁকে মস্তানী সম্বন্ধে। দেখা যাচ্ছে তাহলে রাধাবাঈয়ের কথাই ঠিক। হাজার হোক তিনি শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মহিলা—আজীবন রাজ্যশাসন-আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিপালিতা। বিশ্বনাথ রাও-এর সহধর্মিনী, কর্মসঙ্গিনী—তিনি মানুষ না চিনলে কে চিনবে?

না, এর একটা কিছু প্রতিবিধান করতেই হবে তাঁকে।

কিন্তু মনে মনে যত কিছুই প্রতিজ্ঞা ক'রে থাকুন—ভগবান বিনায়কের সন্ধ্যারতি ও বন্দনা-গান শেষ হবার পর যখন তন্বী লাবণ্যবতী তরুণী মস্তানী স্বচ্ছ রেশমের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে আসরে এসে প্রথমে দেবতাকে পরে ছত্রপতিকে প্রণাম করল, তখন তার সুকুমার মুখের শান্ত সমাহিত ভাবে, বিনম্র ভঙ্গিতে ও দেহের অপরূপ গতিছন্দে মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না শাহু। প্রণামের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাত তুলে বরাভয় মুদ্রায় আশীর্বাদ জানালেন।

বিরূপতা তখনই কাটতে শুরু করেছিল—ক্রমশ সেটা নিঃশেষ হয়ে গিয়ে কখন যে আন্তরিক প্রীতিতে পরিণত হল সেটা বুঝতেও পারলেন না ছত্রপতি শাহু। নাচ তিনি অনেকদিন অনেক রকম দেখেছেন, তাঁর প্রাসাদে বেতনভুক্ নর্তকী ছাড়াও দেশ-বিদেশের অনেক নর্তকী এসে নাচ দেখিয়ে গেছে তাঁকে। তাঁর সামন্ত বা আশ্রিত ভূস্বামীদের গৃহেও অনেক নর্তকী দেখেছেন, প্রতিনিধি বা পেশোয়ার ঘরে আমন্ত্রিত হয়ে এসে নাচ দেখাও এই প্রথম নয়, কিন্তু ঠিক এরকমটি যে ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখেন নি—তা মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন ছত্রপতি শাহু। এ তো ঠিক নাচও নয়—সাধারণ অর্থে নাচ বলতে যা বোঝায়—তার কিছুই তো নেই এর এই লঘু পদ ও লঘুদেহের সঙ্গীত-ভঙ্গিমায়। নর্তকীও তো নয় এই মেয়েটি—এর মধ্যে সে লাস্য, সে ভাববিলাস, সে

রিরংসাউদ্দীপনকারী ভঙ্গী কোথায়? কোথায় এর দৃষ্টিতে সে কুসুমশয্যার ইঙ্গিত, অক্ষিপল্লবে চিরকালীন নারীর সে আমন্ত্রণ? এ তো পূজাই। ঐ যে পুরোহিত কিছু পূর্বে সন্ধ্যারতি সেরে গেলেন—তার চেয়ে অনেক সার্থক বন্দনা এর, অনেক সত্য এর অর্চনা এর প্রতিটি ভঙ্গিমাই তো আরতি, এর প্রতিটি নমস্কারই পূজা।

অভিনয়?

না, কোন্‌টা অভিনয় আর কোন্‌টা অভিনয় নয়—তা বোঝবার ক্ষমতা বহুদর্শী ছত্রপতির আছে। এ বয়সে খাঁটি আর মেকীর বিচার বহুবারই করতে হয়েছে তাঁকে—এবং অদ্যাপি কোন ক্ষেত্রে ঠকেন নি। অতি প্রিয় বন্ধুদের উপেক্ষা ক'রে রাষ্ট্রের এই দ্বিতীয় সর্বোচ্চপদে যখন একুশ বছর বয়সের বাজীরাওকে অধিষ্ঠিত করেন, তখনই তাঁর এই বিচারবুদ্ধির চরম বিচার হয়ে গেছে।

এই মেয়েটির এই ভক্তিতদ্‌গত ভাব, একান্ত আত্মসমর্পণের এই পবিত্র ভঙ্গী—এ যদি সত্য না হয়, এর মধ্য দিয়ে যদি শুদ্ধা ও সতীরমণীর দীপ্তি না প্রকাশিত হয়ে থাকে তো—এ পর্যন্ত যা কিছু তিনি সত্য ও শ্রেয় বলে জেনে এসেছেন তা সবই মিথ্যা, সবই অকিঞ্চিৎকর।

না, এ মেয়ে খাঁটি সোনা, অথবা তার চেয়েও বেশী—অন্তত তাঁদের, যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের কাছে—খাঁটি ইস্পাত; এর মধ্যে কোথাও কোন ভেজাল নেই, খাদ নেই।…

একমনে নেচে চলেছে মস্তানী, তন্ময় হয়ে, তদ্‌গত হয়ে। তার একদিকে ভগবান, আর একদিকে রাজ্যেশ্বর ও হৃদয়েশ্বর; এর মধ্যে সে যে কাকে এ নাচ দেখাচ্ছে উজাড় ক'রে দিচ্ছে তার শিক্ষা-দীক্ষা-ভক্তি-ভালবাসা, তার সমস্ত সত্তা, সমস্ত অস্তিত্ব,—তা সেই জানে। কিন্তু থামছে না সে, তার যেন ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। তার এ পূজা বুঝি অনন্তকালের, তার এ আত্মনিবেদনও বুঝি অনন্তেরই পায়ে।

অবশেষে এক সময়ে প্রায় অর্ধপ্রহর-কাল একটানা নেচে—যখন শুদ্ধ মাত্র সঙ্গতকারীদের অবশ-হয়ে-আসা হাতের দিকে ও তাদের চোখের করুণ মিনতির দিকে চেয়েই শেষ পর্যন্ত থামতে হয় তাকে—তখন মুগ্ধ অভিভূত ছত্রপতির মন থেকে সমস্ত বিদ্বেষ ও বিরূপতা মুছে গেছে, সে জায়গায় ফুটে উঠেছে এক অপরিসীম বিস্ময়। তিনি স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে স্বয়ং আসন থেকে উঠে এগিয়ে গেলেন তাকে পুরস্কৃত করতে, হাতের কাছে কিছু না পেয়ে নিজের উষ্ণীষ থেকেই মুক্তার মালা খুলে তাকে উপহার দিতে উদ্যত হলেন।

মস্তানীর চোখ থেকে তখনও ভক্তি-বিহ্বলতা কাটে নি, কণ্ঠ ও ললাটের স্বেদ-কণিকার সঙ্গে কপোলের অশ্রুবিন্দুগুলো মিশে কী যেন এক অনির্বচনীয় মোহের সৃষ্টি করেছে সে মুখে। ছত্রপতি বুঝলেন বাজীরাও-এর অবস্থা। যুগ যুগ ধরেই এই সব মেয়েদের দ্বারে পুরুষরা চিরভিখারী। উমার কাছে শঙ্কর, লক্ষ্মীর কাছে নারায়ণ, ইন্দ্রাণীর কাছে মহেন্দ্র। দেবতারাই যদি না এ মোহ সংবরণ করতে পেরে থাকেন—মানুষ বাজীরাওকে কী দোষ দেবেন তিনি।

তিনি স্মিত প্রসন্ন মুখে সপ্রশংস চিত্তে উপহার-সুদ্ধ দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করলেন নর্তকীর দিকে। কিন্তু ততক্ষণে কিছুটা সংবিৎ ফিরে পেয়েছে মস্তানী, সে সে-উপহার তখনই গ্রহণ করল না, তাই বলে প্রত্যাখ্যানও করল না—সসম্মানে রাজ্যেশ্বরের ঈপ্সিত বরাভয় হস্ত মাথায় ঠেকিয়ে হেঁট হয়ে তাঁকে প্রণাম করল, তারপর মুক্তাহারটি হাতে নিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বিনম্রকণ্ঠে বলল, 'শুধু উপহার নয় মহারাজ চক্রবর্তী, আপনার এ কন্যার লোভ কিছু বেশী। আরও কিছু ভিক্ষা আছে তার। যদি সত্যিই প্রসন্ন হয়ে থাকেন এ অধিনীর ওপর, যদি সত্যিই কিছু তৃপ্তি বা আনন্দ দিতে পেরে থাকি তো, দয়া ক'রে একটি বরও দিন আমাকে।'

'বেশ তো, নির্ভয়ে বলো কী চাও। যদি সাধ্যে কুলোয় তো অবশ্যই দেব।'

'ছত্রপতি মহারাজ—আমি আপনার কাছ থেকে বর-রূপে একটি দণ্ডই প্রার্থনা করছি। হয় আমাকে আপনার রাজ্যসীমা থেকে নির্বাসন দিন, নয়তো এমন কোন দুর্গে বন্দী ক'রে রাখুন যেখানে আমার পুত্র ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির যাবার অধিকার না থাকে।'

ছত্রপতি নির্বাক। সমস্ত সভাও তাই।

বোধ করি একটি পালক উড়ে এসে পড়লেও তার শব্দ শোনা যেত—এমনই সুগভীর স্তব্ধতা নেমে এল চারিদিকে কিছুক্ষণের জন্য।

কী বলছে এ মেয়েটা!

এর মাথা ঠিক আছে তো?

অতিরিক্ত পরিশ্রমে সব গোলমাল হয়ে যায় নি তো?

ছত্রপতি প্রথম দর্শনেই বিস্মিত হয়েছিলেন এই মেয়েটি সম্বন্ধে, বিস্মিত আজ কিছু পূর্বেও বড় কম হন নি, কিন্তু সে বিস্ময়ের জাত আলাদা। আজকের এই মুহূর্তের বিস্ময় শুধু তাঁকে হতবাক্ নয়—হতবুদ্ধিও ক'রে দিল খানিকটা। বহুক্ষণ শুধু বিহ্বল হয়ে চেয়েই রইলেন তিনি।

আর বাজীরাও! তিনি সেই নৃত্যের শুরু থেকেই নিস্পন্দ নির্বাক হয়ে বসে ছিলেন, একটি কথাও কন নি বা আর কোন দিকে ফিরে চান নি। তাঁর দৃষ্টি সেই যে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্থিরনিবদ্ধ হয়ে ছিল মস্তানীর ওপর, সে দৃষ্টি আর সরিয়ে নিতে পারেন নি একবারও। শুধু, তাঁর প্রিয়তমার গতির সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখের মণিই ঘুরেছে ফিরেছে—মুখ বা চোখ নড়ে নি কোথাও। বুঝি পলকই পড়ছিল না, এমন নিশ্চল হয়ে চেয়ে ছিলেন তিনি।

কিন্তু এবার তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। যে বিস্ময়ের আঘাত ছত্রপতিকে স্তম্ভিত ক'রে দিল, সেই আঘাতেই বাজীরাও সক্রিয় ও

অস্থির হয়ে উঠলেন। বিষম উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এলেন তাঁর দয়িতা মস্তিবাঈয়ের দিকে।

'এ—এসব কী বলছ মস্তি, কী বলছ তুমি ছত্রপতিকে! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

'না পেশোয়া, আমি যা বলছি ঠিকই বলছি, ভেবে-চিন্তেই বলছি। দুঃসহ ক্লান্তিতে যদি আপনার মস্তিষ্ক পর্যন্ত অবসন্ন হয়ে না পড়ত, তাহলে এ কথা আপনিই বলতেন, এ প্রার্থনা আপনিই জানাতেন।'

অনুচ্চস্বরে হলেও বেশ স্পষ্টভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বলে মস্তানী। তারপর আবারও সেই বিকশিত কমলদলের মতো দুটি শুভ্র কোমল হাত একত্র ক'রে বলে, 'মহারাজচক্রবর্তী, আপনার দীনা কন্যার এই ভিক্ষা, এ প্রার্থনায় কোন ছলনা বা কপটতা নেই—সত্যিই এখন এ আমার আন্তরিক প্রার্থনা।...ছত্রপতি মহারাজ, আপনি আপনার প্রিয় সেবক এই মহান পেশোয়ার দিকে চেয়ে দেখুন। গুরুতর রাজকার্যে, নিরন্তর বহু সমস্যার চাপে ও অবিরাম যুদ্ধে ইনি ক্লান্ত। তার ওপর আমাকে উপলক্ষ ক'রে ঘরেও এঁর একবিন্দু শান্তি নেই। আরও সেই কারণেই অহরহ কর্মব্যস্ত থাকেন উনি, এতটুকু বিশ্রাম নেবার মতো স্থান বা অবসর ওঁর নেই। আমি দূরে সরে না গেলে মনের শান্তি বা দেহের বিশ্রাম কোনটাই উনি পাবেন না। এ দাসী বহুদিন সেবা করেছে ওঁর, আর কেন? আমারও কিছু ছুটি পাওনা হয়েছে এবার। সেটাই আমি দূর নির্বাসনে কিংবা নির্জন কারাবাসে ভোগ করতে চাই। মহামান্যা মহিষী কাশীবাঈ আমার জন্যেই স্বামীর সেবা থেকে বঞ্চিত, আমার ওপর অভিমান ক'রে তাঁর এবং আমাদের প্রভুর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচনা করেছেন অপ্রীতি আর অশান্তি দিয়ে। আমি সরে গেলেই তিনি কাছে আসবেন—তাঁর সেবায় উনি শুধু দৈহিক আরাম নয়, মানসিক শান্তিও ফিরে পাবেন। ফিরে পাবেন মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রীতি, পুত্রের ভক্তি। আমার জন্যেই উনি সংসারে যা কিছু

ঈপ্সার বস্তু তা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। আমার নির্লজ্জতা ক্ষমা করবেন—আমার সেবায় যে শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে ওঁর মহিষী কাশীবাঈয়ের সেবায় তা নেই, ছ'মাস বৎসরকাল সে সেবা পেলে শরীর ওঁর সুস্থ সবল হয়ে উঠবে, গ্লানিমুক্ত হবেন সব দিক দিয়েই।···আমার জন্য না হোক, আপনার প্রিয় পেশোয়ার দিকে চেয়েই অধিনীর ভিক্ষা মঞ্জুর করুন রাজাধিরাজ।'

অভিভূত হয়ে শুনছিলেন ছত্রপতি। বিস্মিত হবার শক্তিও যেন শেষ হয়ে এসেছে তাঁর। কী বলছে মেয়েটা, কী বলতে চায়? নিজে নিজের সর্বনাশ করতে চায় এমন মেয়ে তো তিনি দেখেন নি এর আগে।···যে অপ্রীতিকর কর্তব্যের, যে শাস্তিদানের সঙ্কল্প নিয়ে উনি এসেছিলেন—অপরাধিনী সেই শাস্তি পুরস্কার হিসেবে চেয়ে বসল! এমন প্রার্থনার জন্য কোন মানসিক প্রস্তুতিই ছিল না যে তাঁর! কর্তব্যের পথ এমন অভাবনীয় ভাবে সুগম হয়ে গেল—তবু অস্বস্তি কমল না তো!

বড়ই বিব্রত বোধ করলেন শাহু। একটু কেমন দ্বিধাভরে চাইলেন পেশোয়ার দিকে। এ মেয়েটি যা বলছে, কাল রাধাবাঈও তাই বলেছিল; এবং তা কিছুমাত্র অসত্য বা অতিরঞ্জিত নয়। তবু বিনা দোষে বিনা অপরাধে এমন শাস্তিই বা দেওয়া যায় কি ক'রে—বিশেষ যে মেয়েটি তার কাজে কথা-বার্তায় সত্য-সত্যই স্নেহের পাত্রী হয়ে উঠছে ওঁর।···

সেই অস্বস্তিকর নীরবতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা থেকে বাজীরাওই রক্ষা করলেন ছত্রপতিকে। তিনিও এবার সামলে নিয়েছেন নিজেকে, প্রস্তুত হয়েছেন এই নাটকের অভিনয়ে যথাযথ অংশ গ্রহণ করতে। বৃথা সঙ্কোচ তিনি করবেন না—মিথ্যা চক্ষুলজ্জার অবসর আর নেই। তিনিও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ক'রে করজোড়েই নিবেদন করলেন তাঁর বক্তব্য। শান্ত অথচ বেশ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'মহারাজচক্রবর্তী, আপনি অন্নদাতা, প্রতিপালক, দেশের রাজা—সব দিক দিয়েই

পিতৃতুল্য। আপনি শুধু আমার নন—আমার পিতারও অন্নদাতা, পৃষ্ঠপোষক বন্ধু। আপনার সামনে মিথ্যা বলছি না। আমি সত্যই ক্লান্ত, অসুস্থ। দেহ ও মন দুই-ই আমার অবসন্ন। আপনার বিপুল সাম্রাজের দায়িত্ব আমার ওপরে, ঈশ্বর জানেন সে দায়িত্ব আমি বুকের রক্ত দিয়ে বহন করেছি। তাও হয়ত পারতুম না—যদি না আমার এই স্ত্রী মস্তানী আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত ছায়ার মতো। ছত্রপতি মহারাজ, আমি জেনে-শুনেই ওকে আমার স্ত্রী বলছি। এক পবিত্র গোধূলিলগ্নে ওর পিতৃপুরুষের দেবতাকে সাক্ষী রেখে আমাদের শুভদৃষ্টি ঘটেছিল, ওর পিতা আমার হাতেই ওকে সম্প্রদান করেছেন, মেয়েটিও সেই থেকে অনন্যমনা হয়ে আমাকে ভজনা করেছে—এ যদি বিবাহ না হয় মহারাজ তো বিবাহের কী অর্থ আমি বুঝি না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এখন এই দুর্বল শরীরে ও-ই আমার অবলম্বন, ও যদি পাশে না থাকে প্রয়োজনের সময়, তাহলে এ শরীর যে আর একদিনও এ অবহনীয় কর্মভার বইতে পারবে, তা মনে হয় না। আমার মা, আমার স্ত্রী বা ভ্রাতারা এটা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না—তাঁরা অকারণ অশান্তি সৃষ্টি করছেন, সেই অশান্তি থেকে আমাকে বাঁচাতেই নিজে থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড নিতে চাইছে বেচারী—কিন্তু আমি আপনাকে এবং আমাদের কুলদেবতাকে সামনে রেখে বলছি—তাতে অশান্তি আমার কমবে না একটুও, শরীরও রক্ষা হবে না।'

এক নিশ্বাসে নিজের বক্তব্য নিবেদন ক'রে থামলেন বাজীরাও। কিন্তু এইটুকু পরিশ্রমে আর উত্তেজনাতেই তাঁর শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, ফলে যা একেবারেই রীতিবিরুদ্ধ, যা একান্ত অশোভন তাই ক'রে বসলেন, অথবা করতে বাধ্য হলেন। ছত্রপতি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই অবসন্নভাবে, যেন টলতে টলতে একটা আসনে বসে পড়লেন।

আর চোখের পলক না ফেলতে ফেলতেই, বোধকরি বাজীরাওর

মুখ দেখেই অনুমান করতে পেরেছিল, মস্তানী ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে তাঁর আঙরাখার মধ্যে দিয়ে হাত চালিয়ে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তার উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল চোখ দুটি নির্নিমেষে তখন বাজীরাও-এর মুখের উপরই স্থাপিত, রাজা প্রতিনিধি রাজ-পারিষদ, পেশোয়ার বন্ধু, পুরোহিতের দল—এমন কি মন্দিরের দেবতাও তার চোখ থেকে তার মন থেকে তখন অবলুপ্ত।

ছত্রপতি কিছুকাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এই মধুর জগৎসংসার-বিস্মৃত প্রণয়-দৃশ্যটি উপভোগ করলেন। তাঁর দৃষ্টি থেকে আন্তরিক প্রীতি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হ'তে লাগল এই দুটি অল্পবয়সী নরনারীর ওপর। তারপর কে জানে কেন ঈষৎ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি তোমার অসুস্থ প্রভুরই সেবা করো বসে, এখন তোমার দূরে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। আর পেশোয়া, আমি কালই আমার নিজস্ব বৈদ্যকে পাঠাব, তাকে দেখিয়ে তুমি নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে, সম্ভব হয় তো কিছুদিন নির্জনে কোথাও বিশ্রাম নাও। তোমার ভাই চিমনজী যেমন বীর তেমনি সদ্বিবেচক, তোমার সাময়িক অনুপস্থিতিতে সে-ই তোমার কাজ বেশ চালাতে পারবে। তুমি অবশ্যই ছুটি নিও, অন্তত তিন-চার মাসের জন্য।'

বাজীরাও-এর তখন কথা কইবার অবস্থা নয়। বুকে কী একটা ব্যথা উঠছে আজকাল—একটু উত্তেজনাতেই টের পান এটা—সেই সঙ্গে একটা শুকনো কাশির ধমক—কথা বলার চেষ্টাও তখন সাধ্যাতীত। তাই ছত্রপতিকে তাঁর প্রস্তাবের অবাস্তবতাটা বুঝিয়ে দেওয়া গেল না; বলা গেল না যে, এ সময়ে রাজ্যের ঘরে-বাইরে প্রবল শত্রু, উদ্যত-বজ্রের মতো মহদ্ভয় পেশোয়া এতটুকু সরে গেলেই সেই সমস্ত শত্রু মাথা তুলবে। ভাই চিমনজী আপ্পাও বহুদূরে সুরাটে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত, তার পক্ষে এখানে এসে পেশোয়ার গুরু কর্তব্যভার গ্রহণ সম্ভব নয়—এসব কোন কথাই

বুঝিয়ে বলা গেল না। শুধু নীরবে দুটি হাত তুলে প্রণাম জানিয়ে মনিবের প্রীতি ও শুভেচ্ছা মাথা পেতে নিলেন পেশোয়া বাজীরাও।

তাঁদের উঠতে বা ব্যস্ত হ'তে বা কোন প্রকার প্রত্যনুগমনের চেষ্টা করতে নিষেধ ক'রে কর্তব্য-সম্পাদন-তৃপ্ত ছত্রপতি শাহু সেদিনের মতো বিদায় নিলেন।

॥ ৯ ॥

এ সংবাদ যথাসময়েই রাধাবাঈয়ের কাছে পৌঁছল। তাঁর এ শোচনীয় ব্যর্থতার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই শুনলেন তিনি। একটি কথাও বাদ গেল না—একটি তথ্যও না। সমস্ত নাটকটাই যেন তাঁর চোখের সামনে অভিনীত হ'তে দেখলেন, প্রধান পাত্র-পাত্রীদের অবস্থান মুখভাব সুদ্ধ।

সংবাদদাতা একাধিক। মন্দিরের পুজারীর দল থেকে শুরু করে দ্বাররক্ষকরা পর্যন্ত। সকলের বক্তব্যই শুনলেন তিনি, কিন্তু উত্তরে কথা বললেন না একটিও। শুধু একটির পর একটি তাঁর পরাজয়ের ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে তাঁর দৃষ্টি কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠল এবং উদ্গত ভয়ঙ্কর রোষ দমন করতে নিজের ওষ্ঠাধর নিজের দাঁতে চেপে শোনিতাক্ত ক'রে তুললেন।

বোধকরি রক্তের সেই লবনস্বাদেই প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন রাধাবাঈ। রুধির-পিপাসা ? হ্যাঁ—মহাকালীর মতোই আজ তিনি তার দেহ রুধির-পিপাসু হয়ে উঠেছেন। ঐ মেয়েটার মুণ্ড নিজে হাতে ছিঁড়ে থেকে সদ্যনির্গত রক্ত খর্পর ভরে পান করতে পারলে কথঞ্চিৎ শান্ত হয় তাঁর এই দিক্‌দাহকারী রোষ। কিন্তু তবু, এ অপমান এবং এই প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি এদের সামনে না প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ছিঃ! সে বড় দৈন্য, সে বড় লজ্জার কথা। পেশোয়া বিশ্বনাথ রাও-এর স্ত্রী তিনি, বাজীরাও-এর জননী—তাঁর মর্যাদা তাঁর প্রাণের

চেয়েও বড়। যে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে দেবীর মতো মান্য করে, তাদের চোখে ছোট হওয়া চলবে না কিছুতেই।

তিনি কোনমতে নিজেকে সামলে—অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির জোরে কণ্ঠস্বরকে সহজ ও স্বাভাবিক ক'রে তুলে ওদের বিদায় ক'রে দিলেন। সংগৃহীত সংবাদের মূল্য হিসাবে কিছু পুরস্কার দিতেও ভুল হ'ল না তাঁর।

কিন্তু সংবাদদাতার দল নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতেই, আবার চোখে আগুন জ্বলল রাধাবাঈয়ের। সে আগুন এমনই তীব্র, এমনই দাহিকা-শক্তিসম্পন্ন যে মনে হ'ল সেই আগুনই বহু প্রাচীর-দেওয়াল এবং উদ্যানের ব্যবধান পার হয়ে এই মুহূর্তে মস্তানীমহলে পৌঁছে সে মহলের অধীশ্বরীকে দগ্ধ করবে। ক্রোধে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি বহু গালাগালি দিলেন, একা একাই বসে। অথবা একা-একা বলেই দিতে পারলেন। অন্য কোন লোক—এমন কি সমব্যথী বধূ কাশীবাঈয়ের সামনেও তিনি এ ইতরতা প্রকাশ করতে পারতেন না।···সম্ভ্রমবোধ, আত্মমর্যাদা-জ্ঞান এবং নিজের পদবীর মূল্য কোন অবস্থাতেই তাঁদের ভুলতে নেই, এই শিক্ষাই—বলতে গেলে আজন্ম—তাঁর পিতা ও স্বামীর কাছে পেয়েছেন।

বহুক্ষণ ধরে সেই দ্বিতীয়-প্রাণীশূন্য ঘরে বসে ইতর স্ত্রীলোকদের মতো গালিগালাজ ও অভিসম্পাৎ বর্ষণ করে কিছুটা সুস্থ হলেন রাধাবাঈ। সম্ভ্রমবোধ ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন—তবু মনের গোপন-নির্জনে এটা তিনি স্বীকার করেন যে, দ্বেষ-ঈর্ষা-ক্রোধের মুহূর্তে সাধারণ সামান্য রমণীদের মত কলহ-কেজিয়া বা গালিগালাজ করতে পারলে মনটা অনেক সুস্থ ও সহজ হয়, মনের ভার নেমে যায় অনেকটা। আজ আরও একবার, মনে মনে, সেই পরীক্ষিত সত্যটাই মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

মনের অবস্থা অনেকটা শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে এলেও সে রাত্রে তাঁর আহার হল না। দেবী ভবানীর প্রসাদী মিষ্টান্ন, শ্রীখণ্ড ও

মালপোয়া নিত্য আসে তাঁর সেবার জন্য, আজও এসেছে; কিন্তু আহারে রুচি বা ইচ্ছা নেই তাঁর একবিন্দুও। উপায়ও নেই। সন্ধ্যায় বারকয়েক ইষ্টমন্ত্র জপ ছাড়া সান্ধ্য সাধনার অন্য কোন কৃত্য তাঁর হয়ে ওঠে নি। তিনি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ, অন্য লোক, বিশেষত স্ত্রীলোকের মতো পরচর্চা পরনিন্দা করতে করতে—কিংবা বিষয়-চিন্তা করতে করতে ভগবদারাধনা করতে পারেন না। মন শান্ত ও একাগ্র না হলে পূজা-পাঠের মূল্য কি? আজ সন্ধ্যা থেকেই মন পড়ে আছে তাঁর বিনায়ক-মন্দিরের আসন্ন নাটকের দিকে, কী হয় কী হয় এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত—কিছুটা অধীরও—সে সময় ইষ্ট-আরাধনার অভিনয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

অবশ্য তাতেও ঠিক আহার আটকাত না। গুরুদেবের স্পষ্ট নির্দেশ আছে এ বিষয়ে, 'আত্মাকে কষ্ট দিয়ে পূজা-পাঠ-আরাধনা করতে যেও না। মন পড়ে থাকবে কখন এসব পালা চুকিয়ে একটু জল খেতে পাবো সেই দিকে—সে অবস্থায় কোন পূজা-পাঠ হয় না।' নিত্য-পূজা অসমাপ্ত রেখে এ রকম আহার দু-একবার করেওছেন। কিন্তু আজ আর তার প্রয়োজন নেই। রুচিই নেই আহারে। কিছুতেই রুচি নেই তাঁর। তাঁকে, তাঁর স্বামীর জীবদ্দশায় সকলে বলত সিংহের উপযুক্ত সিংহিনী—কথাটা আংশিক সত্য তো বটেই। শুধু আহার কেন—নিদ্রাও অসম্ভব আজ তাঁর পক্ষে। এ অনাচারের কোন প্রতিবিধান করতে না পারলে, আজকের এ অপমানের কোন প্রতিশোধ উপায় ভেবে বার করতে না পারলে, কিছুই হয়ে উঠবে না তাঁর। আহার নিদ্রা পূজা—কিছুই না। কুহকিনী ডাকিনী তার জাদুর শক্তির অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে অবশেষে সিংহিনীর ঘুম ভাঙিয়েছে তার গুহায় এসে, নৃত্যরতার লঘু পদক্ষেপ পদাঘাত হয়ে বেজেছে সিংহিনীর গায়ে—এর শোধ না তোলা পর্যন্ত সে সিংহিনী শান্ত হ'তে পারবে না।

বহুরাত্রি পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন রাধাবাঈ তাঁর ঘরে। দাসীদের আগেই ছুটি দিয়ে দিয়েছেন, নইলে তারা তাঁর শয়নের অপেক্ষায় বাইরে বসে বসে ঢুলত আর মধ্যে মধ্যে রাত্রির গভীরতা স্মরণ করিয়ে দিতে অকারণে ঘরে ঢুকে তাঁকে বিরক্ত করত। কেউ নেই, কোন অবাঞ্ছিত উপস্থিতি তাঁর চিন্তার সূত্র ছিন্ন করবে না—এমনি স্তব্ধ নির্জনতাই তখন তাঁর প্রয়োজন।

নিজের আসনেই স্থির হয়ে এক ভাবে বসে রইলেন রাধাবাঈ। শয্যা অস্পর্শিত রইল; অদূরে রুপোর ঢাকায় চাপা ভবানীর প্রসাদও। অন্য দিন—না খেলেও একবার মাথায় ঠেকিয়ে প্রসাদের মর্যাদা রক্ষা করেন—আজ সে কথাও মনে রইল না। অবশেষে, প্রাসাদের ঘড়িতে যখন ঢং ঢং ক'রে তিনটে বেজে আসন্ন রাত্রিশেষের বার্তা ঘোষণা করল তখন তিনি অকস্মাৎ নড়ে-চড়ে বসলেন। মুখে-হাতে জল দিয়ে শয্যার শিয়রের দিকে একটি কাঠের বাক্সে রাখা কাগজ, লেখনী, বালুর পাত্র ও মস্যাধার বার ক'রে সেই রাত্রেই প্রদীপের আলোতে চিঠি লিখতে বসলেন।

পর পর দুখানি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন তিনি। একটি তাঁর পুত্র আপ্তাজী বা চিমনজীকে, আর একটি পৌত্র বালাজীকে। দুজনকেই সংক্ষেপে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিশাজী বা বাজীরাও-এর স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা, তার প্রধান কারণ এবং কোন একটা উপায় উদ্ভাবনের জরুরী প্রয়োজন লিখে জানালেন। প্রতিকারের উপায়ও কিছু চিন্তা করেছেন তিনি, কিন্তু পুত্র বা পৌত্র কেউ হাতের কাছে না থাকলে সে চিন্তা কার্যকরী ক'রে তোলা সম্ভব নয়। একা অসহায় স্ত্রীলোক রাজশক্তির বিরুদ্ধে কী এবং কতটুকুই বা করতে পারেন? সুতরাং ওরা যেন পত্রপাঠ কোন ছুতোয় এখানে চলে আসে একবার—কোনমতেই না এর অন্যথা হয়।...

চিঠি শেষ ক'রে নিজের হাতে শীলমোহর ক'রে যখন বধূ কাশীবাঈয়ের মহলের দিকে রওনা হলেন তখন পূর্বাকাশ রঞ্জিত ক'রে

ঊষা নয়—সূর্যই দেখা দিয়েছেন।' অন্য দিন এসময় স্নান সেরে পূজাতে বসে যান তিনি। তা হোক, এটুকু পুষিয়ে নিতে পারবেন তিনি, মধ্যাহ্নের পূর্বে জলগ্রহণ না হয়ে ওঠে একটু চরণামৃত পান ক'রে সন্তানদের কল্যাণ করবেন। কিন্তু এ চিঠি ঢুটো আজই যাওয়া চাই। আর সেজন্য কাশীবাঈয়ের সাহায্য প্রয়োজন। এখন আর তিনি এ গৃহের কর্ত্রী নন, পেশোয়ার মহিষীও নন। দূরে ঘোড়সওয়ার পাঠাতে গেলে পেশোয়ার অনুমতি প্রয়োজন, একমাত্র তাঁর মহিষীই পারেন সে অনুমতি না নিয়ে কাউকে পাঠাতে। বাজীরাও-এর কানে গেলেও কোন তিরস্কার করতে বা বরখাস্ত করতে পারবেন না সে ঘোড়সওয়ারকে।···

কাশীবাঈকে বলে ঘোড়সওয়ার তৈরি করিয়ে একেবারে রওনা ক'রে দিয়ে তিনি যখন নিজের মহলে ফিরলেন তখন প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। দাসীরা, পূজারী ব্রাহ্মণরা সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে। তা হোক, তাঁর নিজের মন অনেকটা শান্ত হয়েছে এবার—নিশ্চিন্ত মনেই উপাসনাতে বসতে পারবেন।

সংবাদটা সেই দিনই বাজীরাও-এর কানে পৌঁছেছিল কিন্তু অতটা গ্রাহ্য করেন নি। স্ত্রীলোকদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ কলহ-কচকচি তো আছেই—তাতে আর কোন্ পুরুষ কবে কান দিয়ে নিজেদের কাজ নষ্ট করে? অন্তত যারা পুরুষ বলে পরিচিত হ'তে চায়, যাদের কিছুমাত্র গর্ব আছে পৌরুষের—তারা করে না; বাজীরাও এই বিশ্বাসই ধরে ছিলেন।

কিন্তু সে বিশ্বাসে প্রথম আঘাত লাগল যখন ভাদ্রের মাঝামাঝি ভাই চিমনজী আপ্পা পর্তুগীজ-দমনের কাজ অসমাপ্ত রেখে অকস্মাৎ পুনায় ফিরে এলেন। বিস্মিত হলেন বাজীরাও, বিরক্তও হলেন। পর্তুগীজরা পরাজিত হয়েছে ঠিকই এবং চিমনজী সে যুদ্ধে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা তাঁদের বংশেরই উপযুক্ত তাতেও সন্দেহ নেই—তবু

কাজ যে ওখানে অনেক বাকী। শত্রুর শক্তি নির্মূল ক'রে মারাঠা-শক্তির মূল বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করে আসা উচিত ছিল তাঁর, আর এ কাজে ভাই যে দাদার থেকে বেশী উপযুক্ত—বাজীরাও মনে-প্রাণে তা বিশ্বাস করেন। আপ্পাজী মিষ্টভাষী মধুর স্বভাবের লোক, অথচ দৃঢ়চেতা এবং সুশাসক। আরও অন্তত মাসছয়েক তার ওখানে থাকা উচিত ছিল। তার এই হঠকারিতার ফলে ঐ ছমাসের কাজ হয়তো বারো বছর পিছিয়ে যাবে।

চিমনজীকে তিনি মৃদু তিরস্কারও করলেন এ জন্যে। এত ব্যস্ত হয়ে ফিরে আসবার কী দরকার ছিল? তেমন বুঝলে সে লিখল না কেন, অনায়াসেই তিনি বধূমাতাকে ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারতেন, যথেষ্ট লোকলশকর সঙ্গে দিয়ে। আরও কঠিন তিরস্কারের জন্যই তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন মনে মনে কিন্তু চিমনজীকে দেখে আর রূঢ় কথা বলতে পারলেন না। চিমনজী কখনই তাঁর মতো স্বাস্থ্যবান বা কান্তিমান ছিল না, কিন্তু এত কৃশ ও এত দুর্বলও ছিল না সে। বড়ই রুগ্ণ দেখাচ্ছে; আর ঐ কাশিটা, অহরহ একটা খুকখুকে কাশি—ওটাও ভাল নয়। দীর্ঘদিনের যুদ্ধে—অনিয়মিত আহার অপর্যাপ্ত নিদ্রা ও অবিরাম উদ্বেগ দুশ্চিন্তা ও মস্তিষ্ক চালনার ফলেই এটা হয়েছে। ভালই হয়েছে এখানে এসে, যদি কিছুকাল বিশ্রাম নিয়ে একটু সুস্থ হয়ে উঠতে পারে তো সব দিক দিয়েই মঙ্গল। এইসব দ্রুত চিন্তা ও আত্মবিচারের ফলেই নির্গমোদ্যত কঠোর তিরস্কার কতকটা মৃদু অনুযোগের আকারেই বেরিয়ে এল। এ অবস্থায় এটুকু বলাও উচিত ছিল না হয়ত—কিন্তু বহুক্ষণের প্রস্তুতি একেবারে সামলে নিতেও পারলেন না বাজীরাও। হয়ত এটা তাঁরও রুগ্ণ অশক্ত শারীরিক অবস্থার ফল।

কিন্তু এই অনুযোগের যে উত্তর পেলেন তাতে আরও একটা শক্ত আঘাত লাগল তাঁর। চিমনজী মাথা নত ক'রে অথচ সুস্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমার স্ত্রীর জন্যই আমি ছুটে চলে এসেছি—

আপনার এ ধারণা কেন আর কেমন ক'রে হ'ল তা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার এতকালের জীবনযাত্রা দেখে যদি আপনি আমার সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়ে থাকেন তো খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু কৈ, আমি তো এমন আচরণ কখনও করেছি বলে মনে পড়ে না—যাতে আপনার এ ধারণা হ'তে পারে। এক স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর একবার বিবাহ করেছি সত্য—কিন্তু ব্রাহ্মণের সংসার-ধর্মপালনে স্ত্রী অপরিহার্য বলেই তা করতে হয়েছে। তাও, আমার যে বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে সে বয়সে কোন কোন দেশে পুরুষের প্রথম বারই বিবাহ হয় না। আর ব্রাহ্মণের বহু স্ত্রী গ্রহণেও বাধা নেই, আমি তো একটি গত হ'লে আর একটি গ্রহণ করেছি। সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমি উপপত্নী বা গণিকা গ্রহণ করি নি কখনও, বারনারীকে নিয়ে এসে অন্তঃপুরেও স্থান দিই নি। একথা, এত জোর গলায় আমার গুরুজনরা সকলে বলতে পারবেন কিনা সন্দেহ।'

কথাগুলো যেন চাবুকের মতো এসে পড়ল বাজীরাও-এর মুখের ওপর। মুখ-চোখ অরুণবর্ণ হয়ে উঠল তাঁর দুঃসহ ক্রোধে। তবু শেষ পর্যন্ত আত্মাজীর চোখের ওপর থেকে চোখ নামিয়েই নিতে হ'ল তাঁকে। এর কোন উত্তরও দিতে পারলেন না। কারণ, উত্তর দিতে গেলে আবার কি প্রত্যুত্তর শুনবেন কে জানে। তাঁর প্রিয়তমা সম্বন্ধে অসম্মান-সূচক কোন কথা শুনলে হয়ত শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবেন না নিজেকে। ভাইয়ের সঙ্গে, বিশেষত যে ভাই সম্বন্ধে তাঁর স্নেহ ও গর্বের শেষ নেই সে ভাইয়ের সঙ্গে ইতরদের মতো কলহ-কেজিয়া করতে পারবেন না তিনি; স্ত্রীলোকের কথা নিয়ে তো নয়-ই।

একটুখানি চুপ ক'রে রইলেন পেশোয়া বাজীরাও। তার মধ্যেই, শুধু যে এই অসহ্য ক্রোধই সংবরণ করলেন তাই নয়, নিজের বুদ্ধি-বৃত্তিকেও অনেকটা গুছিয়ে সামলে সংযত ক'রে নিলেন। চিন্তার কাজ অত্যন্ত দ্রুত চলতে লাগল ভিতরে ভিতরে। কেন

এসেছে তা তাঁর অজানা নেই—এখন সে উদ্দেশ্যটা কী করে ব্যর্থন না করা যায় এই চিন্তাই তাঁর সর্বাগ্রগণ্য। যেন সেই চিন্তার অবসর খুঁজতেই কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'তা এসেছ ভালই হয়েছে, তোমার শরীর এত খারাপ হয়েছে আমি বুঝতে পারি নি। আরও আগেই আসা উচিত ছিল হয়ত। অন্তত আমাকে একটা খবর পাঠালেও তো পারতে। আমি অন্য লোক পাঠিয়ে তোমাকে সরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতুম, প্রয়োজন হয় তো নিজেই যেতুম তোমার পরিবর্তে।'

এত কঠিন ও মর্মঘাতী অপমানের পরিবর্তে দাদার মতো ক্রোধী লোকের কাছ থেকে এই কোমল কণ্ঠস্বর ও আন্তরিক স্নেহ আশা করেন নি চিমনজী। তিনি যেন ঈষৎ অপ্রতিভই হয়ে পড়লেন সে জন্যে। সে লজ্জা ঢাকতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমি কিন্তু শারীরিক ক্লান্তির জন্যও ফিরে আসি নি পেশোয়া, আমি এসেছি আপনার অসুস্থতার সংবাদ পেয়েই। মা-র পত্রে জানলুম যে, আপনার শরীরের অবস্থা দেখে শুধু মা বা এ প্রাসাদের অন্তঃ-পুরিকা কি আপনার আত্মীয়-বান্ধবরাই নন—স্বয়ং ছত্রপতি পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। এ সংবাদের পর আর স্থির থাকতে পারি নি—তাতে যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তো তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

'না না, এ আর অপরাধ কি! এ উৎকণ্ঠা তো স্বাভাবিকই। তোমার মতো স্নেহপরায়ণ ভাইয়েরই উপযুক্ত। আচ্ছা, ওখানকার বন্দোবস্ত আমি একটা ক'রে ফেলব এখনই, সে জন্য তোমার কুণ্ঠিত হবার প্রয়োজন নেই।' ততক্ষণে তিনি পথ খুঁজে পেয়েছেন, আত্মরক্ষার পথ; যতই ক্লান্ত আর ক্লিষ্ট হয়ে পড়ুন—তীক্ষ্ণধী ভারতত্রাস বাজীরাও-এর পক্ষে এই সময়টুকুই যথেষ্ট, একটা উপায় খুঁজে বার করার; তিনি আরও কোমলকণ্ঠে বললেন, 'ভালই হয়েছে তুমি এসেছ। তোমার প্রয়োজন ছিল কায়িক বিশ্রামের,

না। আমার প্রয়োজন কিছুদিন চিন্তা থেকে বিরত থাকার—তুমি যদি এখানে থেকে কয়েকমাস আমার কাজ কিছু কিছু দেখতে পারো তাহলে সত্যিই ভাল হয়। তুমিও বাঁচ—আমিও বেঁচে যাই। বড়ই ক্লান্ত আমি, এতবড় রাজ্যের চিন্তা যেন আর আমার মাথায় ঢুকছে না। অন্তত কিছু কিছু কাজ তুমি অনায়াসে দেখতে পারবে। একমাত্র তোমার ওপরই আমার বিশ্বাস আর ভরসা আছে।'

চিমনজী আপ্পাও বুদ্ধিমান, কিন্তু ভাইয়ের বুদ্ধির নাগাল তিনি পান না প্রায়ই, আজও পেলেন না। তবে এমন নির্বাক হয়ে আর কখনও যেতে হয় নি তাঁকে! জীবনে বোধ করি এই প্রথম তিনি উত্তর দেবার মতো কোন কথা খুঁজে পেলেন না। মা-র পত্রে এবং বিভিন্ন গুপ্তচরদের মুখে যা সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে পেশোয়ার তরফ থেকে একটা তীব্র প্রতিবাদ ও প্রবল বিরোধেরই আশঙ্কা করছিলেন, সেই ভাবেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন মনে মনে—এমন ভাবে এত সহজে আত্মসমর্পণের কথা ভাবেন নি।

কে জানে কী ভাবছেন দাদা, কী ওঁর মতলব। কোন্ জালে ওঁকে জড়াতে চান তিনি, আর কোন্ পথে নিজের মুক্তির উপায় ভাবছেন। অনেক ভেবেও কোন হদিস পেলেন না আপ্পাজী, আর তা পেলেন না বলেই তখন কোন উত্তরও দিতে পারলেন না। 'যে আজ্ঞে' বলে সম্মতি জানিয়ে অনেকটা নিরীহ মেষশাবকের মতো চলে আসতে হ'ল পেশোয়ার সামনে থেকে।

॥ ১০ ॥

মতলবটা অবশ্য বুঝতে খুব দেরিও হ'ল না। তবু যেটুকু সংশয় থাকতে পারত—দুটো তিনটে দিন যেতে আরও পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। জরুরী রাজকার্য যা রাজধানীতে বা প্রাসাদে বসে করা যায় তার তাবৎই চিমনজী আপ্পার ওপর চাপিয়ে পাকাপাকি ভাবে

মস্তানী-মহলে বাসা বাঁধলেন বাজীরাও। একেবারেই নড়েন না সেখানে থেকে, কারও সঙ্গে দেখাও করেন না। কেউ এলে দ্বার-রক্ষকরাই ফিরিয়ে দেয় বাইরে থেকে—পেশোয়ার শরীর অসুস্থ এখন দেখা হবে না, কাজের কথা যা কিছু চিমনজীর সঙ্গে কইতে হবে। নইলে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে—পেশোয়া কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত।

আরও একবার নীরবে অধর দংশন করলেন রাধাবাঈ। বুদ্ধিমান চিমনজী আপ্পার মাথা হেঁট হ'ল। তাঁদের মাতাপুত্রের পরিকল্পনা ছিল কোনমতে পেশোয়ার অনুপস্থিতিতে—তা নিতান্ত সাময়িক অনুপস্থিতি হলেও চলবে—তাঁরা মস্তানীকে বন্দী করবেন এবং নিশীথ রাত্রের অন্ধকারে এমন কোন জায়গায় গোপনে পাঠিয়ে দেবেন—এমন কোন কিল্লায়, যেখানকার সংবাদ বাজীরাও না পান। চিমনজীর নিজস্ব পাহাড়ী কিল্লা আছে গুটি তিন-চার, সেখানে আটকাতে পারলে নিশ্চিন্ত। আর যাই হোক, পেশোয়া নিজের ভাইয়ের তালুকে গিয়ে হামলা করতে পারবেন না, লোকলজ্জায় বাধবে।

কিন্তু এ কী হ'ল ?

পেশোয়ার অনুপস্থিতিতে যা করা যায়, পেশোয়ার সামনা-সামনি তা করা সম্ভব নয় কিছুতেই। এমন কারও সাহস নেই এ প্রাসাদে যে, সেই সিংহের সামনে থেকে তার সহচরী বা সঙ্গিনীকে কেড়ে আনবে। তা হোক না সে সিংহ রুগ্‌ণ আর দুর্বল।

দুজনেই ছটফট করতে লাগলেন। অবশ্য দুজন অর্থে চিমনজী আর তাঁর মা নন। এ ব্যাপারে চিমনজীর সহানুভূতি যতটা—সক্রিয় সহযোগিতার ইচ্ছা ততটা নয়। যতই হোক, বড় ভাই—এবং ছত্রপতির পরেই এ রাজ্যের প্রধান, সর্বময় কর্তা। তাঁর বিরাগ-শুধু নয়, রোষ-ভাজন হওয়া খুব প্রীতিকর হবে না। চিমনজী মনে মনে এখনও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন তাঁর দাদাকে—দাদার বুদ্ধি,

শৌর্য, দূরদৃষ্টি এবং প্রশাসন-ক্ষমতার জন্য। চিরকালের মতো সেই লোকের বিষ-দৃষ্টিতে পড়তে খুব ইচ্ছা নেই তাঁর।

ছটফট করছেন দুটি স্ত্রীলোকই—শাশুড়ি আর তাঁর পুত্রবধূ। রাধাবাঈ আর কাশীবাঈ। কাশীবাঈয়ের সপত্নী-যন্ত্রণা, রাধাবাঈয়ের প্রতিপত্তি-নাশের জ্বালা। কাশীবাঈ সহধর্মিনী কিন্তু স্বামীর ওপর স্বামীত্ব স্থাপন করতে কোনদিনই পারেন নি। সেজন্য কাশীবাঈকে একটু করুণা-মিশ্রিত স্নেহের চোখেই দেখতেন রাধাবাঈ। তার সম্বন্ধে কোন বিদ্বেষ কখনও অনুভব করেন নি। দুর্জয় দুঃসাহসী বীর যশস্বী পুত্রের ওপর তাঁর নিঃসপত্ন কর্তৃত্ব বা প্রতিপত্তি—এ একটা আশ্চর্য সান্ত্বনা ও তৃপ্তির উৎস ছিল বিধবা রাধাবাঈয়ের। সেই প্রতিপত্তি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে—সেই মাতৃভক্ত ছেলের আর এখন নাগাল পান না রাধাবাঈ—এ অপমানের দাহ নিত্য দগ্ধ করে তাঁকে। ঐ গণিকা, ঐ রক্ষিতাটা ছেলের হৃদয়েশ্বরী শুধু নয়, তার প্রাসাদকর্ত্রী হয়ে বসেছে—এ কিছুতেই ভুলতে পারেন না তিনি। এর প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই তাঁর। ছেলে অসুস্থ—সেটা উদ্বেগের কারণ বটে, কিন্তু এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার মতো পর্যাপ্ত কিনা সন্দেহ। চিমনজীর মনে হয় পুত্রের কল্যাণের থেকে প্রতিশোধটাই বড় প্রশ্ন বালাজী বিশ্বনাথ রাও-এর মহিষী—চিমনজীর জননীর কাছে।

বিদ্বেষ যতই প্রবল হোক, ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুতরাং অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসহায় প্রতিকারহীন ক্ষোভের মধ্য দিয়ে এক-একটি রাত্রির সঙ্গে এক-একটি দিন গ্রথিত হয় শুধু। কিছুই করা যায় না, কিছুই করার উপায় থাকে না।

আপ্তাজীর সঙ্গেই পৌত্র বালাজীকেও চিঠি দিয়েছিলেন রাধাবাঈ। কিন্তু বালাজী সে সময় আসতে পারে নি। দীর্ঘকাল পরে ছত্রপতি শাহু তাঁর আলস্যের অপবাদ কাটাতে মাত্র কয়েক

মাস আগেই মিরাজে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, বালাজী তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। যুদ্ধ বিশেষ হয় নি, ছত্রপতির পৌঁছতেই যা দেরি—মিরাজ দখল হয়েছিল অল্প সময়ের মধ্যেই, ছত্রপতিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু একটা শহর কি দুর্গ দখল করলেই অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না—মিরাজে মারাঠা শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার দুরূহ কাজে শাহু যাদের রেখে এসেছিলেন, বালাজী তাদের অন্যতম। সেই কারণেই বালাজী আসতে পারে নি। কারণ এটা রাজ্য-চালনার একটা বড় রকম শিক্ষা। যার ওপর অচির ভবিষ্যতে যে-কোনদিন এই বিপুল রাজ্যখণ্ড শাসনের ভার এসে পড়তে পারে—তার পক্ষে এ শিক্ষা অত্যাবশ্যক। পিতামহীর জরুরী চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও বালাজী তাই মিরাজ ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে নি। প্রয়োজন ছাড়াও একটা কথা ছিল। ছত্রপতি তাকে অপত্যাধিক স্নেহ করেন—তিনি স্বয়ং যে কাজের ভার দিয়ে এসেছেন, সে কাজ অন্তত খানিকটা না গুছিয়ে আসা উচিত নয়।

সুতরাং খানিকটা কাজ মিটিয়ে বালাজীর ফিরতে ফিরতে প্রায় কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল। আন্তাজী আসার ঠিক দু মাস পরে এসে পৌঁছল সে। এই দুই মাস ধরে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে সহ্যশক্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন রাধাবাঈ ও কাশীবাঈ। সাধারণত রাধাবাঈয়ের চোখে জল পড়ে না—দুঃখে আগুনই জ্বলে তাতে—কিন্তু তিনিও দুঃসহ যন্ত্রণায় ভেতরে ভেতরে ভেঙে এসেছিলেন। পৌত্র এসে দাঁড়াতেই কথা বলার আগে কেঁদে ফেললেন তিনি। বালাজী চমকে চেয়ে দেখল কাশীবাঈয়ের চোখে তার বহু আগে থেকেই—সম্ভবত তার আসবার খবর পেয়েই—জলের ধারা নেমেছে। কাশীবাঈয়ের মুখের সেই চিরকালের শান্ত মহিমা কোথায় চলে গেছে, তাঁর দৃষ্টি করুণ, দাঁড়াবার ভঙ্গীটাও যৎপরোনাস্তি দীন।

একই সঙ্গে মা ও ঠাকুমার চোখে জল দেখে উনিশ বছরের

তরুণ রণনায়ক বালাজীর চোখে আগুন জ্বলল। তাঁদের এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশা—এই নীরব ভাষাহীন অনুনয় তাকে কঠিন ও কঠোর ক'রে তুলল। সে তার কাকাকে দুটি একটি মাত্র প্রশ্ন ক'রে বুঝে নিল অবস্থাটা। তারপর ঠাকুরমার দিকে চেয়ে বলল, 'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—আগামী কাল সূর্যাস্তের আগেই আমার পিতা মহান পেশোয়াকে শান্‌ওয়ার ওয়াড়া থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব—যেখানে হোক, যে-কোন উপায়ে হোক। কিন্তু তার পরের দায়িত্ব আপনাদের। এখানে যা করবার আপনারা করবেন, আমার ওপর নির্ভর করবেন না।'

'তা করব না, কিন্তু তুমি কি পারবে ভাই ?' সংশয়ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করেন রাধাবাঈ, 'পেশোয়া বাজীরাও শুধু শক্তিমান নন, বুদ্ধিমানও। আর—আর সেই স্ত্রীলোকটা—সেটা নিশ্চিত জাদু জানে। বড় ভয়ঙ্কর মেয়েছেলে সে। সাবধানে এগিও দাদু, আমি তোমাকে মিনতি করছি।'

বালাজী রাধাবাঈকে ও কাশীবাঈকে প্রণাম ক'রে বলল, 'আপনাদের আশীর্বাদ পেলে আমি স্বয়ং দেবেন্দ্রের দ্বারে গিয়েও হানা দিতে পারি। আর বাজীরাও যত শক্তিমান আর বুদ্ধিমানই হোন—তিনি আমারই পিতা। আমাতে কি আর তাঁর কোন গুণ অর্শায় নি ?'

'কিন্তু সেই—সেই মায়াবিনী স্ত্রীলোকটা ?' ভীত কণ্ঠে সংশয়ের সুর বেজে ওঠে আবারও।

বালাজী হাসে, সে 'যে-ই হোক, আমার পিতা তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন। সে মর্যাদা মিথ্যা হ'লেও আমার পিতার ধারণা তো মিথ্যা নয়। সেক্ষেত্রে সে আমার জননীতুল্যা। আমি তার পা ছাড়া মুখের দিকে চাইব—এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনি বৃথা ব্যস্ত হবেন না ঠাকুমা, তার চোখে চোখ না পড়লে জাদু বিস্তার করতে তো সে পারবে না।'

মস্তানী-মহলের দ্বারে পুত্র বালাজী।

বাজীরাও বহুক্ষণ যেন তাঁর কানকে বিশ্বাসই করতে পারলেন না। কিন্তু পর পর ছুজন দ্বারী এসে যখন সেই একই সংবাদ দিল তখন আর অবিশ্বাস করারও কোন কারণ রইল না। বীর বিজয়ী পুত্র তাঁর—মধ্যম পুত্র রাঘোবার মতো নীচ বা ধূর্ত নয়—সব দিক দিয়েই তাঁর উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র। বাজীরাও সমস্ত সতর্কতা ভুলে শশব্যস্তে মহলের দ্বার পর্যন্ত ছুটে এসে প্রণত পুত্রকে তুলে ধরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তার মধ্যেই বালাজী লক্ষ্য করল বাজীরাও-এর ভয়াবহ কৃশতা ও অস্বাভাবিক বিবর্ণতা। সে বুঝল তার মা আর ঠাকুরমার এতটা বিচলিত হওয়ার কারণ। সে আরও কঠিন, আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল।

বাজীরাও অত লক্ষ্য করেন নি। অত লক্ষ্য করার অবস্থা ছিল না তাঁর। গত ছুমাস তিনি আরামে ও আলস্যে ডুবে ছিলেন বটে কিন্তু সেটা তাঁর মত মানুষের পক্ষে শ্রেয় বা সুখকর নয়।

নিষ্ক্রিয়তার মাঝে ডুবে থাকা মানে তো জীবন্মৃত হয়ে থাকা, সমাধির মধ্যে ডুবে থাকা। বীরের পক্ষে, শাসকের পক্ষে, রাজনীতিকের পক্ষে নৈষ্কর্ম মানেই তো মৃত্যু। আজ অকস্মাৎ ছেলেকে দেখে তাই তাঁর এত আনন্দ। পুত্র তাঁর বিজয়ের বার্তা, যুদ্ধের বার্তা, রাজ্যের বার্তা বয়ে এনেছে, বাইরের বিপুল বিশ্বের হাওয়া এসে পৌঁছেছে তার সঙ্গে। যেখানে তাঁর পৌরুষ, তাঁর শক্তি, তাঁর সাম্রাজ্য-বিস্তারের স্বপ্ন-কল্পনা তার যথার্থ মূল্য পাবে, সেই জগতের আলো আর হাওয়া আর খবর নিয়ে এসেছে সে। সেইখানেই তো তাঁর যথার্থ স্থান, সেইখানেই তো তাঁর জীবন।

তিনি একবার ছেড়ে দিয়ে সস্নেহে যৌবন-সুগঠিত-দেহ তরুণ পুত্রের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ ক'রে আবারও বুকে চেপে ধরলেন তাকে। গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, 'এসো এসো, বাবা এসো। চল বসবে চল। তোমার মুখ থেকে সব খবর শুনব—'

বলতে বলতেই বুঝি মনে পড়ল কথাটা ; এ মহলে তাঁর ভাই, তাঁর পুত্ররা কেউ কখনও আসে নি, আত্মীয়দের কাছে এ মহল নরকের মতোই পরিত্যজ্য। তিনি একটু কুণ্ঠিত ভাবেই থেমে গেলেন যেন, কিন্তু সে মুহূর্তকালের জন্য। তারপরই স্থিরদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'এখানে, মানে ভেতরে আসতে কোন বাধা নেই তো তোমার ?'

'আমার পূজনীয় পিতৃদেব বা অপর কোন গুরুজন যেখানে যেতে বা থাকতে পারেন আমার সেখানে যাওয়ার কী আপত্তি থাকতে পারে ? আপনি যেখানে যেতে আদেশ করবেন সেখানেই যাব।'

'না না—আদেশের কথা নয় বালাজী, তুমি বড় হয়েছ, কে জানে তুদিন পরেই হয়ত এই সমস্ত রাজ্য, এই প্রাসাদ সব কিছুর ভারই তোমার হাতে এসে পড়বে। তোমাকে আদেশ ক'রে জোর ক'রে কোন কিছুই করাতে চাই না। আমাকে ভালবেসে আমার সঙ্গে আসতে চাও তো এসো।'

তিনি ভেতরে এসে একটি গদী-আঁটা বড় দিওয়ানে বসলেন, বালাজীও পিছনে পিছনে এসে তাঁর সামনের একটি চৌকিতে আসন নিল। বাজীরাও ছেলের আচরণে খুশী হলেন। সে খুশি চাপতেও চেষ্টা করলেন না, তাঁর সমস্ত মুখ সে আনন্দে উদ্ভাসিত, তুই চোখের দৃষ্টিতে সে আনন্দ ও খুশির ঝরনাধারা। তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে ছেলের তুই কাঁধে তুটি হাত রেখে বললেন, 'তারপর ? বলো কী খবর ?'

কাঠিন্যের সঙ্গে বিরূপতার সঙ্গে লড়াই করবে বলে যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে, সে হঠাৎ কোমলতা ও সহৃদয়তা দেখলে বিব্রত বোধ করে। বালাজীও সেই রকম একটু অসুবিধা বোধ করল। সোজাসুজি পেশোয়ার সেই স্নেহ-ঝরে-পড়া চোখের ওপর চোখ রাখতে পারল না, মাটির দিকে চেয়ে বলল, 'আপনার বোধ করি অবিলম্বে একবার পাটাসের ছাউনিতে যাওয়া দরকার।'

তখনও ঠিক বুঝতে পারেন নি পেশোয়া। পাটাসে তাঁর ব্যক্তিগত সৈন্যদের ছাউনি, তাঁর বাছাই করা পুরাতন বিশ্বস্ত সেনাদের বাসস্থান সেখানে। তিনি বিস্মিত, কিছুটা বা উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেন বলো তো? কী হয়েছে সেখানে?'

তেমনি ভাবে অন্যদিকে চেয়ে বলল বালাজী, 'তারা দীর্ঘকাল আপনাকে দেখে নি, তার উপর নানারকম জনশ্রুতি তাদের কানে আসছে—আপনার অসুস্থতার উদ্বেগজনক সত্য-মিথ্যা মেশানো নানা সংবাদ—তাতে তারা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।'

'ও, এই।' ছেলের দুই কাঁধ ছেড়ে দিয়ে পিছনের তাকিয়াটায় আধশোয়া ভাবে এলিয়ে পড়লেন বাজীরাও, 'তা সে তো তুমি গিয়েই তাদের অবস্থাটা বুঝিয়ে দিতে পারো যে, তাদের পেশোয়া এখনও মরে নি—বেঁচেই আছে।'

'না বাবা, তারা আপনাকেই দেখতে চায়।'

এইবার যেন কোথায় একটা খট্‌কা লাগল পেশোয়ার। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে—সে যে তাঁর চোখের দিকে চাইতে পারছে না, সেটা লক্ষ্য করলেন। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি সেখানে কোন বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান আশঙ্কা করছ?'

সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব এড়িয়ে গিয়ে বালাজী বলল, 'আমার জ্ঞান-বুদ্ধি- অভিজ্ঞতা অল্প, হয়তো যা বুঝেছি তা ভুল, তবু আমার অনুরোধ আপনি অবিলম্বে ওখানে একবার চলুন। তাছাড়া দীর্ঘদিনের অভ্যাস আপনার উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে দিনযাপন করা—প্রাসাদের এই সঙ্কীর্ণ দেওয়ালবন্ধ জীবনে আপনার লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হচ্ছে। আপনি এই ক'মাসেই বড় পাণ্ডুর হয়ে গেছেন পেশোয়া।'

পেশোয়া এই সমস্ত সময়টাই পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। তিনি এবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। গম্ভীর কণ্ঠে—

যে কণ্ঠস্বরে বড় বড় সেনাপতিরাও কেঁপে ওঠেন—ডাকলেন, 'বালাজী !'

'বলুন পিতাজী।'

'মুখ তোল, আমার মুখের দিকে চাও। উঁহু, সোজা আমার চোখের দিকে।'

অস্বুবিধা হয় ঠিকই, তবু বাজীরাও-এর চোখের ওপর চোখ রাখে বালাজী।

'মিথ্যা কথা, মিথ্যাচরণ এবং বিকৃত বা আচ্ছাদিত সত্যকে আমি ঘৃণা করি। পুরুষমাত্রেরই ঘৃণা করা উচিত। যে পুরুষ বলে পরিচয় দিতে চায়, তাকে সর্বদা নির্ভয়ে সত্য কথা বলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

বালাজী ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'কিন্তু রাজনীতিকদের জীবনেও কি তাই ? আপনি কি সব সময়ে সত্যাচরণ করেন পিতা ? আমাদের যিনি আদর্শ, সেই সুমহান নেতা ছত্রপতি শিবাজীও তো অত নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন বলে জানি না।'

এক মুহূর্ত থামতে হ'ল বৈকি বাজীরাওকে—উত্তর দেবার আগে। তারপর বললেন, 'রাজনীতিকদের জীবন আর ব্যক্তিগত জীবন এক নয়। রাজনীতিতে মিথ্যা বলতে হয়। তবু বাজীরাও যে তার রাজনীতিক জীবনেও খুব একটা মিথ্যাচরণ করেছে, এমন কথা বিশেষ কেউ বলতে পারবে না।'

'আমিও ঠিক মিথ্যাচরণ করতে চাই নি পিতাজী, অপ্রিয় সত্যকে একটা আবরণ দিতে চেয়েছিলাম মাত্র। হয়ত সেটা অন্যায় হয়েছে। এবার থেকে আর হবে না, আপনাকে কথা দিচ্ছি।'

'বেশ, তাহলে আমি সত্য উত্তরই চাইছি, তুমি কি আমাকে এখান থেকে অন্যত্র সরাতে চাইছ ?'

সূর্যরশ্মির মতো তীক্ষ্ণ চোখ বাজীরাও-এর—তেমনি অন্তর্ভেদী, তেমনি প্রজ্বলন্ত। প্রতিকৃতিতে এই দৃষ্টি দেখেই হিন্দুস্থানের বাদশা

মহম্মদ শা ভীত বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বালাজী রাও সেই দৃষ্টিতেই দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'রে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, পিতাজী।'

'তোমার স্পর্ধাও তো কম নয়!...না, এখনও দেখছি তুমি বালকই রয়ে গেছ। তুমি কি মনে করো, পেশোয়া বাজীরাও এক বালকের ইচ্ছায় চালিত হবে?'

'সাধারণ বালকের ইচ্ছায় না হ'তে পারেন—কিন্তু আমি আপনারই পুত্র।'

'এত কোমলতা এত বাৎসল্য আমার মধ্যে থাকলে আজ মারাঠা-শক্তিকে বিশ্বত্রাস ক'রে তুলতে পারতাম না।'

'আমিও আপনার সে কাঠিন্য হয়ত পেয়েছি পিতাজী—উত্তরাধিকার সূত্রে।'

উত্তেজিত ও বিস্মিত পেশোয়া এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সেই সঙ্গে বালাজীও। মুখোমুখি দাঁড়াল সে। দুজনের উচ্চতা একই রকম, দুই জোড়া চোখ সমান স্তরে স্থির হ'ল এসে।

'অর্থাৎ—? তুমি আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যাবে—এখান থেকে?'

'প্রয়োজন হয় তো কুণ্ঠিত হব না অন্তত।'

'সেটা কি খুব সহজ মনে করো? মনে রেখো, এখানকার দ্বারী, শাস্ত্রী, সৈনিকরা আজও আমারই বেতনভুক্, অনুগত।'

'সহজ কাজ সাধারণ লোকই করতে পারে—যা দুঃসাধ্য, যা অপরের কাছে অসাধ্য, তাই আমাদের জন্যে। এই শিক্ষাই তো চিরকাল পেয়েছি আপনার কাছে।'

'কিন্তু কেন, কিসের জন্যে তোমার এই দুর্বুদ্ধি, এই আত্মনাশা সঙ্কল্প?...তুমি পুরুষ, অন্তঃপুরিকাদের নির্বোধ ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়া তোমার শোভা পায় না।'

'আপনি যে অন্তঃপুরিকাদের কথা ইঙ্গিত করছেন পিতাজী; তাঁদের একজন আমার জননী আর একজন আপনার। সর্বদা

তাঁদের মান্য করতেই অভ্যস্ত আমরা। আর শোভনতার কথা বলছেন পিতাজী, আপনিও তো পুরুষ, দেশ-শাসক, রাজা—সামান্য একজন অন্তঃপুরিকার জন্য, স্ত্রীলোক শব্দ না-ই উচ্চারণ করলাম—অন্দর-মহলে বদ্ধ হয়ে থাকা কি আপনারই শোভা পায়?'

'বাঃ, বেশ চমৎকার শিক্ষা তোমার। এত সহবৎ শিখেছ, গুরুজনদের মান্য করতে শিখেছ—শুধু পিতাও যে তোমার গুরুজন সেটা কেউ শেখায় নি তোমাকে? যে পিতার জননী বলে পিতামহী তোমার কাছে এত মাননীয়া সে পিতাকে অনায়াসে বিচার করার অধিকার তোমার আছে—এমন ধারণা তোমার কী ক'রে হ'ল! এ ধৃষ্টতা-প্রকাশের অধিকারই বা কে দিল তোমাকে?'

'আপনাকে বিচার করতে চাই নি পেশোয়া, শুধু আপনার যুক্তি দিয়েই আপনার যুক্তিকে খণ্ডন করতে চেয়েছিলাম।'

'বেশ করেছ, তোমার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয়ে আমি তুষ্ট হয়েছি—এখন বিশ্রাম করো গে।'

পেশোয়া পিছন ফিরে যেন এ প্রসঙ্গের এইখানেই ইতি টানতে চেষ্টা করেন।

'আমি একেবারে আপনাকে নিয়ে যাব বলে এসেছি।'

'তার মানে!' যেন ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জন ক'রে উঠলেন পেশোয়া বাজীরাও, 'প্রশ্রয় ও ক্ষমারও একটা সীমা আছে, তুমি সমস্ত সীমা লঙ্ঘন ক'রে যাচ্ছ।'

'আমি মা ও ঠাকুমার কাছে প্রতিশ্রুত। সুতরাং নিরুপায়।'

'প্রতিশ্রুতি দেবার আগে নিজের শক্তি যাচাই করতে হয়। বিচার-বিবেচনা শৌর্যেরই অংশ, প্রধান অংশ বলা যায়।'

'কিন্তু হাতের পাশা আর মুখের কথা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, তাও তো জানেন।'

'বেশ, তাহলে সে মুখের কথা রাখার জন্যে যা করা প্রয়োজন করো। আমি তোমার ইচ্ছায় চালিত হবো—এ ভুল ধারণা ত্যাগ

করো। আমাকে বলপূর্বক নিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস যদি থাকে, চেষ্টা ক'রে দেখতে পারো।'

'আপনি অনুমতি দিচ্ছেন ?'

বিদ্যুৎগতিতে পাশের দেওয়াল থেকে একখানা তরবারি টেনে নেন বাজীরাও, এত দ্রুত যে বালাজী রাও বুঝতেই পারে না ঘটনাটা কখন ঘটল। মনে হ'ল সত্যিই বুঝি কোন জাদুতে তরবারি হাতে এসে গেল ওঁর।···কুসংস্কার এমনিই জিনিস যে, ডাইনী কুহকিনী অপবাদটা মিথ্যা জেনেও তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

'নিজের আত্মজনকে বন্দী করা কি বধ করার জন্য কোন বেতন-ভুক্ ভৃত্যকে ডাকব না—একটুকু সম্মান মাত্র তোমাকে দেখাতে পারি। তার বেশী কোন প্রশ্রয় কি দুর্বলতা আশা ক'রো না আমার কাছে।'

'এটুকুও আশা করি নি পিতাজী, কোন আশা নিয়েই আসি নি। শুধু যা কর্তব্য বলে মনে করেছি তাই পালন করতে এসেছি। তাতে যদি মৃত্যু ঘটে তো দুঃখিত হবো না—সেটুকু শিক্ষা আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে বসে পেয়েছি। আর আপনার মতো বীরের হাতে মৃত্যু—এর চেয়ে শ্লাঘণীয় সমাপ্তি সৈনিকের জীবনে আর কী ঘটতে পারে ? আপনি স্বচ্ছন্দে ঐ তরবারি আমার বুকে বসিয়ে দিন, বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না। এ সমস্যার আর কোন সমাধানও বুঝি নেই।'

তরুণের মন মহত্ত্বের নেশায় মেতে উঠেছে—বালাজী সত্য সত্যই বুক পেতে দাঁড়াল পেশোয়ার সামনে। তাতেই হয়ত উদ্যত তরবারি নামাতে হ'ত তাঁকে—কিন্তু তার আগেই আর এক অঘটন ঘটল। যাকে নিয়ে পেশোয়ার জীবনে বার বার অঘটন ঘটেছে—এবারেও ঘটাল সে-ই। কখন মস্তানী এসে নীরবে ঘরে ঢুকেছে তা এঁরা কেউই টের পান নি, একেবারে চমকে উঠলেন দুজনেই, যখন সুনিপুণ ক্ষিপ্র হস্তে মস্তানী এসে পেশোয়ার বদ্ধ মুষ্টি খুলে তরবারিটি সরিয়ে নিল।

'ছিঃ পেশোয়া, ছিঃ। আপনিও কি ছেলেমানুষ হলেন!'

'কিন্তু তুমি ওর প্রতিজ্ঞাটার কথা' শোন নি মস্তি, ও আমাকে এখান থেকে জোর ক'রে সরিয়ে নেবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে।'

'জোরই বা করতে হবে কেন পেশোয়া, আপনার বীর বিজয়ী পুত্রের সম্মান রক্ষা করা তো আপনারই কর্তব্য। শুনেছি, পুত্র আর শিষ্যের কাছে হার মানাই অধিক গৌরবের।'

'কিন্তু আমার এখান থেকে সরে যাওয়ার অর্থ জানো?'

'জানি মালিক। সেই সঙ্গে এও জানি যে আমাকে আপনার কাছ থেকে বেশী দিন দূরে সরিয়ে রাখবে এমন মানুষ এখনও জন্মায় নি।'

'তুমি অহঙ্কারে বিভ্রান্ত হয়েছ মস্তিবাঈ।'

'অহঙ্কার ঠিকই—কিন্তু সে নিজের নয় প্রভু। আমার যদি কোন কৃতিত্ব, অহঙ্কার করার মতো কিছু যোগ্যতা থাকে তো সে আপনারই দান। কিন্তু আমি মিথ্যা অহঙ্কার করছি না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বালাজী রাও-এর সঙ্গে চলে যান পেশোয়া। আপনিও শান্তি লাভ করুন, এঁরাও শান্ত হোন।'

'আর তুমি? তোমার কি হবে ভেবে দেখেছ?'

'দেখেছি বৈকি প্রভু! আমার যা সত্যকার অনিষ্ট তা কেউ করতে পারবে না কোন দিন, আপনার শ্রীচরণ থেকে বেশীদিন দূরে সরিয়েও রাখতে পারবে না। ইহকালে পরকালে যুগে যুগান্তরে আমি আপনার দাসী। এঁরা যাই করুন—আমি অচিরকাল মধ্যে আপনার সঙ্গে মিলিত হবো—কথা দিচ্ছি। আপনি তো জানেন আপনার মস্তি আপনার কাছে কখনও মিছে কথা বলে না।'

তারপর সেই আশ্চর্য সুন্দরী নারী তার আশ্চর্য সুন্দর চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বালাজী রাও-এর দিকে। অকুণ্ঠিত শান্তস্বরে বলল, 'পুত্র, তোমাকে আমি পুত্র সম্বোধন করছি বলে বিরক্ত হয়ো না—লোকে যা-ই বলুক তোমার পিতাজী—মহান পেশোয়াকে ধর্মত আমার স্বামী বলেই জানি, সেদিক দিয়ে আমিও

তোমার একজন মা। আর তা না হ'লেও, তুমি হিন্দু, ব্রাহ্মণ—স্ত্রী বাদে জগতের সমস্ত নারীই তো তোমাদের মাতৃস্থানীয়া, সুতরাং পুত্র সম্বোধনে আশা করি কোন দোষ হয় নি। পুত্র, তুমি প্রস্তুত হও, মহান পেশোয়া আর চারদণ্ডের মধ্যেই পাটাসের দিকে রওনা হবেন।'···

কুহকিনী, ডাকিনী, জাদুকরী। তাতে সন্দেহ নেই একটুও। বালাজীর কপালে অজস্র ঘাম দেখা দিল। এ কী সাংঘাতিক মোহ! সে-ও যে মুগ্ধই হয়ে পড়ছে একটু একটু ক'রে তাতে তো সন্দেহ নেই। তার সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও যে তার শ্রদ্ধা কেড়ে নিচ্ছে এ মায়াবিনী, একে মাতৃ-সম্বোধন করতে, কৃতজ্ঞতা জানাতে আকুলিবিকুলি ক'রে উঠছে তার মন। এ তার কী হল!

এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম নিজের কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিল তরুণ সেনানায়কের মনে। সে ভুলই ক'রে বসল না তো শেষ পর্যন্ত?

॥ ১১ ॥

আক্রমণটা অবিলম্বেই আশা করেছিল মস্তানী, বাজীরাও পিছন ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু কে জানে কেন, সে রাত্রে কেউই তার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাল না। হয়ত পেশোয়া শহরের বাইরে বহুদূর চলে না যাওয়া পর্যন্ত ভরসা পাচ্ছিল না কেউ মস্তানী-মহলে হানা দিতে। সংশয় তো একটা ছিলই সকলের মনে—পারবেন কি পেশোয়া সত্যিসত্যিই তাঁর প্রিয়তমাকে ছেড়ে দূরে যেতে? এই স্ত্রীলোকটি যে নেশার মতো পেয়ে বসেছে তাঁকে, তাঁর সমস্ত অস্তিত্বে জড়িয়ে গেছে সে কথাটা এ রাজ্যের বোধ করি সাধারণ নগণ্য কোন নাগরিকেরও জানতে বাকী নেই। আর সেই সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড উম্মার কথাও জানে সকলে। যদি সত্যিই তিনি ফিরে

আসেন এবং এসে তাঁর মস্তিবাঈকে না দেখতে পান তাহলে হয়ত স্বর্গ মর্ত্য রসাতল একাকার করবেন একেবারে। যারা এ কাজের জন্য দায়ী তাদের কারও নিস্তার থাকবে না, পনেরো-বিশ জনের প্রাণ নেওয়াও আশ্চর্য নয়। কোথাও লুকিয়ে রাখলে হয়ত গোটা প্রাসাদটাই ভেঙে ফেলার আদেশ দেবেন তাকে খুঁজে বার করতে।

সুতরাং সে রাত্রিটা ধৈর্য ধরেই অপেক্ষা করতে হল রাধাবাঈকে। তাঁর সাহস ও ইচ্ছার কোন অভাব নেই, কিন্তু যাদের সাহায্য নিতে হবে তাঁকে—তাদের আছে। ধড়ের ওপরে কাঁচা মাথাটার মায়া আছে তাদের। অতএব অধীর ও প্রায়-অন্তহীন প্রতীক্ষা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

কিন্তু মস্তানীর যেন কোন উদ্বেগই ছিল না। তার প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। যথাসময়ে স্নান করেছে, প্রসাধন করেছে পরিপাটি ক'রে—তারপর আহার শেষ ক'রে শুতেও গেছে স্বাভাবিক নিয়মে। শুধু যাওয়ার আগে নিজের বিশ্বস্ত দাসী মরিয়মকে বলে গেছে মহলের দ্বারে বসে পাহারা দিতে, ওদিক থেকে আক্রমণের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত পেলেই যেন তাকে জাগিয়ে দেয়।

অবশ্য জাগিয়ে দিতে হয় নি। প্রত্যুষেই উঠেছে সে। ছেলে সামসের বাহাদুর এখানে নেই, থাকলে অসুবিধা হ'ত, অল্পবয়সী ছেলে সে, মাথাগরম তার, নিশ্চয়ই মাকে রক্ষা করতে গিয়ে বিপদ টেনে আনত। ভালই হয়েছে সে পাটাসের ছাউনীতে আছে। মস্তানী নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান-প্রসাধন সেরে প্রস্তুত হয়ে বসল।

ওঁরা এলেনও সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই।

যথেষ্ট লোক-লস্কর নিয়েই এলেন। চিমনজী আপ্পা তাদের অধিনায়ক। আর—কখনও যা হয় না, তাদের সঙ্গে এলেন স্বয়ং রাধাবাঈ, এ পরিবারের সর্বজনশ্রদ্ধেয়া মাতুশ্রী। সাধারণ সৈনিক বা রক্ষীদের সঙ্গে পদব্রজে আসবেন পেশোয়া বিশ্বনাথ রাওয়ের

সহধর্মিনী, এ লোকে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারে না। অথচ আজ তাই ঘটল।

মস্তানী-মহলের ফটক সুন্দর কিন্তু ভঙ্গুর নয়। উড়িষ্যা থেকে কারিগর আনিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন বাজীরাও। মজবুত আবলুস কাঠের পাল্লা, ইস্পাতের গুল্ বসানো। সহজে ভাঙা যাবে না জেনেই রাধাবাঈ বড় কাঠের গুঁড়ি আর বলিষ্ঠ কুস্তিগীর কয়েকজনকে সঙ্গে এনেছিলেন। ভেঙে ঢুকতে হবে—এইটেই মনে ছিল তাঁর। কিন্তু সামনে এসে দেখলেন মহলের সে ফটক খোলা, শুধু তাই নয়—তাদের যে শিকার, সেই কুহকিনী মেয়েছেলেটা সামনেই দাঁড়িয়ে। সহাস্য মুখে যেন ওঁদের অভ্যর্থনার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে সে।

'বন্দী করো, বন্দী করো এখনই ঐ কসবীটাকে।'

সমস্ত সম্ভ্রমবোধ এবং নিজের পদ-মর্যাদা ভুলে চেঁচিয়ে উঠলেন রাধাবাঈ।

কিন্তু রাধাবাঈ গুরুজন হ'তে পারেন, তাঁর চেয়েও গুরুতর জন আছেন; পেশোয়া বাজীরাও তাদের মালিক আর সে মালিকের মালিক এই স্ত্রীলোকটি বা রাধাবাঈয়ের ভাষায় কসবীটি। স্পষ্ট আদেশ সত্ত্বেও তাই তারা একটু ইতস্ততই করতে লাগল।

এইবার এগিয়ে এলেন চিমনজী; অভ্যাসমতো মাথাটা ঈষৎ অভিবাদনের ভঙ্গীতে নত হচ্ছিল, হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে সামলে নিলেন নিজেকে। মাথা উঁচু ক'রেই মস্তানীর মুখের পাশ দিয়ে পিছনের একটা আসবাবে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে বললেন, 'আমরা আপনাকে বন্দী করতে এসেছি মস্তানী বিবি।'

অনুত্তেজিত এবং বেশ প্রফুল্লকণ্ঠেই উত্তর এল, 'কী অপরাধে জানতে পারি কি?'

'আপনি আমাদের মহান পেশোয়ার শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই ক্ষতির কারণ হচ্ছেন—এই অপরাধে।'

'কিন্তু সেটা বিচার করল কে ? কোনও ন্যায়াধীশের বিচারালয়ে তো কৈ আমার ডাক পড়ে নি।'

'এ পারিবারিক ব্যাপার। পেশোয়ার ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রশ্ন। এর সঙ্গে সরকারী বিচারশালার কোন সম্পর্ক নেই। আমরা—তাঁর ভাই, মা, স্ত্রী ও পুত্র—এই ক'জনই এ বিচার করার পক্ষে যথেষ্ট ; আর তা-ই করেছি আমরা।'

'কিন্তু আপনারা যে মহান পেশোয়ার দোহাই দিয়ে একটি অসহায়া রমণীর ওপর দলবদ্ধ হয়ে হামলা করতে এসেছেন—সে পেশোয়া আজও জীবিত। এ প্রাসাদের তিনিই মালিক, উত্তরাধিকারসূত্রে নয়—এ প্রাসাদ তাঁর স্বীয় উপার্জনে ও কৃতিত্বে প্রস্তুত। এখানে তাঁর জীবদ্দশায় হুকুম চালাবার আপনারা কে—এবং তাঁর আশ্রিতাকে বন্দী করারই বা কি অধিকার আপনাদের ? কৈ, পেশোয়ার হুকুম-নামা কৈ ? পেশোয়ার প্রাসাদে তিনি ছাড়াও অবশ্য আর একজন হুকুম দিতে পারেন তিনি রাজাধিরাজ ছত্রপতি, তাঁর কোন আদেশনামা এনেছেন কি ?'

'আস্তাজী', ওদিক থেকে কর্কশ কঠিন কণ্ঠ বেজে উঠল রাধাবাঈ-এর, 'তুমি বৃথা ঐ গণিকাটার সঙ্গে তকরার করছ কেন ? উত্তর-প্রত্যুত্তর হয় সমানে সমানে—ও কি তোমার সমান ? ওর সঙ্গে কথা কইতে ঘৃণাবোধ হওয়া উচিত। ··মহাদেও, সখারাম—তোমরা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কী জন্যে, বন্দী করো ঐ স্ত্রীলোকটাকে।'

তবু হয়তো ইতস্ততঃ করত ওরা, কিন্তু আস্তাজীও সেই রকমই ইঙ্গিত করলেন। তখন ভরসা পেয়ে দুজন সৈনিক এগিয়ে গেল মস্তানীর দিকে।

'খবরদার !' এইবার সিংহী যেন তার প্রকৃত স্বরূপে গর্জন ক'রে উঠল। গ্রীবা হেলিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, 'খবরদার ! মনে রেখো পেশোয়া বাজীরাও আজও মারা যান নি। এ মহালে তিনিই আমাকে বসিয়ে গেছেন—তাও তোমরা জানো। আমাকে

এখান থেকে যারা জোর ক'রে নিয়ে যাবে তাদের পরিণাম কী হবে তা ভেবে এ কাজে এগিও। শিগগিরই হয়তো তিনি ফিরে আসবেন, এ সংবাদ পেলে তো আসবেনই—তারপর তোমাদের কে রক্ষা করবে? ঐ চিমনজী? না কি তোমরা মহিষী কাশীবাঈয়ের আঁচলের তলায় লুকিয়ে বাঁচবে ভেবেছ?'

তারপর পিছন দিকে কী একটা ইঙ্গিত করল মস্তানী, বোধহয় পূর্বেই বলা ছিল, মরিয়ম এসে একটা তলোয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল। সেই খোলা তলোয়ার নিয়ে এবার মস্তানীই এগিয়ে এল দু'পা। বলল, 'পেশোয়া বিদেশে কিন্তু তাঁর শক্তি ও দৃষ্টি সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত। 'এ তরবারি তোমরা চেনো—এও পেশোয়ার। যদি স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতে তোমাদের লজ্জা না থাকে, আশা করি তার সঙ্গে লড়াই করতেও লজ্জা পাবে না। এসো, দেখি কার কতদূর সাধ্য জোর ক'রে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যায়।'

এর পরও এগিয়ে আসবে এমন সাহস উপস্থিত সেই রক্ষী-দলের মধ্যে একজনেরও ছিল না। চিমনজীরও না। সেটা রাধাবাঈয়েরও বুঝতে এতটুকু বিলম্ব হ'ল না। একবার মাত্র উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চেয়েই, আবারও নিজের পরাজয়ের সংবাদটা যেন পড়তে পারলেন তাদের মুখে-চোখে। এই-ই শেষ। এবার হার-মানার অর্থ চিরকালের মতো হার মানা। আর কখনও তিনি একে দমন করার চেষ্টা করতে পারবেন না, আর কখনও তিনি এ প্রাসাদের কারও মুখের দিকে মাথা উঁচু ক'রে চাইতে পারবেন না। কোন পরিজন বা কর্মচারী আর কোনদিন মানবে না তাঁকে। এই গণিকাটাই এখানকার মালেকা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

কথাগুলো মাথায় খেলে যেতে এক লহমার বেশী বিলম্ব হ'ল না। দীর্ঘদিন নিজের সংসারে—এতবড় সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদে কর্তৃত্ব করেছেন তিনি। কর্তৃত্ব হারানোর প্রশ্ন তাঁর কাছে জীবন-মরণের প্রশ্নেরও অধিক। আর সে কর্তৃত্ব রক্ষা করার রীতি-পদ্ধতি

কলাকৌশলও তিনি অবগত আছেন। চোখের পলকও বোধকরি ভাল ক'রে পড়ার আগে—সখারাম নামে তরুণ রক্ষীটির হাত থেকে তলোয়ারখানা প্রায় ছিনিয়ে কেড়ে নিলেন রাধাবাঈ, তারপর এগিয়ে গেলেন মস্তানীর দিকে, 'এসো, এদের মধ্যে যদি একজনও মায়ের দুধ না খেয়ে থাকে, একজনও যদি পুরুষবাচ্ছা না থাকে—আমার সম্মান আমিই রক্ষা করব। আমিই তোমাকে বন্দী করব।···অশুচি দেহ স্পর্শ করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—সেইটেই এড়াতে চাইছিলুম—কিন্তু উপায় কি? কতকগুলো ক্লীবের মধ্যে বাস করলে এ অপমান সইতেই হবে।'

যতটুকু সময় লেগেছিল রাধাবাঈয়ের তরবারিখানা টেনে নিতে সখারামের কাছ থেকে—ঠিক ততটুকুই সময় লাগল মস্তানীর অবস্থাটা বুঝতে। আরও অল্প কয়েক মুহূর্ত সে এক রকমের কৌতুক-অনুকম্পা-উপেক্ষা মিশ্রিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রাধাবাঈয়ের দিকে, তারপর সেই পরিপূর্ণ রক্তিম ওষ্ঠাধরের দুর্জ্ঞেয় একটা ভঙ্গী ক'রে—নিজের তরবারি খানা তুলে একবার নিজের মাথায় ঠেকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমার হাতে তরবারি থাকতে আমাকে বন্দী করার ক্ষমতা এক পেশোয়া বা ছত্রপতি ছাড়া এ রাজ্য আর কারও নেই, একজন দৈহিক শক্তিতে আর একজন মাত্র পদমর্যাদায় আমাকে পরাজিত করতে পারেন। সুতরাং ভয়ে নয়—স্বেচ্ছাতেই আমি অস্ত্র ত্যাগ করলুম। আপনি আমাকে যা-ই ভাবুন আমি জানি আমি পেশোয়ার স্ত্রী, আপনার পুত্রবধূ। আপনি মা—মার দেহে এমন কি মার দিকেও অস্ত্র তোলা সম্ভব নয়। আমি পরাজয় স্বীকার করলুম, আপনি বন্দী করুন। তবে আমার গায়ে যেন কেউ হাত না দেয়, তার কোন দরকারও নেই—কোথায় যেতে হবে বলুন, আমি নিজেই যাচ্ছি। কোন বাধা দেব না কি পথ থেকে পালাবার চেষ্টা করব না—স্বয়ং পেশোয়ার নামে আমি কথা দিচ্ছি।'

অনিচ্ছাতেও কি আস্তাজীর চোখে মুগ্ধ বিস্ময়ের দৃষ্টি ফুটে ওঠে? কে জানে!

সেদিকে তখন আর তাকাবার সময় ছিল না রাধাবাঈয়ের, তিনি ইঙ্গিতে প্রহরীদের পিছন দিক রক্ষা করতে বলে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন এই স্বেচ্ছাবন্দিনাকে।

॥ ১২ ॥

এক এক সময়, যখন যুদ্ধ-জয়ের পর বিজয়ী মারাঠাবাহিনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, তখন লুঠের মাল বা টাকা রাখার জন্য, তোশাখানা ছাড়াও বাড়তি ঘর দরকার হয়ে পড়ে। প্রতি দুর্গেই এ রকম ঘর আছে। পেশোয়া বাজীরাও তাঁর এই নবনির্মিত শান্‌ওয়ার ওয়াড়া প্রাসাদেও সে রকম ঘর দু-একটি করিয়ে রেখেছেন—যদিও তাঁর বিপুল ব্যয় চিরকাল ঋণের অঙ্কই বাড়িয়ে গেছে এ-যাবৎ, তোশাখানাতে রাখার মত বিত্তও জমতে পারে নি কখনও। এই সব অতিরিক্ত ভাণ্ডার প্রয়োজনে লাগার তো কথাই ওঠে না।

তবু এ-রকম ঘর ছিল। বিশেষ ভাবে তৈরি এগুলো। সাধারণত দায়িত্ব-সম্পন্ন দুই প্রধান ব্যক্তির বাসগৃহের মধ্যে মধ্যে এই ঘরগুলো তৈরি হয়। এর তিন দিকে থাকে নিরেট নিরন্ধ্র পাথরের দেওয়াল, একদিকে লোহার পাতমোড়া গুলবসানো ভারী মহাশালের কপাট-ওয়ালা দরজা ও অতি ক্ষুদ্র গো-অক্ষির মতোই ছোট একটি গবাক্ষ। তাতেও ঘন ঘন লোহার গরাদে দেওয়া।

এমনিই একটি ঘরে নিয়ে আসা হ'ল মস্তানীকে। এ ধরনের ঘরের মধ্যেও এটি আবার একটু বেশী সুরক্ষিত। তিন-কামরা-যুক্ত চিমনজী আপ্পার বাসগৃহ—তার একদিকে একটি ছোট মন্দির এবং তাঁর দপ্তরখানার একটি নিরিবিলি ঘর। তার মধ্যে—তেকোণা কঁচ জমিটিকে এই ঘরের কাজে লাগানো হয়েছে। বালাজী রাও আর

চিমনজীর মহলের মধ্যের এই সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-পথটিও এখানেই শেষ হয়েছে। দুই মহলের মুখেই সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা আছে, কোন সময়ে প্রহরী না থাকলেও সদাসর্বদা হুকুম তামিল করার জন্য দ্বারী একজন থাকেই। এখান থেকে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বার হবার কোন পথ নেই, একজনের মহল থেকে আর একজনের মহলে যাবারও না।

অনেক ভেবে-চিন্তে এই ঘরটিই বন্দিনীর জন্য বেছে নিয়েছিলেন রাধাবাঈ। পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলেন। প্রাসাদের একটি সাধারণ বন্দীশালা আছে; কিন্তু সেখানে এ ধরনের স্ত্রীলোক রাখা আদৌ নিরাপদ নয়। সে একেবারে হাট, সবই সাধারণ ব্যবস্থা সেখানে। এঁদের আয়ত্তের বাইরেও বটে কতকটা। তাই নিজে তদারক ক'রে ঘরটিকে বসবাসযোগ্য করিয়ে নিয়েছিলেন পেশোয়া-জননী। এই তেকোণা ঘরটির সর্বশেষ প্রান্ত ঘিরে দিয়েছিলেন শৌচাদির জন্য। একটি শয্যাহীন চারপাইয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল—বন্দিনীর শয়নের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট, অপরাধিনীর জন্য আবার শয্যা কি? আর রাখা ছিল একপ্রস্থ মাত্র পোশাক, একটি জলের সুরাই ও একটি লোটা। এই পর্যন্তই, আসবাব বা আবশ্যকীয় জিনিস বলতে।

এর মধ্যেই এনে রাখা হ'ল মস্তানীকে। ঘরে প্রবেশ করা মাত্র ভারী কপাটটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল তার মুখের ওপর—তিনটি ভারী ভারী তালা পড়ল তাতে। সে চাবির গোছাও নিজের হাতে নিলেন রাধাবাঈ। বেশ স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিলেন, দিনে রাতে একবার মাত্র খোলা হবে এ ঘর, সকালে যখন মেথর আসবে ঘর সাফ করতে, সেই সময়ই দুবেলার আহার্য এবং সারাদিনের মতো জল দেওয়া হবে ঘরে। অন্তত চারজন সশস্ত্র প্রহরী উপস্থিত থাকবে সে সময়, রাধাবাঈ স্বয়ং থাকবেন তাদের সঙ্গে। কাজ শেষ হলে আবার চাবি ফিরে যাবে তাঁর সঙ্গে। প্রহরী যারা থাকবে, তারা যে-

কোন ঘটনার জন্যই প্রস্তুত থাকবে, প্রয়োজন হয় তো বন্দিনীর প্রাণ-বধের জন্যও। এতে কোন গাফিলি হ'লে সেই অপরাধীকে বা অপরাধীদের নিজে হাতে কেটে ফেলবেন, রাধাবাঈ, অন্য কোন বিচার-ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করবেন না। ঘরে কোন আলোও থাকবে না, জানলার বাইরেই একটি ঝোলানো আলো আছে—তা-ই যথেষ্ট।

তিনটে তালা লাগিয়েও নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না রাধাবাঈ। দিনরাত পাহারা দেওয়াবারও ব্যবস্থা করলেন। সে প্রহরীও নির্বাচন করলেন নিজে। তাঁর স্বামীর আমলের দেহরক্ষী সখারাম আপ্তে আর তার ভাই-পো রঘুজী—এই তুজনকেই মাত্র তাঁর বিশ্বাস। এই তুজনের ওপরই ভার দিলেন পাহারার। স্থির হ'ল তুজনের মধ্যে পালা ক'রে পাহারার ব্যবস্থা ক'রে নেবে ওরা—নিজেদের সুবিধামতো। দিনের বেশির ভাগ থাকবে সখারাম, রাতে রঘুজী; কারণ সখারাম বুড়ো মানুষ, সারারাত জাগার কষ্ট তার সইবে না। তবে উভয়েরই প্রাতঃকৃত্য বা স্নানাহারের সময়—একে অপরকে অবসর দেবে।

সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ ক'রে নির্বাক চিমনজীকে নীরব ধিক্কার দিয়ে নিজের মহলে চলে গেলেন রাধাবাঈ। সকাল থেকে স্নান-পূজা কিছুই হয় নি তাঁর—এখন গিয়ে সেটা সারতে হয়ত সন্ধ্যাই হয়ে যাবে। বাড়তি লক্ষ নামজপ মানসিক আছে, তাতে আরও খানিকটা সময় লাগরে তাঁর—এ বেলা হয়ত খাওয়াই হবে না কিছু। তা না হোক, তাঁর উদ্দেশ্য—উদ্দেশ্য কেন, তাঁর ব্রত সফল হয়েছে এইতেই তিনি তৃপ্ত। আজকের এ প্রভাত তাঁর অবশিষ্ট জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে—একটা রাজ্য-জয়েরও বেশী গৌরব ও সার্থকতা অনুভব করছেন তিনি।

রাধাবাঈয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলেই চলে গেল একে একে।

শুধু বন্দুক হাতে গম্ভীর ও বিদ্বিষ্ট মুখে বসে রইল সখারাম—একটা কাঠের ছোট্ট চৌকিতে। খুব সম্ভব জননী রাধাবাঈ তাকে বন্দিনী মায়াবিনীর কুহক-বিস্তার শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্ক ক'রে দিয়েছেন—একবারও তাই সে জানলাটার দিকে মুখ তুলে চাইল না, স্থিরদৃষ্টি রুদ্ধ কপাটটায় নিবদ্ধ ক'রে বসে রইল—কাঠের মতো কঠিন হয়ে।

মস্তানী এ-সব কিছু লক্ষ্য করে নি অবশ্য। অন্তত তার ব্যবহার বা মুখ দেখে বোঝা যায় নি যে সে রাধাবাঈয়ের নির্দেশ কিছু শুনেছে বা কারুর দিকে চেয়ে দেখেছে। সোজা সামনের দিকে চেয়ে ধীর শান্তপদে ঘরে ঢুকেছিল—কোন দিকে না তাকিয়ে—কপাটটা বন্ধ হ'তে খুব সহজ ভাবেই সেই চারপাইটাতে বসে পড়েছিল।

ঘরে দ্বিতীয় কোন আসন নেই, আসবাব বলতেও একটি ছোট জলচৌকি। সেটিতে ইতিমধ্যেই একটা থালায় তার খাবার রেখে গেছে পাচক। খানিকটা ডেলা-পাকানো ভাত, একটা কি ব্যঞ্জন, একটা মাটির পাত্রে দই, আর কয়েকখানা রুটি। এ-ই তার দু-বেলার খাদ্য। কোন রকম ঢাকা দেবার ব্যবস্থা নেই, খোলাই পড়ে আছে, আর ঐ অবস্থাতেই পড়ে থাকবে সারাদিন। শুকিয়ে অখাদ্য হয়ে উঠবে একটু পরেই, রাত্রের খাওয়া তো পরের কথা, দিনেই খেতে পারবে না তা মস্তানী। রাজার মেয়ে সে—রাজার চেয়ে শক্তিশালী ও সম্পদশালী ব্যক্তির ঘরণী। তার জন্য এ খাদ্য বরাদ্দ করতে বোধ করি সাধারণ কারারক্ষকেরও লজ্জা হ'ত, কিন্তু এখানে সে বিবেচনা আশা করা মূর্খতা।

মস্তানী তা করেও নি অবশ্য। এটুকুও ক'রে নি। এই চারপাইটাও আশা ক'রে নি সে। কঠিন ভূমি-শয্যার ব্যবস্থা হ'লেও সে বিস্মিত হ'ত না। কোন রকম খাদ্য দেখতে না পেলেও না। এঁদের বিদ্বেষের পরিমাণ সে জানে। একান্ত মনে তার মৃত্যু-কামনাই করছেন এঁরা। সেখানে শোভন ভদ্র-ব্যবহার বা মানসিক বিবেচনা আশাই বা করবে কেন?…

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল মস্তানী। একবার মাত্র উঠে জানলা দিয়ে সখারামকে দেখে নিয়েছিল। আর ওঠে নি। সখারামকে দেখে ভারী হাসি পেয়েছিল তার। মুখে ওড়না গুঁজে সে হাসি সামলে ছিল সে। পেঁচার মতো গম্ভীর হয়ে ভ্রূকুটি ক'রে বসে আছে সখারাম, প্রাণপণে জানলাটাকে বাঁচিয়ে। কিছুতে না এদিকে চোখ পড়ে এই যেন তার সাধনা। তার দিকে চাইলে হাসি সামলানো কঠিন বৈকি।

মস্তানী কিছুই খেল না সারাদিন। জলও না। উপবাস করা তার অভ্যাস আছে। হিন্দুর পূজা-পার্বণেও যেমন উপবাস করে তেমনি মুসলমান পর্বেও। ঈশ্বরদত্ত স্বাস্থ্যও তার এমন যে দু'তিন দিন উপবাসেও কিছুমাত্র ক্লান্তি আসে না হাত-পায়ে।

চুপ ক'রে বসেই রইল। ঘুমোবার কি শোবার চেষ্টা করল না। বরং সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ ও সতর্ক ক'রে কান পেতে রইল বাইরের দিকে। তার আক্রমণের পদ্ধতি সে ইতিমধ্যেই ভেবে ঠিক ক'রে নিয়েছে, এখন শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা। এ বৃদ্ধকে সে কাবু করতে পারে সহজেই, যে যত সতর্ক তাকে তত সহজে আয়ত্ত করা যায়—কিন্তু শুধু নিজের স্বার্থটা দেখে একটা নিরপরাধ লোককে বিপদে ফেলতে চায় না সে। এ লোক রাধাবাঈয়ের রোষাগ্নি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না, এতদিনের বিশ্বস্ততার কথা স্মরণ ক'রে ক্ষমা করবেন—পেশোয়া-জননীর ততটা মানসিক স্থৈর্য আর এখন নেই।

সুতরাং তরুণ প্রহরীটিকেই তার প্রয়োজন। খুবই তরুণ অবশ্য। বোধহয় কুড়ি-বাইশের বেশী বয়স হবে না। ওকেও বিপদে ফেলতে মায়া হয়, কিন্তু উপায় কি? মস্তানী তার মালিককে কথা দিয়েছে যে। সে কথা তাকে রাখতেই হবে।...

সারা দুপুর সখারাম একাই পাহারা দিল। হয়ত সকালেই খেয়ে নিয়েছিল সে, কিংবা দুপুরে খেতে যাবে না এই রকম কোন বন্দোবস্ত ছিল। একেবারে তৃতীয় প্রহর পার ক'রে রঘুজী এল

সখারামকে ছুটি দিতে। হয়ত এটা সাময়িক বিশ্রামের অবসর কিংবা এইটেই ওদের আহারের সময়, কে জানে। তবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভাইপোকে যে ভাবে নানারকম নির্দেশ দিয়ে গেল সখারাম, তাতে মনে হ'ল খুব তাড়াতাড়ি—অন্তত এক-আধ দণ্ডের মধ্যে ফিরবে না সে।

এইবার প্রস্তুত হ'ল মস্তানী।

গবাক্ষ ছোট, এক বর্গ হাত পরিমাণ বড় জোর—তবু তা-ই যথেষ্ট। বাইরেটা অনেকখানি পর্যন্ত দেখা যায়।

সামনের প্রহরীকে তো বটেই। একেবারেই সামনে বসে আছে সে, কাকার পরিত্যক্ত সেই বাচ্ছা চৌকিটার ওপর। আর কাকার মতোই প্রাণপণে চেষ্টা করছে জানলাটাকে বাঁচিয়ে চলতে, কোনমতে ওদিকে না চোখটা পড়ে। অথচ অল্প বয়সের কৌতূহল অপ্রতিহত দুর্বার গতিতে আকর্ষণ করছে তার মন এবং দৃষ্টি—ফলে সে বেচারা বারবার শুষ্ক মুখে অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, তালাগুলো দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে—কপাটের ওপর ও দুপাশের দেওয়ালগুলোয় চোখ বোলাচ্ছে ঘনঘন—ওদিকে চিমনজীর প্রবেশপথটা চেয়ে চেয়ে দেখছে। অর্থাৎ সব দিকেই চাইছে কেবল জানলাটার দিক ছাড়া। অথচ ঐদিকেই আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী তার, সে অনুভব করতে পারছে যে বন্দিনী এই মাত্র চার-পাঁচ হাত দূরে ঐ জানলাটার ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে—কারণ কঙ্কণের কিঙ্কিণী ও চারপাই থেকে ওঠবার মৃদু শব্দ সবই পেয়েছে সে যথাসময়ে—ও-পক্ষের গতিবিধি অনুমান করতে কোন অসুবিধা হবার কথাও নয়; প্রবল লোভ হচ্ছে একবার চেয়ে দেখতে।—প্রবল প্রতাপ পেশোয়াকে যে জাদু করেছে, না জানি সেই কুহকিনী কেমন দেখতে; শুনেছে দুর্লভ সুন্দরী, সে সম্বন্ধেও তরুণ যুবকের স্বাভাবিক আকর্ষণ তো একটা আছেই—কিন্তু লোভ যতই দুর্নিবার হোক, বাধাও বড় কম নয়, ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃশ্রী রাধাবাঈজী আর কাকাসাহেবের কঠোর হুঁশিয়ারী

মনে পড়ে যাচ্ছে। সুদৃঢ় মজবুত দেওয়ালের নিরাপদ ব্যবধান সত্ত্বেও চোখের ওপর চোখ রাখতে ভরসায় কুলোচ্ছে না কোনমতেই।

বেশ কয়েক মুহূর্ত ধরে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মস্তানী, অবস্থাটা অনুমান করতেও দেরি হল না তার। এবার আর হাসি চাপবারও চেষ্টা করল না, খিলখিল ক'রে হেসে উঠল সে।

আর যেন এইটুকুরই অপেক্ষা ছিল, যেন এইটুকুর জন্যই আটকাচ্ছিল কোথায়—সেই মধুক্ষরা রজতঝরা হাসি কানে যেতে তরুণ রঘুজী স্থানকালপাত্র সব ভুলে বিস্ময়ে কৌতূহলে চোখ তুলে তাকাল সেই হাসির অধিকারিণী—কল্পনা ও জনশ্রুতিতে গড়া—অপূর্ব নারীরত্নের দিকে।

দেখল বলা হয়ত ভুল, চোখ তুলে চাইল। সে চোখ আর ফিরল না, ফেরাতে পারল না কোনমতেই। কারণ এ হাসি শুধু তো শ্রুতি-মধুরই নয়—দৃষ্টিমধুরও যে। যে মুখের এ হাসি সে মুখও যে এই রকম হাসিরই যোগ্য। এমন ভুবনভোলানো হাসি আর এমন অপার্থিব সুন্দর মুখ এর আগে আর কখনও দেখে নি রঘুজী, কখনও ভাবতেও পারে নি যে এমন যোগাযোগ এ পৃথিবীতে সম্ভব।

অনেকক্ষণ মুগ্ধ বিহ্বল অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। তারপর, যেন প্রাণপণ চেষ্টায় চোখটাকে কোনমতে টেনে সরিয়ে নিল সেখান থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি জাদুর সুতোটাও গেল ছিঁড়ে—আবার স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল কাকার উপদেশ, বাঈজী-সাহেবার সতর্কবাণী। এই তো, এই কুহকের কথাই তো তাঁরা বলেছিলেন, কিছু মিথ্যে তো নয় তাঁদের কথা। নির্বোধ সে, সব শুনে বুঝেও এখনই মরতে বসেছিল। নিজের নির্বুদ্ধিতার কথাটা ভেবে প্রচণ্ড রাগ হ'ল তার, সে রাগটা যে কার ওপর তাও বুঝতে পারল না। তার ফলে আরও একটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে বসে রইল। এই উষ্মার মূল কারণটা ভুলে, ওঁদের নির্দেশ ভুলে—যেদিকে পিছন ফিরে থাকার কথা, সেই দিকেই বরং

দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে গেল, উত্তেজিত ক্রুদ্ধস্বরে বলল, 'এই, অত হাসছ কেন? আমি সঙ্‌ না উল্লু যে হাসছ অমন ক'রে আমাকে দেখে?'

'তুমি উল্লু হবে কেন, বালাই ষাট! তুমি মাত্র একটি বুদ্ধু!'

'তার মানে?'

'বুদ্ধু শব্দের মানে বোঝ না?'

'খুব বুঝি। কিন্তু বুদ্ধুপনাটা কোথায় দেখলে আমার শুনি?'

'বুদ্ধু না হ'লে—যেদিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে, তাকাতে হবেই বুঝতে পারছ—সেদিকে না তাকিয়ে এদিক ওদিক চারদিক তাকিয়ে নিজেকে বোকা বোঝাচ্ছ কেন?···আর দোষটাই বা কি? আমার মুখের দিকে একবার চাইলেই অমনি আমি জাদু ক'রে ফেলব কিংবা ভেড়া বানিয়ে দেব, না? ওরা বুড়ো মানুষ, মা-দিদিমার আজগবি গল্পের বেশী কিছু জানে না, ওরা যা বলে বলুক, তুমি অল্পবয়সী আজকালকার ছেলে হয়ে এমন কুসংস্কারে বিশ্বাস করলে কী ক'রে?'

'কে বললে আমি বিশ্বাস করেছি তা?'

'আমি বলছি। সাধ্য থাকে অস্বীকার করো! পারবে না। কারণ তাহ'লে ডাহা নির্জলা মিথ্যা বলতে হবে, আর মিথ্যা কথা তুমি বলতে পারবে না, হাজার চেষ্টা করলেও।'

'সত্যিই তা পারি না আমি, মুখে আটকায়। কিন্তু, আশ্চর্য তো, তুমি—আপনি তা জানলেন কী ক'রে?'

'উহু, উহু—আপনি নয়, তুমিই বলো। আমার একটি ছোট ভাই আছে, বহুকাল তাকে ছেড়ে এসেছি, তুমি তার বয়িসীই হবে।··· অনেক দিন দেখি নি তবু তোমায় দেখে পর্যন্ত তার কথাই মনে হচ্ছে। কোথায় যেন একটা আদল আছে, মনে হয় এতদিনে সে এমনিই দেখতে হয়েছে—তোমার মতোই সুন্দর।'

সুখে আনন্দে গর্বে লজ্জায় রঘুজীর মুখ অরুণবর্ণ ধারণ করল, কপালে সেই চুলের গোড়াগুলো শুদ্ধ যেন লাল হয়ে উঠল, দুই

কানের যেটুকু পাগড়ি থেকে বেরিয়ে আছে তাতে যেন কে আল্‌তার পোঁচ লাগিয়ে দিল।

নেহাতই ছেলেমানুষ, কাঁচা একেবারে। রাধাবাঈ, তুমি এত বুদ্ধি ধরো অথচ এত বড় ভুল ক'রে বসে রইলে! এই কচি ছেলেটাকে পাঠালে বাঘিনীর খর্পরে!—মনে মনে বলে মস্তানী।

লাজুক ভঙ্গীতে মাথা নামিয়ে রঘুজী বলল, 'আমি আবার ছাই সুন্দর। আমাকে কেউ তো কই সুন্দর বলে নি কখনও। আপনার ভাই, সে যদি আপনার মতো দেখতে হয়—অনেক বেশী সুন্দর দেখতে হবে।'

'তা হয়তো হতে পারে', অকপটে বিনা বিনয়ে স্বীকার করে মস্তানী, 'অনেকদিন দেখি নি তো—। তবে তোমাকে দেখেই কে জানে কেন—তার কথা মনে পড়ছে কেবল, তাইতেই বোধ হচ্ছে যে তোমার সঙ্গে তার আদল আছে কিছুটা। নইলে, যাকে একেবারেই ভুলে ছিলাম এতকাল—তার কথা এমন ভাবে মনে পড়বে কেন?···তবে, তোমাকে কেউ সুন্দর বলে নি কখনও—এটা ঠিক কথা হ'ল না, এ তোমার মিথ্যে বিনয়। এতদিন এ প্রাসাদে এত ছেলে দেখছি, তোমার মতো কান্তি কৈ তো বিশেষ চোখে পড়ে নি আমার।'

'বলেন কি?' রঘুজী এবার হাসি-হাসি চোখে তাকাল, 'আপনি আমার অহঙ্কার বাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

'পুরুষমানুষের আবার রূপের অহঙ্কার কি ভাই—ওটা মেয়েদেরই একচেটে। পুরুষের অহঙ্কার তার পৌরুষে, তার শৌর্যে, তার মনুষ্যত্বে।'

'তা ঠিক। ঠিক কথাই বলেছেন আপনি। তবে কদাচিৎ কখনও দুটোর মিলন ঘটে। মহামান্য পেশোয়াই তার প্রমাণ।'

'ছিলেন।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিষাদখিন্ন স্বরে বলে মস্তানী, 'এককালে সত্যিই তাঁর শৌর্যের খ্যাতির সঙ্গে তাঁর রূপের খ্যাতিও হিন্দুস্থানে আলোচনার বস্তু ছিল। মুঘল হারেমের

জেনানারা পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠতেন তাঁকে দেখার জন্যে। তাঁদেরই আগ্রহে বাদশা পটুয়া পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে, ছবি এঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু এখন আর তার কিছুই নেই। এর মধ্যে চেয়ে দেখেছ তাঁর দিকে? কী কৃশ, কী শীর্ণ হয়ে গেছেন আমার মালিক, আর কী পরিমাণ দুর্বল। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আজকাল তাঁর দীর্ঘ দেহ চলতে গেলে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে কি বসতে পারেন না।'

'দেখেছি বৈকি!' রঘুজীর চোখে বুঝি আবার ঘৃণা ও বিদ্বেষের দৃষ্টি ফুটে ওঠে, তিক্তকণ্ঠে বলে, 'দেখেছি বৈকি! সেই জন্যেই তো আমাদের সকলের চেষ্টা, যাতে মহান পেশোয়া আবার আগের স্বাস্থ্য ও কান্তি ফিরে পান!'

আবারও হেসে উঠল মস্তানী। তেমনিই খিলখিল ক'রে। তেমনিই রজতঝরা হাসি, তবু কোথায় যেন তার মধ্যে একটু করুণ সুরেরও স্পর্শ আছে। রঘুজী বিভ্রান্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠল সে হাসির ধ্বনিতে। একবার মনে হ'ল ছুটে পালিয়ে যায় সে এখান থেকে, গিয়ে কাকাকে ডেকে নিয়ে আসে।

কিন্তু সে অবসর আর মিলল না। মধুক্ষরা কণ্ঠে করুণ সংবেদন ঝরে পড়ল, 'ছাখো ভাই,—আমার দিকে চাও মুখ তুলে, ভয় নেই, এই দু-হাত পুরু পাথরের দেওয়াল আর কব্জিসমান লোহার গরাদে ভেদ ক'রে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার লোহু চুষে খাব না— বলছি যে তুমি তো বুদ্ধিমান—না না, মিথ্যে বিনয় করো না, ঈশ্বর যাকে এমন অপরূপ কান্তি দিয়েছেন, এই বয়সেই এমন শৌর্য দিয়েছেন, তাকে বুদ্ধি দেন নি এ আমি বিশ্বাস করি না, আর এ এমন কিছু জটিল সমস্যার কথাও নয়, নিতান্তই সাধারণ বুদ্ধির কথা —আমাকে যদি তোমরা খুব স্বার্থপর বা ডাকিনীই মনে ক'রো, তাহলে আমার স্বার্থর কথাটাই আগে ভেবে ছ্যাখো। আমার স্বার্থটা কিসে বেশী বজায় থাকে—পেশোয়া বেঁচে থাকলে, না মরে

গেলে? এ প্রাসাদে কেন, এ রাজ্যেই আমার কেউ হিতাকাঙ্খী নেই, সকলেই ঈর্ষিত, বিদ্বিষ্ট,—সে যেমন তোমরাও জানো তেমনি আমিও জানি। জানা উচিত, নয় কি, নইলে আমার কিসের এত শয়তানী বুদ্ধি! তাহলে আমি জেনে শুনে তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি, এটা তোমরা বিশ্বাস করলে কী ক'রে?'

কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে রঘুজী। যুক্তি অকাট্য বলেই মনে হয় তার। সত্যিই তো, সেই পেশোয়াই তো এর একমাত্র আশ্রয়, তিনি না থাকলে তো দলে পিষে মারবে সকলে। অপর কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে পেশোয়ার কবল থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে—এমন ধরনের কথাও তো কখনও শোনে নি। এই স্ত্রীলোকটার নামে বহু দুর্নাম উঠেছে—কেবল এইটে ছাড়া। সে অপর কোন পুরুষে আসক্ত, এমন অপবাদ কেউ দেয় নি। তবে?

তার চোখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারে মস্তানী নিজের কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া। সে আরও আস্তে, আরও বিশ্বাসজনক ভাবে বলে, 'তা নয় ভাই। বরং উল্টোটাই। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অতিরিক্ত চিন্তাতেই পেশোয়ার এই অবস্থা। এ বংশে এঁদের কারুরই শরীর ভাল না। ক্ষয়রোগ আছে এঁদের সকলকারই। চিমনজী আপ্পার চেহারা দেখেছ? নিত্য জ্বর হয় ওঁর, বৈদ্যর মুখেই শুনেছি। শুধু মনের জোরে চলেন এঁরা। মনের জোরে অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে যান। কিন্তু বেশী দিন তা চলে না, মনকে হার মানতে হয় দেহের নিয়মের কাছে। পেশোয়াও এবার তাই মানতে বাধ্য হচ্ছেন। ···সেটা এঁরা কেউ ভাবেন না—কিসে তাঁর বিশ্রামের সামান্য অবসরটুকু মধুর হ'তে পারে, কেমন ক'রে তাঁকে একটু পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো যায়—সে চেষ্টা কারও নেই। এঁরা শুধু জানেন ঈর্ষা আর বিদ্বেষ। মহিষী কাশীবাঈয়ের প্রাসাদের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়—তাঁর সম্ভ্রমে বাধে। এই দাসী মস্তিবাঈয়ের সে মিথ্যা সম্ভ্রমবোধ

নেই, সে চেষ্টা করে পথে বা অরণ্যে—রণক্ষেত্রে বা বিলাস-কক্ষে সর্বদা কাছে কাছে থেকে তাঁর একটু স্বাচ্ছন্দ্য, একটু সেবার ব্যবস্থা করার, প্রয়োজনমতো জিনিসগুলো হাতে হাতে যোগানোর, অবসর মুহূর্তগুলিকে নৃত্যে-গীতে মধুর ও আরামদায়ক ক'রে তোলার—দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে কিছু কালের জন্যে মন আর মাথাকে শান্ত মাধুর্যে ডুবিয়ে রাখার। এটা কি আমার খুব অন্যায়?'

'না না—কিছুতে নয়। এই তো আসল সহধর্মিনীর কাজ।' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে রঘুজী। আরও একটু কাছে এগিয়ে আসে সে। এবার জানলার মধ্য দিয়ে তার নজরে পড়ে অস্পর্শিত খাদ্যের থালাটা।

'এ কি, আপনি কিছু খান নি?' ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করে সে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলে, 'খাবেনই বা কি ক'রে—এ খাবার আপনার গলা দিয়ে নামা সম্ভব নয়। সাধারণ কয়েদীর খাদ্য এ। ইস্…এতটুকু বিবেচনাও নেই বাঈজী-সাহেবার।'

'না না—তার জন্যে নয়।' যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ে মস্তানী, ম্লান হেসে বলে, 'খেতে পারব না বলে খাই নি—তা নয়। ও-সবে আমার কিছু এসে যায় না। খাবো এক সময়ে ঠিকই। আর খেতেই তো হবে। সত্যিই কিছু দীর্ঘকাল উপবাস ক'রে থাকতে পারব না। তবে এখন এই মুহূর্তে কিছুতে যেন মুখে উঠছে না কিছু।' আবারও করুণ হয়ে ওঠে তার কণ্ঠ, 'যখনই মনে হচ্ছে যে সেখানে, সেই ছাউনীতে তাঁর খাওয়া-শোওয়া বা পরিচর্যার কথা চিন্তা করে এমন একজনও নেই—আমার সেবায় অভ্যস্ত মালিকের হয়ত সময়ে স্নানাহার পর্যন্ত হচ্ছে না—তখন আর যেন নিজের খাওয়ার কথা ভাবতেই পারছি না। পেশোয়া এ-সব বিষয়ে এখনও শিশুর মতো, তাঁর নিজের কখন কি প্রয়োজন তা তিনি নিজেই বুঝতে পারেন না। খাবারের থালা সামনে নিয়ে খেতে ভুলে যান। কেউ খাবার নিয়ে এলে হয়ত তাকে তিরস্কার করবেন—বলবেন, এই

তো একটু আগেই খেলাম। আসলে খাওয়া হয়েছে কি-না তা-ই বুঝতে পারেন না, মনেও থাকে না কিছু।'

বলতে বলতেই সেই আয়ত সুন্দর চোখের কোলে কোলে মুক্তাবিন্দুর মতো অশ্রু টলটলিয়ে ওঠে। অথচ তখনও মুখের সেই ঈষৎ-করুণ হাসিটা মিলিয়ে যায় না একেবারে। এই হাসিতে-কান্নায় মেশা সেই আশ্চর্য সুন্দর মুখ যে-কোন পুরুষের চিত্তে বিভ্রান্তি জাগাবে—এই তো স্বাভাবিক।···

চোখ ছলছলিয়ে এসেছিল রঘুজীরও। পেশোয়ার নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ আর এই নারীর আকুতি—দুই-ই অভিভূত ক'রে তুলেছে তাকে। মুগ্ধও হয়ে গেছে সে, বহুশ্রুত এই মায়াবিনী যে এমন মহীয়সী, এমন হৃদয়বতী, এমন সাধ্বী, তা সে কখনও কল্পনাও করে নি। ভুলে গেল সে বাঈজী-সাহেবার ও নিজের কাকার সতর্ক-বাণী। ওঁদের সঙ্কীর্ণচিত্ততায় বরং কেমন ঘৃণাবোধ হ'তে লাগল তার, আর সেই সঙ্গে ঈষৎ অনুতাপও। এঁকে চিনতে পারে নি ওরা কেউ, সবাই অবিচার করেছে। এর একটি কথাও মিথ্যা নয়, কোন যুক্তিই অগ্রাহ্য করা যায় না। সত্য কথাই বলছে এ, আগাগোড়া সত্য কথা বলেছে। মহারাষ্ট্র-গৌরব পেশোয়া বাজীরাও-এর একমাত্র হিতাকাঙ্খিণী নারীকে কারারুদ্ধ ক'রে রেখে শুধু অন্যায় নয়—এক বিরাট পাপই করছে তারা।

সে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল, আমি—'আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করছি—আপনার মুক্তির জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব, কিন্তু আপনাকেও একটি মিনতি রাখতে হবে আমার। আমি সামান্য একটু মিঠাই এনে দিচ্ছি, দোহাই আপনার—আপনি যা হয় কিছু মুখে দিন। এমন ক'রে মিছিমিছি উপবাস ক'রে থাকবেন না।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন ফিরছিল সে, কিন্তু মস্তানী তাকে সুযোগ দিল না। দূরে যাবার আগেই জানলার গরাদ দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার কাঁধটা চেপে ধরল, তারপর সেই ভাবেই তাকে আর-

একটু কাছে টেনে এনে নিজের ওড়নার প্রান্ত দিয়ে তার কপালের ও চোখের কোলের ঘাম আর চোখের জল মুছিয়ে দু হাতে তার দুই গাল ধরে মুখখানা নিজের চোখের দিকে ফিরিয়ে বলল, 'লক্ষ্মী ভাইটি আমার—এমন চট্ ক'রে বিপদ ডেকে এনো না।···তুমি ছেলেমানুষ, একেবারেই কাঁচা, তুমি জানো না—জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষাই হ'ল বিনা বিচারে কারও কথা বিশ্বাস না করা। আমাকে চেন না—জানো না—কতটুকুই বা পরিচয়, এত সহজে আমার কথা বিশ্বাস ক'রে বসলে? এমন ছেলেমানুষ হ'লে জীবনের পদে পদে ঘা খেতে হবে। তোমাদের মাতুশ্রী-সাহেবা—তাঁকে দীর্ঘকাল, হয়ত বা আজন্ম দেখছ। তাঁর কথা যে ঠিক নয়, তাই বা ভাবলে কেমন ক'রে? হয়ত আমি তোমার সঙ্গে অভিনয় করছি আগা-গোড়াই, হয়ত সব কথাই আমার মিথ্যা—হয়ত সত্য-সত্যই কুহকিনী জাদুকরী—কে বলতে পারে সে কথা? আমার দুটো মিষ্টি কথায় তোমার গুরুজনদের উপদেশ-নির্দেশ ভোলা কি তোমার উচিত?'

সেই স্পর্শে, সেই সস্নেহ বাক্যে—যেটুকু সংশয় থাকতে পারত রঘুজীর মনে, সেটুকুও আর রইল না। সে আস্তে আস্তে নিজের গাল দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে দুহাতে মস্তানীর দুটো হাত চেপে ধরল। তেমনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'সে যাই হোক, ঠকি-জিতি—আমার কথার নড়চড় হবে না বাঈ-সাহেবা। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়েছি, সে শপথ আমি পালন করবই।'

'কিন্তু ভাইটি আমার, কথা দিয়ে যাও যে সাবধানে চলবে, অকারণ নিজের ওপর কোন বিপদের ঝুঁকি আনবে না?···তোমাকে ভাই বলেছি, তোমাকে দেখে আমার আপন ভাইয়ের স্মৃতি জেগেছে—কেবল তার কথাই মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে সেই ভাই-ই আমার অন্য নামে এসেছে—আমার জন্যে যদি তোমার কোন বিপদ হয় তো সে আমি সইতে পারব না।'

ততক্ষণে রঘুজীর স্বাভাবিক শান্ত গাম্ভীর্য ফিরে এসেছে। সে

সংক্ষেপে ধীর ভাবে বলল, 'আমি কথা দিচ্ছি দিদি, সাবধানেই চলব অকারণে কোন ঝুঁকি নেব না। নেব না তার কারণ, তাতে আপনার মুক্তিই বিলম্বিত হতে পারে।'

॥ ১৩ ॥

আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না রঘুজী, কারণ ওদিক থেকে সখারামের পায়ের শব্দ শোনা গেল। সে আবার এল সন্ধ্যারও বেশ কিছুটা পরে—প্রহর খানেক উত্তীর্ণ হয়ে গেলে।

তার এই বিলম্বের জন্য সখারাম কিছু তিরস্কারই করল। এত রাত্রে গিয়ে সে স্নান-সান্ধ্যপূজা সেরে কখনই বা খাবে, আর কতটুকুই বা বিশ্রাম করবে। আবার তো সেই ভোর হতে না হতে তাকে এসে এই পাপের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতে হবে।

অপরাধীর মত মাথা চুলকে রঘুজী বলল, 'আমাকেও তো খাওয়া দাওয়া সেরে আসতে হ'ল, লঙ্গরখানায় আজ রসুই পাকাতে দেরি হয়ে গিয়েছে।···আপনি না হয় কাল দেরি ক'রেই আসবেন একটু—স্নান-পূজা সেরে। আমি—আমার এখানে দেরি হ'লেও কোন ক্ষতি হবে না।'

ঈষৎ যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বদ্ধ দোরটার দিকে তাকিয়ে সখারাম (জানলার দিকে তাকাবে না—জাহুর ভয়) অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলল, 'না না, তোমাকে আর বেশী বাহাদুরি করতে হবে না। তোমারও তো মুখ-হাত ধোওয়া আছে, তাছাড়া আমাকে লোক-লস্কর এনে চাবি খুলে দাঁড়াতে হবে, জমাদার আসবে সাফাই করতে, খাবার জল দিয়ে যাবে—সে-সব কাজ তো তোমাকে দিয়ে চলবে না। বাঈ-আম্মাসাহেবার কড়া হুকুম, আমি ছাড়া আর কাউকে চাবি দেবেন না তিনি, আর কাউকে বিশ্বাস নেই।'

ঈষৎ গর্বের সঙ্গেই মোচে তা দিতে দিতে সখারাম চলে গেল।

তার পদশব্দ দূর অলিন্দে মিলিয়ে যাবারও অনেক পরে, প্রাসাদের এ অংশ নির্জন ও নিস্তব্ধ হয়ে এলে রঘুজী জানলার কাছে এসে দাঁড়াল, 'দিদি।'

'এই যে ভাই, আমি এখানে দাঁড়িয়েই আছি।'

নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে এত কাছে থেকে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে উত্তরটা আসাতে একটু যেন চমকেই উঠল রঘুজী, ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল বুকের মধ্যেটা। সত্যিই কোন অনৈসর্গিক ক্ষমতা আছে কিনা এই মহিলার—সে সম্বন্ধেও একটা সংশয় জাগল মুহূর্তের জন্য। কিন্তু শরতের লঘুপক্ষ একটুক্রো মেঘের ছায়ার মতোই নিমেষে সরে গেল তা। বন্দিনী মুক্তির আশা পেয়েছে, সে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এই তো স্বাভাবিক। তাছাড়া এখনও যথেষ্ট গরম রয়েছে, ঐ চারিদিক রুদ্ধ নিরেট পাষাণ-কারার মধ্যে রাজ-কন্যা রাজরাণীর দম বন্ধ হয়ে এসেছে হয়ত, তাই একটুখানি শীতল নির্মল বাতাসের জন্য এই সামান্য উন্মুক্ত স্থানটুকুকে আঁকড়ে ধরেছে প্রাণপণে।

নিজের সংশয়ের জন্য লজ্জিত বোধ করল রঘুজী, আস্তে আস্তে, কতকটা অনুনয়ের সুরে বলল, 'এই—একটু মিঠাই এনেছি দিদি, আগে খেয়ে নিন, তারপর অন্য কথা বলছি—'

সে জানলার গরাদের মধ্য দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা একটা করে পাঁচ-ছটা মিঠাই মস্তানীর বদ্ধকরপুটে তুলে দিল। মৃদুকণ্ঠে অনুযোগ করল মস্তানী, 'কেন আবার এসব আনতে গেলে ভাই, এক-আধ দিনের উপবাসে আমার কিচ্ছু হয় না, কিচ্ছু হ'ত না আজকে না খেলে।'

'তা হোক, এ তো সামান্যই, উপবাসের পক্ষে কতটুকুই বা, এটুকু অন্তত না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বেন যে। আমাদের যা উদ্দেশ্য তা সাধন করতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হবে, হয়ত অনেক দৈহিক ক্লেশও স্বীকার করতে হবে। তার জন্য দেহটা ঠিক থাকা দরকার।'

আর কিছু বলল না মস্তানী। সত্যিই তার তখন কষ্ট হচ্ছিল। তখনও পূর্ণ যুবতী সে, স্বাস্থ্যবতী। তাছাড়া নৃত্যে অশ্বারোহণে নিয়মিত ব্যায়াম চলে তার—সুতরাং ক্ষুধা স্বভাবতই বেশী, হজম করার শক্তিও। সারাদিনের উপবাসে মাথা ঝিম ঝিম করছে তার। সে সব ক'টা মিঠাই-ই খেয়ে ফেলল, খেয়ে সুরাই থেকে কয়েক চুমুক জল খেয়ে আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াল।

'তারপর ?'

'একটু তুঃসংবাদ আছে দিদি, আজই কিছু করা যাবে না। বাঈ-আম্মাসাহেবা এই তিনটি তালার চাবি সর্বদা নিজের কাছে রাখছেন। স্নান করছেন, পূজা করছেন, আহার করছেন—ঐ চাবি আঁচলে বেঁধে। হয়ত ঘুমোচ্ছেনও ঐ চাবি কোমরে গুঁজেই। একমাত্র আমার কাকাকে বিশ্বাস করেন তিনি—তাও যে একা ছেড়ে দেবেন তা মনে হয় না। সম্ভবত সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়াবেন। এই খোঁজ পেয়ে আমি গিয়েছিলাম বাগানের মধ্যে আমাদের লোহারের কাছে। পেশোয়ার নিজস্ব লোহার, তালা তৈরি করালে তার কাছ থেকেই করিয়েছেন নিশ্চয় বাঈ-আম্মাসাহেবা। তাছাড়া তার তালা তৈরিতে নাম-যশও আছে। সে ঘুঘু লোক, কিছুতেই স্বীকার করবে না—শেষে, শেষে তাকে আমার স্ত্রীর কণ্ঠহার পুরস্কার দেব এই অঙ্গীকার ক'রে কথা বার করেছি, সে স্বীকার করেছে যে এ তালা তারই তৈরি আর চাবির গঠন তার মনে আছে। সে আর একপ্রস্থ ক'রেও দেবে—তবে দিনে তার কারিগরদের সামনে পারবে না, কারণ একজনও যদি জানতে পারে—কথা ছড়িয়ে পড়ার ভয় আছে, আর তাহলে তার শির থাকবে না। বাঈ-আম্মা যদি ক্রুদ্ধ হন—স্বয়ং পেশোয়াও তাকে রক্ষা করতে পারবেন না, অন্তত অত হাঙ্গামা তিনি করবেন না। কাজেই রাতে রাতে তাকে তৈরি করতে হবে, একা। দেরি হবে। হয়তো আরও তুটো দিন অপেক্ষা করতে হবে—'

'আরও তুদিন!' মস্তানীর কণ্ঠে হতাশা চাপা থাকে না। হতাশা আর ক্ষোভ, অসহায় ক্ষোভ—পরাজয়ের গ্লানি মেশানো, 'আরও তুদিন এই ভাবে কাটাতে হবে?'

'কোনও উপায় নেই দিদি, বিশ্বাস করুন।' রঘুজী যেন করুণ মিনতি করে, 'আমার প্রাণপণ করেছি আমি। এই জন্যই এত দেরি হ'ল আসতে, সব কারিগর বেরিয়ে না গেলে কথা পাড়তেই পারি নি। যদি, যদি কাজ উদ্ধার হবার আগে এ ষড়যন্ত্রের বিন্দুমাত্র খবর বাইরে ছড়ায় তো সে বেচারাও যাবে আমিও যাব, সপরিবারে। তবু তার জন্য ভাবি না, আপনাকে নিরাপদে এখান থেকে মুক্ত ক'রে দিতে পারলে আমার সব তুঃখ সার্থক হবে।'

ততক্ষণে মস্তানী সামলে নিয়েছে নিজেকে। সহজ বুদ্ধির জয় হয়েছে তার। সে-ও যেন আকুল হয়ে উঠল, বলল, 'কিন্তু তুমি আমার ভাবীর গলার হার, হয়ত বা তার বিয়ের হার দিয়ে বসে রইলে তাই বলে! ছি ছি, কী করলে বলো তো? আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি। তুমি আমার হার চেয়ে নিয়ে গেলে না কেন!'

'আপনার অলঙ্কার বড় বেশী পরিচিত দিদি, সে গহনা বেচতে গেলে যে সে বেচারী মারা পড়ত। আর তখন সময়ও তো ছিল না। এবার—এবার বাড়ি থেকে আসার সময় খুলে দিয়েছিল আমাকে, কোঁড়া কেটে গিয়েছিল—সেটা সারিয়ে নিতে। সেই থেকে আমার জেব-এই ছিল। কোন অসুবিধা হয় নি দিদি—বিশ্বাস করুন। আপনার সংকোচের কোন কারণ নেই। আমার যথাসর্বস্বও যদি আপনার কাজে উৎসর্গ করতে পারি, তাহলে সবচেয়ে সুখী হবো। তার চেয়ে সার্থকতা আর আমার জীবন বা ধনসম্পদের কী হ'তে পারে?'

খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল রঘুজী, ওর জানলার গরাদের ওপর একটা হাত রেখে। মস্তানী তুহাতে ওর সেই হাতটা চেপে ধরল, ঠেকাল নিজের কপালে, তারপর গাঢ়স্বরে বলল, 'তোমার কাছে যা

পেলাম ভাই, হয়তো তুমি আমার নিজের ভাই হ'লেও তা পেতুম না। তোমার এ আত্মত্যাগের ঋণ কোন পার্থিব মূল্যে শোধ হয় না, তবু বলছি, যদি আমি মুক্তি পাই—আর একদিনের জন্য, এক প্রহরের জন্যও আমার মালিকের সঙ্গে মিলিত হতে পারি তো তোমার জীবন বা তোমার ধনসম্পদ কোনটারই কোন ক্ষতি হবে না। তবে আবারও বলছি, ঐ সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর ওজনে সোনা দিলেও তোমার এ স্নেহের শোধ হয় না ভাই। আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমার এই স্নেহময় বালক ভাইটির কথা মনে থাকবে।'...

হয়ত এ অভিনয় নয়—সত্যিই আন্তরিক। খেলা হয়ত আর খেলা নেই, মহান সত্যের সামনে এসে দাঁড়িয়ে, তার অমৃতস্পর্শে মিথ্যাও সত্যে পরিণত হয়েছে কখন। সে যাই হোক, রঘুজী যেন শিউরে কেঁপে উঠল, বিশেষ ক'রে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন ঐ ললাটের স্পর্শে; বিহ্বল হয়ে গেল। নিজের ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমেছিল আগে থেকেই, এখন তা সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ল। জলধারার মতো গড়িয়ে পড়তে লাগল কণ্ঠ কপোল বেয়ে, মস্তানীর হাতের মধ্যে ধরা হাতখানা কাঁপতে লাগল থর থর ক'রে।...সামনের দেওয়ালে ওপরের ঝুলনো শামাদানের আলো এসে পড়ে প্রতিফলিত হয়েছে এ দেওয়ালেও, তারই একটা আভা পড়েছে উপবাসক্লিষ্ট ঈষৎ শুষ্ক অপরূপ সুন্দর একটি মুখে। সম্পর্ক যা-ই হোক, এই মুখ যার তার সুখের জন্য শান্তির জন্য চরম আত্মত্যাগ না করা পর্যন্ত সেই তরুণ যুবক স্থির হবে কেমন ক'রে!

বেশ কিছুক্ষণ কাটল সেই বিহ্বলতায়, সেই অদ্ভুত অনুভূতিতে। তারপরই যেন চমকে উঠল রঘুজী। প্রাণপণ চেষ্টায় সম্বিৎ ফিরিয়ে আনল আবার। সহজ ভাবে বলবার চেষ্টা করল, 'তুটো কি তিনটে দিন একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। চাবি ছাড়াও কিছু আয়োজন আছে। ঘোড়া চাই একটা। সে ঘোড়া প্রস্তুত ক'রে বাইরে রাখতে হবে,

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রাসাদের ফটক বন্ধ থাকে, তার ভেতর বিনা অনুমতিপত্রে একটা মাছিরও যাওয়া-আসা নিষেধ। সে অনুমতিপত্র দেওয়ার মালিক এখন চিমনজী আপ্পা। সেও নিতে যাওয়া চলবে না। যখন ফটক খুলবে তখনই—একটু আব্‌ছা আঁধার থাকতে থাকতে বেরিয়ে যেতে হবে। পুরুষের পোশাকে যেতে হবে—সিপাহীর পোশাক হ'লে আরও ভাল হয়। এমন কত লোকই তো কত কাজে যায়—কেউ সন্দেহ করবে না। আমিও আপনার সঙ্গে যাব, ঘোড়া যেখানে থাকবে সেখান পর্যন্ত, এখান থেকে আলাদা বেরোব—দূরে দূরে, বাইরে গিয়ে একত্র হাঁটলেও ক্ষতি নেই। আপনাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে দিলে নিশ্চিন্ত, তারপর আশা করি পাটাস পর্যন্ত যেতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না।'

'তা হবে না। কিন্তু ঘোড়া একটা নয়, দুটো চাই ভাই। দরকার হ'লে আমার খৎ নিয়ে যদি শহরে যাও, বহুলোক তোমাকে টাকা ধার দেবে। কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে, বিশেষত তোমার। কোনমতে এখন যদি চালিয়ে নিতে পারো, এর পর কড়াক্রান্তিতে শোধ দিতে পারব।'

'কিন্তু দুটো ঘোড়া কি হবে দিদি?'

'সে পরে বলব। আর একটি অনুরোধ—যদি সম্ভব হয়, না ম্ভব নয়—আনতেই হবে, কোনমতে এক তা কাগজ আর একটু দোয়াত-কলম এনে দিও। একটা খৎ লিখতে হবে।'

'দেব।' বলে কপালের ঘাম মোছে রঘুজী। দ্বিতীয় প্রহরের শান্ত্রী বদল হবে, চৌকিদাররা ঘুরে দেখে যাবে সব ঠিক আছে কিনা। এবার একটু সতর্ক হওয়া দরকার। রঘুজী একটু সরে গিয়ে কাকার সেই ছোট চৌকিটার ওপর বসে পড়ল। বসার প্রয়োজনও ছিল, পা-দুটো কাঁপছে তখন থেকে, ভেঙে আসছে যেন। বিভিন্ন অনুভূতির সংঘাত দৈহিক আঘাতের চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে তার।

পরের দিন সত্যিই রাধাবাঈ নিজে এসে দাঁড়ালেন দরজা খোলার সময়। পাখী এখনও খাঁচায় আছে দেখে আশ্বস্তও হলেন যেমন, একটু বিজয়গর্বও বোধ করলেন। বিশেষ ক'রে অভুক্ত খাদ্যের থালা এবং বন্দিনীর নিরতিশয় শুষ্ক মুখ দেখে তাঁর পৈশাচিক আনন্দ বোধ হ'ল।

'দেখা যাক ক'দিন না খেয়ে থাক তুমি, ঐ ভাতই খেতে হবে। ভেবো না যে মেজাজ দেখালেই আমি পাল্‌টে রাজভোগের ব্যবস্থা করব।' মনে মনে বললেন রাধাবাঈ।

সেদিনও অবশ্য খেল না মস্তানী, খাওয়ার প্রয়োজনও হ'ল না। সেদিন দুপুরেই এক সময়—সখারামকে স্নানাহারের অবসর দেওয়ার ছুতোয়—রঘুজী এসে কয়েকটা ক্ষীরের লাড্ডু দিয়ে গেল। আবার রাত্রে নিয়ে এল গরম মালপুয়া দুখানা, বিনায়কের প্রসাদ। জানালো যে ঘোড়া দুটোরই ব্যবস্থা করেছে সে, তার জন্য তাকে বন্ধুমহলে বহু টাকা ঋণ করতে হয়েছে, এত দিনের সঞ্চিত টাকা—যা সে দেশে একটা ঘর তুলবে বলে জমিয়ে রেখেছিল প্রাণপণে, বলতে গেলে না খেয়ে, তাও বেরিয়ে গেছে।…এ কথা অবশ্য সহজে বলে নি, প্রাণ-পণে চেপে রাখারই চেষ্টা করেছিল, মস্তানী তার সহানুভূতি দিয়ে স্নেহ দিয়ে অভিভূত ক'রে বার ক'রে নিল কথাটা। আপসোসের সীমা রইল না তার, আসার সময়ে নগদ টাকা কিছু না আনার জন্য। হৃদয়াবেগ চালিত বোকার মতো ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছে সে—নিজের বুদ্ধির ওপর ভরসা ক'রে।

পরের দিন কিন্তু রাধাবাঈ নিজেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন, ভাতের থালার একটি ভাতও স্পর্শ করা হয় নি দেখে। ছেলেকে চেনেন তিনি, ভয়ঙ্কর ক্রোধ তার—লঘু-গুরু জ্ঞান থাকে না রাগলে। মস্তানী অনাহারে ছিল এ-কথা কানে গেলে মাকে অপমান করাও আশ্চর্য নয় তার পক্ষে।…

সেদিন তিনি কিছু উৎকৃষ্ট অন্নেরই ব্যবস্থা ক'রে দিলেন—অন্নব্যঞ্জন,

শ্রীখণ্ড এবং পায়স। আজ মনে মনে হাসবার পালা মস্তানীর। সে কিন্তু আর এ খাদ্য উপেক্ষাও করল না। শুধু মিঠাই খেয়ে জীবন-ধারণ হয়ত করা যায়, স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রাখা যায় না তাতে।···

অবশেষে এল সেই মুক্তির দিনটি। দু-দিনেও চাবি শেষ করতে পারে নি লোহার। বেশীই লেগে গেল সময়। তা হোক, এমন কিছু বেশী দিন নয়! আর, প্রথম দু-তিন দিনের সতর্কতা ইতিমধ্যেই শিথিল হয়ে এসেছে কিছু, ওদের পক্ষে সে-ই সুবিধা। জাদুকরী তেমন কোন ভেল্‌কি দেখালে প্রথম দিনেই দেখাতে পারত, রাধাবাঈ বুঝেছেন ওর ঝুলিতে বেশী কিছু নেই। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন তিনি।

শেষ রাত্রে চুপি চুপি তালা খুলে দিল রঘুজী। তখন অবশ্য প্রাসাদ থেকে বেরনো যাবে না, সে সময়ের একটু আগেই বেরোল ওরা। এটা লোহাররাই শিখিয়ে দিয়েছিল ওদের। রাত আড়াইটে থেকে তিনটে—এই নাকি সবচেয়ে গাঢ় ঘুমের সময়, এই সময়ই চোরেরা সিঁধ কাটে। লোহাররাই সিঁধ-কাঠি গড়ে, তাদের সঙ্গে চোরেদের যোগাযোগ আছে। অতএব তাদের মত অভ্রান্ত।

জানলার পাল্লাটা ক'দিন মধ্যে মধ্যে ভেজিয়ে রাখছিল মস্তানী ইচ্ছা ক'রেই, এই পলায়নের প্রস্তুতি হিসেবে। আজ ভাল ক'রে বন্ধ করল ভিতর থেকে। তারপর নিজের পোশাক ছেড়ে, পুরুষ মজুরের পোশাক পরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আবার যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে তালা তিনটে বন্ধ করল রঘুজী। তারপর জুতো খুলে খালি পায়ে দুজনেই নেমে এসে বাগানে পড়ল।···প্রাসাদের বড় ফটকের দিকে গেল না ওরা, ওখানে পাহারার কড়াকড়ি বেশী, ভীড়ও বেশী ঢের। রঘুজীর চেনা লোক বেরিয়ে যাবে হয়ত। তখন নানান জবাবদিহি, কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ, সঙ্গে এ-ছোকরা কে—ইত্যাদি। দিনের আলোয়—তা সে যত ভোরেরই হোক—ছদ্মবেশ বজায় রাখা শক্ত, বিশেষ মস্তানীর মতো রূপসীর।···

গেল ওরা উত্তর দুয়ারে। এই দিকটার ফটক এখনও পুরো তৈরি হয় নি। ছত্রপতি নিষেধ করেছিলেন। পেশোয়া বাজীরাও-এর পুণার এই প্রাসাদ ছত্রপতির তো বটেই, স্বয়ং নিজামের প্রাসাদকেও ছাড়িয়ে গেছে—আকৃতিতে ও আড়ম্বরে—এই কথা কানে আসতেই ছত্রপতি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন বোধহয়। বলে পাঠিয়েছিলেন যে, উত্তর অর্থাৎ দিল্লির দিকের দরওয়াজাটা অসমাপ্তই থাক, নইলে দিল্লির বাদশার প্রতি অসম্মান দেখানো হবে। সেই দরওয়াজা সেই থেকে সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে, অসমাপ্ত খিলেন, কপাট বসে নি এখনও, ইঁট আর পাথর সাজিয়ে ভরাট করে রাখা হয়েছে শূন্যতাটা, তার পাশ দিয়ে লোক-চলাচলের একটা সঙ্কীর্ণ পথ ক'রে নিয়েছে লোকে—প্রয়োজনের তাগিদে। সে জন্যে এ ফটকে বিশেষ সান্ত্রীপাহারারও ব্যবস্থা নেই।

প্রথমটা, দূর থেকে পথ সত্যিই জনহীন বলে মনেও হয়েছিল। তবু, আইনত কারুর না কারুর এদিকে থাকা উচিত, এমনি প্রাসাদের বাগানেও তো সারারাত পাহারার ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়—এই সব ভেবেই একটু সন্তর্পণে, হুঁশিয়ার হয়েই এগোল ওরা।

আর দেখা গেল ওদের আশঙ্কা বা অনুমান একেবারে অমূলকও নয়। মহামান্য পেশোয়ার যে শক্তি তাদের মাথার উপর মহৎভয়ের মতো বিরাজ করছে তার দৃষ্টি ও শ্রুতি, সদা জাগ্রত, সদা সতর্ক। সেই আপাত জনহীন ফটকের পাশের রাস্তাটা পেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময় পিছনের পথে কার পদশব্দ উঠল, কণ্ঠস্বরও বেজে উঠল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—সম্ভবত কোন সান্ত্রীরই—'কে যায় এত ভোরে ?'

রঘুজীর বুকের মধ্যে কামানের গোলা পড়ার শব্দে আছড়ে পড়ল যেন সেই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটা, মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে উঠল ওর মুখ ; বোধ করি বা দ্রুত হেঁটে কিম্বা ছুটেই পালিয়ে যেত সে কিন্তু বুদ্ধিমতী মস্তানী নিমেষে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নিয়ে পা দিয়ে সজোরে রঘুজীর পায়ে একটা চাপ দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

তার সুফলও ফলল। যে সান্ত্রীটি আসছিল তার বিশেষ কোন সংশয়ের হেতু ছিল না, এমনি অলস কৌতূহলেই করেছিল প্রশ্নটা— নিহাৎই নিয়ম মোতাবেক। এখন এদের সহজভাবে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে আরও নিশ্চিন্ত হ'ল সে, যেটুকু বা সন্দেহ হ'তে পারত সেটুকুও হবার কারণ রইল না। সে বেশ ধীরে সুস্থে কাছে এসে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ ভাই—এত ভোরে? এখানকার লোক, না মজুরী খাটতে এসেছিলে বাইরে থেকে?' তারপর সেই আব্ছা আলোতে রঘুজীর মুখখানা ভাল ক'রে ঠাউরে দেখে বলল, 'তোমার মুখটা তো চেনাচেনা মনে হচ্ছে জোয়ান ভাই, তুমি নিশ্চয় এখানকার লোক?'

এতক্ষণে রঘুজীও সামলে নিয়েছে নিজেকে, কী বিষম ভুল করতে যাচ্ছিল একটা তাও বুঝতে পেরেছে, আর সেজন্যে আরও এক দফা মস্তানী সম্বন্ধে সবিস্ময় শ্রদ্ধা অনুভব করছে মনে মনে—সে এবার বেশ দরাজকণ্ঠে হেসে উঠে বলল, 'বিলক্ষণ! সেই ছেলেবেলা থেকে বাঈআম্মাসাহেবার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি—এই পরিবারের সেবায় জীবন কাটল—এ মুখ যদি চেনা মনে না হয় তাহলে বুঝতে হবে তুমিই নতুন এসেছ এখানে!'

সান্ত্রী একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'না না—চিনতে পারব না কেন! চিনতে পেরেছি ঠিকই—তেমন আলো হয় নি এখনও বলেই—ঠাওর হচ্ছিল না। তা এ ছোকরাকে নিয়ে যাচ্ছ কোথায় হন্তদন্ত হয়ে এই সাত সকালে—?'

'আর বলো কেন, পেশোয়া না থাকলেই আমাদের এখানকার বাবুদের আরাম করার ধুম পড়ে যায়—বছর পোরে তখন আঠারো মাসে। বুড়ো গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর—বুঝলে না। এই ছোকরা কাল মজুরী খাটতে এসেছিল, সন্ধ্যাবেলা পয়সা নিয়ে নিজের ঘরে যাবে তা খাজাঞ্চীখানাতে পুরো একটি প্রহর বসে থাকবার পর যখন পয়সা হাতে পেয়েছে তখন আর প্রাসাদ থেকে বেরোবে কেমন ক'রে? অন্তত তার একটি ঘণ্টা আগে ফটক বন্ধ

হয়ে গেছে এখানের। না খেয়ে বসে বসে কাঁদছিল, দেখে আমার ঘরে বসিয়ে রেখেছিলুম ; খেতেও দিয়েছি কিছু তা সারারাত ঘুমোয় নি, ভয়ে কাঁটা। ভোরে বললুম চলে যা—বলে আমার ডর্ লাগছে, যখন এতই দয়া করলে আমাকে ফটকটা পার করে দাও !'

'নাও ঠেলা ! এমন করলে কে আর এখানে কাজ করতে আসবে বলো দিকি ! এই তো হয়েছে এখন এখানকার হালচাল। আমরাই সময় মতো মাইনে পাই না—তা এরা।···তা ও ফটকে না গিয়ে এদিকে এলো কেন—?'

'আমিই নিয়ে এলুম, এই দিকে বিঠ্ঠল পুরে বাড়ি ওর—এই ফটক দিয়ে বেরিয়ে একটু উত্তরে গিয়ে সোজা পূবদিকের রাস্তা ধরলে আধ ঘণ্টার পথও নয়। তাই দেখিয়ে দিচ্ছি !···আর জানো তো বড় ফটকের বড় পাহারাদারদের কাণ্ড, কোন এক ছুতোয় বেচরাকে আটকে রেখে হয়ত যা পেয়েছে সব কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে !'

'তা যা বলেছ ! সব পিশাচ এক একটি ! আচ্ছা যাও, তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও। তুমি দেখছি বেশ সাচ্চা লোক, তোমার উন্নতি হবে, ভগবান বিনায়ক কখনও তোমার অমঙ্গল করবেন না।'

এই বলে, পিঠ চাপড়ে শুভেচ্ছা জানায় সে রঘুজীকে।

বলা বাহুল্য রঘুজীও আর দ্বিরুক্তি করে না, বরং যেন সান্ত্রীর উপদেশ মতোই হন হন ক'রে এগিয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ে। ঠাণ্ডা ভোরাই হাওয়াতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছিল ভেতরে ভেতরে, এখন বাইরে বেরিয়ে এসে জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

এবার বড় রাস্তায় পড়ে কিছুটা দূরে একটা বাগানে গিয়ে ঢুকল দুজনে। একটা মঠের পিছন দিকের বাগান। মঠটায় সাধু-সাধকের সংখ্যা কম, সেবকেরও—সেই অনুপাতে। বাগানটা জনহীনই পড়ে থাকে। এইখানেই দুটি ঘোড়া বাঁধা ছিল ওদের। সময় অল্প, ক্রমশ বেশ ফরসা হ'য়ে উঠছে চারদিক রঘুজী আর কালক্ষেপ করল

না। ঘোড়া দুটো খুলে তাদের বাইরে নিয়ে এল, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে নিজের কাঁধ পেতে দিয়ে বলল, 'উঠুন দিদি।'

তা অবশ্য উঠল না মস্তানী বরং সস্নেহে হাত ধরে ওকে তুলে, ওর কাঁধে একটা হাত রেখে পুরুষের মতোই সহজে ঘোড়ায় চেপে বসল।…

আঃ মুক্তি, মুক্তি! আর কারও পরোয়া করে না সে, আর কারও সাধ্য নেই যে তাকে ধরে। এক পেশোয়া ছাড়া অশ্বারোহণে তাকে খাটো করতে পারে এমন কেউ নেই। এ বিষয়ে সে পেশোয়ার যোগ্য শিষ্যা।…

পাটাসে যাবার অপেক্ষাকৃত জনহীন রাজপথে পড়ে থমকে দাঁড়াল দুজনে। 'এবার তাহলে যাই দিদি?' ঈষৎ করুণ, বিষণ্ণ শোনাল রঘুজীর কণ্ঠস্বর।

'যাবে, কিন্তু শান্‌ওয়ার ওয়াড়ায় নয়। সোজা যেতে হবে এখন তোমাকে সাতারায়। মহামান্য ছত্রপতির কাছে।'

'সাতারায়! সে কি!…এখানে—?'

'এখানে যাওয়া মানে নিশ্চিত কারাবাস, মৃত্যু? এই তো? এখানে যাওয়ার এত তাড়া কি? ছত্রপতির নামে একটা খৎ আছে, খুব জরুরী খৎ—এটা পেঁাছে দিতেই হবে আজ, অন্তত কাল সকালে নিশ্চিত। এ কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না, কাউকে দিয়ে বিশ্বাস হবে না। এর ওপর রাজ্যের মঙ্গল নির্ভর করছে। যাও ভাই লক্ষ্মীটি—'

'তারপর?'

'তারপর কী করতে হবে ছত্রপতিই সে নির্দেশ দেবেন। তুমি রাজকার্যে ব্যস্ত থাকবে যতক্ষণ, বাঈ-আম্মাসাহেবার ক্রোধ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

'কিন্তু আমার পরিবারের বাকী সকলকে পায়ে মাড়িয়ে শেষ করতে তাঁর এক দণ্ডের বেশী লাগবে না।'

'তাদের কি তুমিই বাঁচাতে পারবে? সে ভার বরং আমার ওপর ছেড়ে দাও, পেশোয়ার কাছে পৌঁছতে যেটুকু দেরি—তারপর আর কোন অসুবিধা হবে না।'

মস্তানা তার বুকের মধ্য থেকে বক্ষচ্ছেদে ঈষৎ আর্দ্র সেই খৎখানা বার ক'রে রঘুজার হাতে দিল—রঘুজীরই সংগ্রহ করা সেই কাগজ—আর দিল হাত থেকে খুলে পেশোয়ার শীল-করা আংটি। বলল, 'এই আংটি তোমার কাছে রাখ, যদি পথে কোন বাধা আসে কি কেউ আটকাতে চায় তো এই আংটি দেখিও, ব'লো পেশোয়ার কাছ থেকে জরুরী কাজে যাচ্ছ ছত্রপতির কাছে—সবাই ছেড়ে দেবে। সাতারার দুর্গ-ফটকেও এই আংটি দেখিও, যখনই যাও না কেন—সোজা ছত্রপতির কাছে নিয়ে যাবে তোমাকে।' এই বলে—দুহাতে রঘুজীর দুই গাল ধরে মুখখানা কাছে এনে অভিভূত আচ্ছন্ন সেই তরুণের ললাটে সস্নেহে একটি চুম্বন ক'রে পাটাসের পথ ধরল মস্তানী। শিক্ষিত আরোহীর পায়ের চাপ বুঝতে ঘোড়ার বিলম্ব হয় না। দেখতে দেখতে সে ঘোড়া দূর পার্বত্য পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ সময় লাগল রঘুজীর হারানো চৈতন্য গুছিয়ে ফিরিয়ে আনতে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে-ও সাতারার পথ ধরল।

*

* *

মস্তানী কখনও কথার খেলাপ করে না, অসম্ভব বলেও কোন কথা নেই তার অভিধানে। তার পক্ষে সবই সম্ভব। এই আশ্বাসেই বুক বেঁধে ছিলেন বাজীরাও, একটি একটি ক'রে প্রহর দণ্ড মুহূর্ত গুনছিলেন। কিন্তু বেশ কয়েকদিন কেটে যাবার পরও যখন সে এল না, এমন কি কোন খবরও পেলেন না, তখন হঠাৎ যেন বড় অসহায়, বড় দুর্বল বোধ করলেন নিজেকে। তবে সে বেশীক্ষণের জন্য নয়, বীর্যবান পুরুষ, দিগ্বিজয়ী বীরের হতাশা বা ক্ষোভ ক্রোধে

পরিণত হ'তে দেরি হয় না। পেশোয়াও অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বালাজী রাও ফিরে গেছেন, তাঁকে সামলাবারও কেউ নেই আর, দেখতে দেখতে সে ক্রোধ প্রচণ্ড দিক্‌দাহকারীরূপে জ্বলে উঠল। তিনি সসৈন্যে ফিরবেন পুনাতে, নিজের প্রাসাদ তাঁর, সৈন্য-সামন্ত সবই তাঁর বেতনভুক্‌। কিসের সঙ্কোচ তাঁর, কিসের ভয়? তাও যদি তারা কাশীবাঈ কি চিমনজীর কথায় বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়—তাঁর বাহুবল এখনও এত স্তিমিত হয় নি যে তাতেই বাধা পাবেন তিনি। প্রয়োজন হয় তো ঐ প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে তাঁর প্রিয়তমাকে বার ক'রে আনবেন। কামানের মুখে উড়িয়ে দেবেন শান্‌ওয়ার-ওয়াড়ার ঐ উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা মালিকদের।

সেই মতোই আদেশ দিয়েছেন সৈন্যসজ্জার, নিজের তাঁবুতে এসে নিজেও প্রস্তুত হচ্ছেন আর আপনমনে অস্ফুট-কণ্ঠে স্মরণ করছেন প্রিয়াকে—'মস্তি, মস্তি, মস্তিবাঈ—কেন এলে না, কেন এলে না তুমি! আমি যে আর পারছি না।'

ঠিক সেই সময়েই এসে ঢুকল মস্তানী, 'এই যে এসেছি আমি, মালিক্‌, আপনার দাসী আপনার সেবায় উপস্থিত!'

বাজীরাও অন্ধের মতো, উন্মত্তের মতো বুকে চেপে ধরলেন তাঁর এই যথার্থ অর্ধাঙ্গিনীকে।

॥ ১৪ ॥

খবরটা রাধাবাঈয়ের কাছে পৌঁছতে একটু বিলম্বই হয়েছিল। সখারাম স্নান পূজা ও প্রাতরাশ সেরে এসে রঘুজীকে দেখতে না পেয়ে একটু বিস্মিত হয়েছিল কিন্তু উদ্বিগ্ন বোধ করে নি। জানলা ভেজানো—তা ও তো আজকাল হামেশাই থাকে। তালা ঠিক আছে যখন তখন আর ভয় কি। তালাগুলো একবার ক'রে টেনে দেখেছিল তবু, সন্দেহ জাগবার মতো কিছু চোখে পড়ে নি।

জমাদার ঝাড়ুদার ও পাচকের দল নিয়ে খোদ রাধাবাঈ-এর এসে পৌঁছতেও একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ক'দিন কোন গোলমাল না হওয়ায় ওঁর আস্থার ভাবটা একটু বেড়েছিল। তিনি একেবারে তাঁর প্রাতঃকৃত্য সেরে, প্রাথমিক উপাসনার পালা চুকিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং পাখী খাঁচা-ছাড়া হবার তথ্যটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করলেন যখন, তখন বেলা প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

মাথায় আগুন জ্বলে উঠল রাধাবাঈ-এর। এমন উষ্মা—এমন ভয়ঙ্কর ক্রোধ ও জীঘাংসা জীবনে কোনদিন অনুভব করেন নি তিনি। এমন অপমানও না। মনে হ'ল এখনই, এই মুহূর্তে সমস্ত প্রাসাদটায় আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারেন সবাইকে, সেই সঙ্গে নিজেও মরেন। ছেলের সাধের প্রাসাদ নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারলে এ জ্বালার কতকটা শান্তি হয় বটে।

রাধাবাঈ যখন নিশ্চিত ক'রে জানলেন—তখন প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তারপর আস্তাজীকে ডেকে সব জানিয়ে লোকজন পরিজনকে অনুসন্ধানের কাজে লাগাতে আরও একঘণ্টা সময় কেটে গেল। কারণ তারা, সাধারণ রক্ষী ও সৈনিকেরা, ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তিন তিনটে মজবুত তালা বন্ধ, তার চাবি এক মুহূর্তের জন্যও রাধাবাঈয়ের কাছ-ছাড়া হয় নি—এর মধ্য থেকে যে উড়ে যেতে পারে, সে একটু 'অন্য জগতে'র মানুষ নিশ্চয়ই। মায়াবিনী জাদুকরীরও বেশী। তার বিরুদ্ধে 'অন্য দেবতা'র রোষ উদ্রিক্ত করা কি ঠিক?

সুতরাং বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল, ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে উত্তেজিত ও সক্রিয় ক'রে তুলতে। এর সঙ্গে রঘুজীর যোগাযোগ আছে সেটাও ঠিক ধরতে পারেন নি ওঁরা প্রথমটায়। সখারাম অতটা বলে নি, কারণ তার মাথাতেও যায় নি কথাটা। জেরা ক'রে যখন জানলেন আস্তাজী যে সখারাম সকালে এসে রঘুজীকে দেখতে পায় নি—তখন আগে তার খোঁজ করলেন। সারা প্রাসাদে খুঁজে

দেখতে আরও তিন-চার দণ্ড সময় লাগল। অর্থাৎ এর মধ্যে রঘুজীর হাত আছে বুঝতে বুঝতে দ্বিতীয় প্রহরও কেটে গেল।

রাধাবাঈ-এর চোখ-মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল, এখন ভয়ঙ্করতর হয়ে উঠল। একুশ বছরের ঐ একফোঁটা ছেলেটা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা আনুগত্য সব ভুলে ঐ কসবীটার মোহে এমন কাণ্ড ক'রে বসল! তাঁর প্রতিপত্তি এত পল্‌কা! ছেলেটা দশ বছর বয়স থেকে তাঁর কাছে আছে যে। আগে ফাই-ফরমাশ খাটত, তিনিই যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে রক্ষীর কাজ দিয়েছেন। এত স্নেহের একবিন্দু মূল্য দিল না! ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে তিনি তখনই সখারামকে কয়েদ করার হুকুম দিলেন। সে বেচারী লজ্জাতেই আধমরা হয়ে ছিল—যেতে পারলে তখন বেঁচে যায় যেন। কিন্তু যে কিছুই জানে না তাকে নির্যাতন ক'রে বধ করা যায়, খবরটা বেরোবে কী ক'রে?

খবরটা পাওয়া গেল লোহারের কাছ থেকে। সপরিবারে তাকে বন্দী করার আদেশ দিলেন রাধাবাঈ। খবর না দেওয়া পর্যন্ত লোহা পুড়িয়ে হাত-পায়ে ছ্যাঁকা দেবার আদেশ দিলেন। 'অন্য দেবতা'র ভয়ে ভোলবার মানুষ তিনি নন। এ তালা না ভেঙে খুলতে হ'লে নকল চাবি চাই। আর সে চাবি তৈরি করতে পারে এত নিখুঁত ভাবে (তালার ওপর একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি) যে তালা তৈরি করেছে সে-ই। এসব বিষয়ে কোন সংশয় বা কুসংস্কার ছিল না রাধাবাঈ-এর, পালানোর ব্যাপারের সঙ্গে রঘুজীর যোগাযোগ আছে নিশ্চিত ভাবে জানার সঙ্গে সঙ্গে লোহারের যোগাযোগ অনুমান করতে এতটুকু বিলম্ব হয় নি আর।

লোহার প্রথমটা কিছু বলে নি। স্বীকার করে নি আদপেই। কিন্তু দুই পা-ই পুড়তে সব বলে ফেলল। অর্থাৎ যতটা জানত ততটা। রঘুজী তাকে একটা সোনার হার দিয়ে এই চাবি করিয়ে নিয়েছে। তার বেশী সে কিছু জানে না, তাকে মেরে ফেললেও কিছু বলতে পারবে না আর।

রঘুজী অপরাধী চিহ্নিত হ'তে সংবাদ পাওয়াটা সহজ হয়ে এল। রঘুজীকে চেনে অনেকে। প্রিয়দর্শন, সচ্চরিত্র ও নতস্বভাব বলে অনেকেরই প্রিয় সে। সংবাদ পাওয়াও গেল। সন্ধ্যা নাগাত রক্ষীরা এক ঘেসেড়াকে ধরে নিয়ে এল, সে পথের ধারে নাবাল জমিতে বসে ঘাস সংগ্রহের চেষ্টা করছিল বলে তাকে কেউ দেখে নি কিন্তু সে দেখেছে। রঘুজী আর একটি বালক ঘোড়ায় চেপে সেই পর্যন্ত এসে দু'দিকে ভাগ হয়ে গেল সেইখান থেকেই। বালকটি কী একটা চিঠি দিল বার ক'রে রঘুজীর হাতে, আদরও করল খানিকটা—সেটা দেখে একটু বিস্মিতই হয়েছিল ঘেসেড়া তাই মনে আছে—সে রকম আদর বয়স্করাই বয়োকনিষ্ঠদের ক'রে থাকেন—তারপর দু'জনে দু'দিকের রাস্তা ধরল। রঘুজী সাতারার দিকে লক্ষ্য ক'রে ঘোড়া ছোটাল—তা ঘেসেড়া স্পষ্ট দেখেছে।

সঙ্গের বালকটি কে, তা বুঝতে কারুরই বাকী রইল না। আদর করার কথাটা শুনে মুখ অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠল আন্তাজীর—মা সামনে আছেন বলে। একই কারণে রাধাবাঈ এই প্রথম উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন কিছুটা। মস্তানী যে আসলে গণিকা, এবং রূপ-যৌবনের জাদুতেই ঐ সরল ছেলেটাকে ভুলিয়েছে, সেই তথ্যটা নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল বলে। অন্তত তাঁর বিশ্বাস, এ কথাটা সন্দেহের অতীতরূপে প্রমাণিত হয়ে গেল।

আরও একটি দোকানদারকে পাওয়া গেল রাত নটা নাগাদ। সাতারার পথে তার দোকান, সেখান থেকে কিছু খাবার খেয়েছিল রঘুজী, ঘোড়াকেও জল খাইয়ে নিয়েছিল। অর্থাৎ তার লক্ষ্যস্থল যে সাতারা, সেখানে ছত্রপতির কাছে আশ্রয় নিতে গিয়েছে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। এ পরামর্শও যে কার, তাও বুঝতে পারলেন রাধাবাঈ সঙ্গে সঙ্গেই।

তিনি এক মুহূর্তও দ্বিধা করলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে চিমনজীকে বললেন, 'আন্তা, তোমাকে এখনই সাতারা রওনা হ'তে হবে। ভয়

নেই, তোমাকে অপ্রিয় কিছু বলতে হবে না, আমি চিঠি দিচ্ছি সেই চিঠিতেই সব লেখা থাকবে। ঐ বেইমান ছেলেটার মৃত্যুদণ্ড চোখের সামনে না দেখা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। ওর রক্তপাত না হ'লে আমার মাথার এ আগুন নিভবে না।'

আন্তাজী বিস্মিত হয়ে তাকালেন মা-র দিকে। ঈষৎ বিব্রতই হয়ে পড়লেন। বুঝিয়ে বলতে গেলেন, 'কিন্তু আসল আসামীর দিকে মন দেওয়াই আগে দরকার ছিল না কি? ওটা তো একটা সামান্য কীট, পদদলিত করার ওয়াস্তা মাত্র।'

'আসল আসামীও রইল, আমিও রইলুম। এর হেস্ত-নেস্ত একটা হবেই। সে তো মাথাব্যথা, ভেতরের জিনিস। কিন্তু পায়ের কীট যখন মাথায় উঠে কামড়ায় সে বড় অসহ্য, তাকে পায়ে না দলা পর্যন্ত আমি সুস্থির হ'তে পারছি না। তুমি এখনই আয়োজন করো, যাতে শেষ রাত্রে রওনা হ'তে পারো। তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি অন্ন গ্রহণ করব না—এই জেনে যা ভাল বিবেচনা করো তাই করবে।'

এই বলে, বাদানুবাদের আর কোন অবসর না দিয়ে পূজার ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন রাধাবাঈ।

এ কী হল আজ, কেউই তাঁর আনুগত্য মানতে চায় না! এক স্বামী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব শক্তি চলে গেল! স্নেহ বাৎসল্য —কোন কিছুরই দাম নেই এ পৃথিবীতে!

॥ ১৫ ॥

ছত্রপতি চিমনজীর সঙ্গে দেখা করলেন না। বলে পাঠালেন যে তাঁর শরীর ভাল নেই, এখন আরও কিছুক্ষণ একটু আরাম করবেন। চিমনজী তাঁর পুত্রের সমান, আশা করি এতে কোন অমর্যাদা হ'ল ভাববে না সে। তার যা বক্তব্য, তাঁর একান্তসচিব গণেশজী পন্থকে বলতে পারে, অথবা কোন খত থাকলে পাঠিয়ে দিতে পারে।

অগত্যা রাধাবাঈ-এর চিঠিটা পাঠিয়ে দিতে হ'ল। তার উত্তর এল ছত্রপতির নিজের স্বাক্ষরিত আদেশপত্রের আকারে। তাতে লেখা ছিল, 'এ রাজ্যে পেশোয়া বা প্রতিনিধি বা সেনাপতি যাঁরা আছেন—তাঁদের অধীনস্থ সমস্ত সৈনিক, রক্ষী, ভৃত্য বা কর্মচারী—প্রত্যেকেই আসলে ছত্রপতির সেবক। রঘুজীকেও তিনি তাই মনে করেন। তিনিই তাকে এখানে এনেছেন এবং জরুরী কাজের ভার দিয়ে অন্যত্র পাঠিয়েছেন। সুতরাং তাকে যে এখন পাওয়া যাবে না শুধু তাই নয়, তার কোন শত্রুতাসাধন বা তার কাজে বাধা দেওয়া রাজদ্রোহ বলে গণ্য হবে। আর এই সঙ্গে আরও একটি আদেশ দিচ্ছেন ছত্রপতি, শান্‌ওয়ার ওয়াড়ার যে আপ্পাজী লোহার আছে, তাকে ছত্রপতির বিশেষ প্রয়োজন, অবিলম্বে যেন উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা ক'রে সপরিবারে তাকে এখানে পাঠানো হয় এবং তাদের রক্ষী হিসাবে রঘুজীর পিতৃব্য সখারামকেও। এর বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ছত্রপতি বরদাস্ত করবেন না। ভগবান বিনায়ক যেন চিমনজী আপ্পা, তাঁর পরিবার ও পেশোয়ার বংশের অপরাপর সকলকে রক্ষা করেন। তাদের ওপর ছত্রপতির আশীর্বাদ তো নিত্য-নিয়তই বর্ষিত হচ্ছে।' ইত্যাদি—

অগত্যা চিমনজীকে কালোমুখ করে ফিরতে হ'ল। মা-র মাথায় ঠিক কী আগুন জ্বলেছিল, তা এখন বুঝতে পারলেন তিনি। পায়ের কীট মাথায় উঠে দংশন করলে কি হয় তাও টের পেলেন। তবে তাঁর ক্রোধের প্রধান অংশ গিয়ে পড়ল অগ্রজের সেই চারুহাসিনী, নৃত্যগীত-পটীয়সী মোহিনী প্রিয়ার ওপরই। চিমনজীর দুই রগ দপদপ করতে লাগল অসহ ক্রোধে। দেহে জ্বর ছিলই—আজকাল নিত্যই থাকে—সে জ্বালা ছাপিয়েও আর একটা কী জ্বালা তাঁকে উন্মত্ত ক'রে তুলল প্রায়। মা যাই বলুন—সর্বাগ্রে তিনি পাটাসের দিকেই যাত্রা করবেন।

জবাব নিয়ে চিমনজী চলে গেলেন—কোনরূপ আতিথ্য স্বীকার

রই—এ সংবাদও যথাসময়ে এসে পৌঁছল ছত্রপতির কানে। তিনি হাসলেন একটু।

গণেশজীর কাছে আজ সকাল থেকেই ছত্রপতির আচরণ দুর্বোধ্য ঠেকছিল। এখন এ হাসির অর্থও ঠিক বুঝতে পারলেন না তিনি। কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠছে ক্রমশই। অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ ক'রে তিনি এক সময় প্রায় মরীয়া হয়েই বলে ফেললেন, 'কিন্তু কাজটা কি ঠিক হ'ল রাজাধিরাজ?'

'না, তা হ'ল না। কিন্তু আমারও উপায় ছিল না গণেশজী। বাধ্য হয়েই এই অশোভন আচরণ করতে হল। অন্যত্র বাগ্‌দত্ত ছিলুম আমি, প্রতিশ্রুতিতে বাঁধা। আর সে প্রতিশ্রুতি পালন খুব অরুচিকর বলেও মনে হয় নি আমার। সেই হয়েছে আরও মুশকিল।'

কী সে প্রতিশ্রুতি, কার কাছে—তা জিজ্ঞাসা করতে সাহসে কুলোল না গণেশজীর। হয়ত অনুমান করতে পারলেন, হয়ত পারলেন না। ছত্রপতিও কিছু বললেন না। অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। চিমনজী তাঁর স্নেহের পাত্র, তার কাছে তিনি উপকৃতও। রাধাবাঈ-এর এ চিঠি যদি আগে এসে পৌঁছত তো কি করতেন বলা যায় না। সম্ভবত ভাল ক'রে চিঠি না পড়েই রাধাবাঈ-এর অনুরোধ রক্ষা করতেন, রাধাবাঈ-এর ভাষায় 'ঘৃণিত অপরাধে অপরাধী' রঘুজীকে তখনই চিমনজীর হাতে দিতেন—কিন্তু তার আগে আর একটি চিঠি এসেই সব গোলমাল ক'রে দিয়েছে যে।

সে চিঠি এখনও তাঁর উপাধানের নিচে রয়েছে।

অতি সংক্ষিপ্ত চিঠি ঃ

'পিতা,

আপনি আমাকে কন্যা সম্বোধন করেছেন—সেই আশ্বাসেই আপনাকে পিতৃ সম্বোধন করলুম, অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন। রঘুজীকে পাঠালুম আপনার আশ্রয়ে—সে আমার জন্য তার জীবন, তার ভবিষ্যৎ, তার পরিবারের নিরাপত্তা সব বিপন্ন

করেছে, তাকে রক্ষা করলে আমাকেই রক্ষা করা হবে—এই ভেবে তাকে বাঁচাবেন। আপনি আমাকে যে ভরসা দিয়েছিলেন সেই ভরসার জোরেই এত দুঃসাহস আমার, জানি আমাকে দেওয়া ভিক্ষা ফিরিয়ে নেবেন না কিছুতেই। রঘুজীর মুখে সব বিবরণ শুনবেন। আমি আপনার অসুস্থ ভগ্নহৃদয় সেবক পেশোয়ার কাছে যাচ্ছি, যদি তাঁকে সুস্থ ক'রে তুলতে পারি তো সে আপনারই সেবা হবে। প্রণাম নেবেন। ইতি আপনার অভাগিনী কন্যা—মস্তানী।'

চিঠি পড়ে রঘুজীকে জেরা ক'রে সব জেনেছিলেন। তখনই একশো জন সৈনিক সঙ্গে দিয়ে, রঘুজীকে বিশেষ আদেশবলে সেনানীর পদ দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কোলাপুর।

শুধু তাই নয়, এরা দুজনেই যার পরিণাম ভেবে দেখে নি, তাঁর বিচক্ষণ রাজনীতিক ও শাসকের বুদ্ধি সেই লোহারের অবস্থাটাও কল্পনা করতে পেরেছিল, আর রঘুজীর পিতৃব্য সখারামের বিপদটা। সেই জন্যই লোহারকে সপরিবারে পাঠাবার আদেশ দিলেন সাতারায়। এ আদেশ পেঁাছবার পর আর তাদের কোন অনিষ্ট করতে কেউ সাহস করবে না। তখনও যদি বেঁচে থাকে সে বেচারী তো এ যাত্রা বেঁচেই যাবে।

তাঁর তী[illegible] বুদ্ধিমতী নবলব্ধা কন্যা মস্তিবাঈ-এর কানে যখন এ সংবাদটা [illegible]বে, তখন ছত্রপতির বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির প্রশংসায় কী পরিমাণ [illegible]ছিলু হয়ে উঠবে সেই আশ্চর্য সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো —[illegible]শে এসে ঘরে ঢুঁ[illegible] ক'রে ভারী খুশী হয়ে উঠলেন ছত্রপতি।

তোমাকে। যেন কিশে.

কিছুতেই শিবের ধ্যান ভ.

বালকের বেশে অবতীর্ণ হয়েছেন! ॥

হয়েছিল সেদিন তোমার মধ্যে!' ীর ও সর্বপ্রধান রাজনীতিক

'ছি ছি, কী বলছেন পেশোয়া। ছিলেন কিনা সেটা বিচার-

দেওয়াও মহাপাপ।...আর আমি নিজে[illegible]ন এমন অপবাদ [illegible]

অতি-বড় শত্রুও দিতে পারত না। তাঁর যে সবচেয়ে কাছের মানুষ, সে তো নয়ই। কিন্তু আজ, এই প্রথম, তাঁর প্রিয়তমা মস্তিবাঈ-এর কিছু সন্দেহ দেখা দিল মনে, মনে হ'ল কথাটা অত নিঃসংশয়ে আর বলা যায় না।

সে যখন ব্যাকুল হয়ে এসে পেশোয়ার এই স্কন্ধাবার কক্ষে প্রবেশ করেছিল, তখন ভেবেছিল আর কিছু না হোক—বিমর্ষ না হোক, পেশোয়াকে কিছুটা চিন্তিত দেখবে। কারণ, আজকের এই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয়। এমন অঘটন লোকের সুদূর কল্পনারও অতীত। যিনি যত বড় ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাই হোন—এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকা কঠিন। উত্তেজিত বা বিচলিত না করুক—দোলা দেবে যে-কোন লোককেই। পেশোয়াও নিশ্চয় প্রবল একটা নাড়া খেয়েছেন মনে মনে। শুধু শৌর্য-বীর্যের জোরে এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যায় না—সাধারণ মানুষের সামান্য বুদ্ধির জোরেও না। অসাধারণ মানুষেরও অসামান্য প্রতিভার প্রয়োজন হয় এমন বিপদকে লঙ্ঘন করতে। কারণ যে বিপদ শুধুমাত্র ভয়ের কারণ নয়—লজ্জারও কারণ, যে বিপদ বাইরের থেকে মনে বেশী—সে বিপদ বড় কঠিন। পেশোয়া যা আর যত বড়ই হোন না কেন, তিনিও মানুষ, তাই আর কিছু না হো[illegible] তিনি স্তব্ধ চিন্তাকুল হয়ে বসে থাকবেন অন্তত—মস্তিবাঈ মনে [illegible], ঠিক এমন একটা কাব্যময় অবস্থায় দেখবে ভাবে নি।

সে ছুটে এসে ঘরে ঢুকেছিল, এখন পেশোয়া[illegible] [illegible]খ
স্তব্ধ হয়ে গেল। বাজীরাও তখন নিবিষ্ট[illegible]
পাখীর সঙ্গে খেলা করছেন। ছোট্ট পা[illegible]
করেছেন—সেই আশ্বাসেই
ঐটুকু দেহেই মহত্তম শিল্পস্রষ্টা [illegible]
[illegible]লুম, অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা
দেখিয়েছেন, বোধ করি [illegible]
আপনার আশ্রয়ে—সে আমার জন্য
পাখীকে। মাথায় গলা[illegible]
তার পরিবারের নিরাপত্তা সব বিপন্ন
[illegible]শ। এ পাখীটি

সঙ্গে খেলা করেন তিনি মধ্যে মধ্যে—তাও কিছু অজানা নয়,' সে এই কি সে খেলার সময়? অথচ পেশোয়া তো তা-ই করছেন। এক হাতে তিনি খাঁচার সামনে ধরেছেন একটি অর্ধ-প্রস্ফুটিত লাল গোলাপ আর এক হাতে একটি সুপক্ক পেয়ারা। পাখীটির লক্ষ্য পেয়ারার দিকে। পেয়ারাটা একটু একটু ক'রে যেমন কাছে নিয়ে যাচ্ছেন পেশোয়া, পাখীটিও উৎসুক হয়ে ঠোকর মারছে আর সেই অত্যল্প সময়েই তিনি পেয়ারাটা সরিয়ে নিয়ে সামনে ধরছেন গোলাপটা, তার ফলে ক্ষোভে হতাশায় অস্থির হয়ে পাখীটা খাঁচার লোহাগুলোয় ঠোকর মারছে আর রাগে কী এক ধরনের অব্যক্ত আওয়াজ করছে।

এদিকে ফেরেন নি পেশোয়া কিন্তু তাঁর প্রিয়তমার আগমন টের পেয়েছেন। তিনি বলে উঠলেন, 'দেখেছ খুশি, দেখতে অত সুন্দর হ'লে কি হবে—পাখীটার রুচি-বোধ কিছুমাত্র নেই। অমন সুন্দর গোলাপটাতে ভ্রূক্ষেপ নেই—ওর যত কিছু ঝোঁক ঐ পাকা পেয়ারাটাতে—তবে আর তির্যগ-যোনি বলেছে কেন! ওদের নজরটাই বাঁকা আর ছোট!'

তারপর ফুল আর পেয়ারা দুটোই তাঁবুর বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মস্তানীর দিকে ফিরে বসলেন, 'কিন্তু আমার আছে মস্তি, রুচি আর সৌন্দর্যবোধ দুই-ই আছে, আমি বসে বসে তোমার কথাই চিন্তা করছিলুম!...ভাবছিলুম কি যেন, সেই যে তুমি সেদিন পুরুষ-বেশে এসে ঘরে ঢুকলে আমার—অত সুন্দর আর কোনদিন লাগে নি তোমাকে। যেন কিশোর কন্দর্প। মনে হচ্ছিল যেন, সাক্ষাৎ গৌরী কিছুতেই শিবের ধ্যান ভাঙ্গাতে না পেরে অবশেষে এই কিশোর বালকের বেশে অবতীর্ণ হয়েছেন! যেন কন্দর্প আর উমার মহামিলন হয়েছিল সেদিন তোমার মধ্যে!'

'ছি ছি, কী বলছেন পেশোয়া। এমন উপমা কৌতুকচ্ছলে দেওয়াও মহাপাপ।...আর আমি নিজের রূপের ব্যাখ্যানা শুনতেও

আসি নি আপনার কাছে! না না—এমন বিপদের দিনে এমন হাসবেন না, সবটা তামাশা ক'রে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি যে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না—এই উদ্বেগ আপনি এত সহজে বইছেন কি ক'রে মালিক!'

'উদ্বেগের কারণ তো এই প্রথম ঘটল মস্তি', বাজীরাও এবার ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলেন, 'তুমি বিচলিত হয়েছ, তুমি তোমার স্বভাবজ কৌতুকবোধ এবং স্থৈর্য হারিয়েছ—একমাত্র সেইটেই আমার কাছে দুশ্চিন্তার কারণ বোধ হচ্ছে এই মুহূর্তে। আজ তোমার হ'ল কি, তুমি কি অসুস্থ হয়েছ?'

'তার আগে বলুন, যুদ্ধ-সজ্জা হচ্ছে, সেনানিবাসে সাজ সাজ রব উঠেছে কেন, কী এমন বিপদাশঙ্কা করছেন?'

'শত্রু যখন সসৈন্যে সুসজ্জিত অবস্থায় সামনে আক্রমণোদ্যত হয়ে এসে দাঁড়ায়—তখন নিশ্চিন্ত হয়ে কালহরণ করে মূর্খ বা হতভাগ্য। এর কোনটাই বলতে আমি প্রস্তুত নই মস্তি!'

বেশ ধীর শান্তস্বরেই বলেন পেশোয়া।

'শত্রু! কী বলছেন প্রভু, সত্যিই কি আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল! আপনার মা, স্ত্রী—আপনার পুত্র, আপনার ভাই—এদের বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধ-যাত্রা করবেন? এদের আপনি আক্রমণ করবেন?'

'কে বলেছে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করব, কে বলেছে ওদের আক্রমণ করব! ওরা যদি যুদ্ধ করে তো তার প্রত্যুত্তর দেব, যদি আক্রমণ করে তো আত্মরক্ষা করব। প্রস্তুত থাকা আর যুদ্ধ করা এক জিনিস নয়।'

'কিন্তু আপনার মায়ের বিরুদ্ধে, আপনার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে আপনার সৈন্যরা?'

'প্রয়োজন হয় তো করতে হবে বৈকি! তাঁরা যদি গুলি ছোঁড়েন তো সেগুলো ঠিক স্নেহের পুষ্পবৃষ্টি বলে মনে করার কোন কারণ

নেই—তাতেও আমার লোক মরবে, আর তা যদি মরে তো ওরা সে মৃত্যুর জবাব দেবে না—এটাই বা কি ক'রে সম্ভব!'

'ছি ছি, এসব কী বলছেন পেশোয়া, আমার জন্যে—তুচ্ছ একটা বিধর্মী মেয়ের জন্যে মার সঙ্গে লড়াই করবেন! লোকে বলবে কি, আমি মুখ দেখাব কি ক'রে এর পর জনসমাজে!'

'তুচ্ছ বিধর্মী মেয়ে কী বলছ মস্তি! তোমার ধর্ম আগে যাই থাক, তোমার বাবা আমার হাতে তোমাকে সম্প্রদান করেছেন, দেবতা সাক্ষী রেখে এক পবিত্র গোধূলি লগ্নে আমাদের শুভ-দৃষ্টি হয়েছে, তোমাকে আমি সেইদিন থেকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছি। তুমিও তো বলো যে আমাকে স্বামীরূপেই ছাখো তুমি। তা যদি হয় তো তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী, তোমার ধর্ম আর আমার ধর্ম পৃথক হ'তে পারে না।'

'কিন্তু লোকচক্ষে আমি কি ভেবে দেখুন।'

'লোক-লজ্জার ভয় করলে, অপরের বিবেচনার কথা বিবেচনা করলে আজ তোমার মরদ বাজীরাও পেশোয়া বাজীরাও হ'তে পারত না। আমি যা ঠিক বলে মনে করি তা অপরের কথাতে বেঠিক ভাবি না কখনও—সে তো তুমি জানোই মস্তিবাঈ!'

তারপরই—ওকে আর কোন প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়ে—সহসা হাত বাড়িয়ে মস্তানীর একটা হাত ধরে সবলে নিজের দিকে আকর্ষণ ক'রে টেনে আনলেন তাকে, সেই হাতেই তার কোমর জড়িয়ে তার বুকে মাথা রেখে ঊর্ধ্বমুখে প্রিয়ার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'ওসব কথা এখন থাক মস্তি, তুমি সেই পুরুষের পোশাকটা একবার পরবে?···তোমার সেই চেহারাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না!'

একটা হিম-হতাশা বোধ ক'রে মস্তানী।

অতঃপর কী হবে তা সে জানে। সমস্ত প্রতিজ্ঞা, সমস্ত শুভ

সঙ্কল্প ভেসে যাবে তার। তাকেও এই উন্মত্ত প্রণয়লীলায় মেতে উঠতে হবে, এই দুর্দান্ত মানুষটার মর্জি ও খেয়ালের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হবে। প্রতিকার বা প্রতিবিধান কিছুই হয়ে উঠবে না। এই বিরাট পুরুষের ভীমগতিকে প্রতিরোধ করতে পারবে না কিছুতেই—মহা সর্বনাশের পথেও বাধা দিতে পারবে না।

দুর্ধর্ষ বীর প্রচণ্ড ক্রোধী এই রাষ্ট্রাধিনায়ক রণে ও প্রেমে সমান অপরাজেয়। তাঁর প্রেমাবেগও অন্য সমস্ত চিত্তবৃত্তির মতোই প্রবল ও সর্বপ্লাবী। সব কিছুই বড় ওজনের তাঁর। যখন যুদ্ধ করেন তখনও যেমন কোন প্রতিপক্ষ দাঁড়াতে পারে না—যখন ভালবাসেন তখনও তাই—সব বাধা সব বিপদ সব বিবেচনা ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে ভালবাসা।

সব কিছুই বড় মাপের বলে—তাঁর ভালবাসা ধরে রাখতে পারেন নি সাধ্বী মহিষী কাশীবাঈ। চিত্তের এতবড় আধার নেই তাঁর। সাধারণ মাপের সাধারণ পতিপরায়ণা সতী মেয়ে তিনি, স্বামী-পুত্র, তাদের পদমর্যাদা, তাঁর নিজের নিত্যকরণীয়—এই সব সহস্র বিচার-বিবেচনা রীতি-পদ্ধতিতে তাঁর জীবন বাঁধা। এমন মেয়েকে নিয়ে পেশোয়ার মতো মানুষ ঘর করতে পারেন মাত্র, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। সে তাঁর জীবন-সঙ্গিনী, প্রণয়-সহচরী হ'তে পারে না। হয়ও নি। যতদিন না মস্তানীর সঙ্গে দেখা হয়েছে ততদিন শুধু সহ্য ক'রে গেছেন তাকে।···তারপর এসেছে সেই পরম লগ্ন ওদের জীবনে। দুটি মানুষ তাদের জীবনের যথার্থ সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে।

সেই কী এক শুভ বা মহাঅশুভ ক্ষণে দেখা হয়েছিল ওদের, চার চোখে মিলেছিল। বাজীরাও ওকে দেখেই বুঝেছিলেন যে, এ-ই তাঁর সেই সঙ্গিনী, যার জন্য হৃদয় তৃষ্ণার্ত হয়েছিল এতকাল। তাঁর সে প্রত্যাশা ও অনুমান ব্যর্থ হ'তে দেয় নি মস্তানী। তাদের আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয় নি—কিন্তু মস্তানী সেই দিন থেকে স্বামী বলে, মালিক বলেই জেনেছে বাজীরাওকে। সিংহের উপযুক্ত সিংহী হয়ে উঠেছে

সে, রণে বনে দুর্গমে—সর্বত্র ও সর্বদা সে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে, সাহস দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে সেবা দিয়ে জীবনকে পূর্ণ ক'রে তুলেছে পেশোয়ার। তার চেয়েও বেশী দিয়েছে হয়ত। নৃত্যে-গীতে, হাসিতে-কৌতুকে, লাস্যে-বিলাসচর্যায় সে তাঁর অবসরের শুষ্ক শূন্য কোষগুলি ভরে দিয়েছে অমৃতে। একাধারে স্ত্রী, মন্ত্রী, বন্ধু ও উপপত্নী গণিকার কাজ করেছে সে।

না, সে দিয়েছে অনেক—বরং পেশোয়াই দিতে পারেন নি। তিনিই কথা রাখতে পারেন নি। মস্তানী বরাবরই বুদ্ধিমতী মেয়ে, কিশোর বয়সেও আবেগের চেয়ে বিবেচনাই বড় ছিল তার কাছে। সম্পূর্ণ ধরা দেবার আগে সে পেশোয়াকে প্রতিশ্রুত ক'রে নিয়েছিল যে, তাদের মিলনে যে সন্তান হবে, যদি সন্তান হয় কিছু, সে সন্তান তাঁর অন্যান্য সন্তানের সমান মর্যাদার অধিকারী হবে।

এক দুর্বল বিচার-বিবেচনাহীন আবেগসর্বস্ব মুহূর্তে সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন পেশোয়া। চেষ্টাও করেছিলেন। মস্তানীর পুত্রসন্তান হ'তে তাকে ব্রাহ্মণ সন্তানের পরিচয়ে হিন্দুর মতো মানুষ করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন যজ্ঞোপবীত তুলে দিতে তার গলায়। এর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন তিনি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ঘুষ দিয়ে এই বিধান বার করিয়ে নিতে। কিন্তু পণ্ডিত কয়েকজন ছাড়াও হিন্দুদের যে বিশাল বিপুল একটি সমাজ আছে—সেই অদৃশ্য বিধানদাতা রাজী হয় নি কিছুতেই এ অনাচারে। তা ছাড়া সব ব্রাহ্মণ বা সব পণ্ডিতকে কিছু টাকায় কেনা যায় না—শীর্ষস্থানীয় যাঁরা তাঁদের অনেককেই পারেন নি রাজী করাতে। সুতরাং যার সূর্য রাও হবার কথা সে সামশের বাহাদুর নামেই বড় হয়ে উঠল—মার ধর্ম তথা গণিকা-পরিচয়কে চিরস্থায়ী ক'রে। বীরপুত্র সামশের বাহাদুর বাপের নাম রাখতে পারত, বংশের মুখ উজ্জ্বল করত। সে এই বালক বয়সেই রণনিপুণ যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। চিৎ-পবন ব্রাহ্মণদেরই দুর্ভাগ্য যে অমন একজনকে তাদের বলে পরিচয় দিতে পারল না।…

মস্তানী দুঃখ বোধ করেছে কিন্তু পেশোয়ার এই অসহায় ব্যর্থতা নিয়ে ধিক্কার দেয় নি কখনও। এটা সে বুঝেছিল যে, তাকে অদেয় বাজীরাও-এর কিছুই নেই, সাধ্য থাকলে অবশ্যই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেন তিনি।···

ওদের সেই প্রথম দেখা হওয়ার দিনটি থেকে কেটে গেছে বহুকাল। তবু আজও মস্তানীর প্রেমে অরুচি বোধ হয় নি পেশোয়ার, তার সাহচর্যে আসে নি ক্লান্তি। বরং প্রণয়ের নেশা ঘনীভূতই হয়েছে যেন, কামনার অগ্নি হয়েছে উগ্রতর, প্রচণ্ডতর। তৃষা বেড়েই গেছে। তার কারণ মস্তানীর নিত্য নূতন রূপ—বাইরের তত নয়, যত অন্তরের। সে চির-নূতন, সে চির-চমকপ্রদ। সে ফি-রোজা, আসমানের মতোই নিয়ত পরিবর্তনশীল রূপ তার। তাই সে আজও এই ভারতত্রাশ মহাবীরের হৃদয়েশ্বরী, পেশোয়া বাজীরাও-এর চিত্ত জগতে একেশ্বরী।

ঈর্ষা, অসূয়া! বিদ্বেষ?

হ্যাঁ, আঘাত করেছে বৈকি! নানা লোকে নানা সুযোগ খুঁজেছে এই একাধিপত্য ভাঙতে, এই প্রতিপত্তি নষ্ট করতে। নানা দুর্নাম তুলেছে তার, সত্য মিথ্যা নানা অপবাদে আকাশ বাতাস বিষাক্ত ক'রে তুলেছে বিপুল মহারাষ্ট্র রাজ্যের। সে অপপ্রচার সে কুৎসা স্বয়ং ছত্রপতির কানেও পৌঁছেছে, তুলে দিয়েছে লোকে। বিষাক্ত করতে চেয়েছে পেশোয়ার মন। উত্তেজিত করতে চেয়েছে প্রজা-সাধারণের ধারণাকে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। পেশোয়া বাজীরাও-এর গভীর প্রেম গভীরতর হয়েছে শুধু এই মেয়েটিকে ঘিরে। ছত্রপতি তাঁকে কন্যা সম্বোধন করেছেন। সমস্ত বিদ্বেষ ও বিরোধিতাকে উপেক্ষা ক'রে সংসার সরোবরের কালোজল কাটিয়ে লঘুপক্ষ মরালীর মতোই অনায়াসে বিহার ক'রে বেড়িয়েছে সে, এই পঙ্ক বা মালিন্য তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারে নি।

কিন্তু এবার বিপদ এসেছে অন্য রকম।

বাজীরাও-এর লৌহকঠিন শরীর ভেঙ্গেছে এবার, বীর তরুণ তেজোদৃপ্ত রূপবান পেশোয়া শীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে উঠেছেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। মধ্যে মধ্যে জ্বরও হচ্ছে। প্রস্তর-কঠিন শক্তিতেও ক্ষয় ধরেছে, যে ক্লান্তি শব্দটাই ছিল অপরিচিত তাঁর কাছে, সেই ক্লান্তিতেই যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

ভেবে দেখলে—এটা দুঃখের হ'তে পারে, কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই! এদের বংশেই নাকি ক্ষয়রোগ আছে। চিমনজী আপ্পা এই বয়সেই ক্ষয়কাশে আক্রান্ত হয়েছেন। স্বয়ং বালাজী বিশ্বনাথ রাও-এর অকালমৃত্যুর কারণও নাকি এই ক্ষয় রোগ। এ রোগ এদের বংশগত—এদের ভেতরে ভেতরে কুরে খায়, হঠাৎ অকালে বৃদ্ধ ক'রে দেয়। তা ছাড়া বাজীরাও-এর ওপর দিয়ে কম ঝড়ঝঞ্ঝা যায় নি। কুড়ি একুশ বছরের ছেলে তিনি, যখন এত বড় রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়ে। সেদিন তাঁকে সকলের মতের বিরুদ্ধে এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন ক'রে ছত্রপতি শাহু খুব বিবেচনা বা দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন নি, এই কথাই বলেছিল সকলে। কিন্তু তাদের আশঙ্কা ব্যর্থ ও ছত্রপতির আশাকে সার্থক ক'রে বাজীরাও এই উনিশ বছরকাল মধ্যে অসাধ্য-সাধনই করেছেন। উনি যখন গদীতে বসেন তখনও মারাঠা শক্তির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তার আসন তখনও বালুভিত্তিক। সেই শক্তিকে তিনি সুদূরবিস্তারী এবং দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করেছেন, রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছেন। দমন করেছেন তিনি মুঘল শক্তিকে, দমন করেছেন নিজামকে। বুন্দেলা রোহিলা জাঠ সবাই ত্রস্ত তাঁর ভয়ে। ইংরেজ পর্তুগীজ শক্তি থরথর কম্পমান। যেখানে তিনি যান নি, সেখানকার লোকও মারাঠা শক্তি সম্বন্ধে আজ সচেতন ও অবহিত। যে তাঁকে দেখে নি, সেও তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান। নাদির শা যে দিল্লীর দক্ষিণে পা দেন নি—পেশোয়া বাজীরাও-এর বীরখ্যাতি তার অন্যতম কারণ।

একটা মানুষের পক্ষে—সহায়-সম্বলহীন অভিজ্ঞতাহীন এক তরুণের পক্ষে—এই কীর্তিই যথেষ্ট। একটা মানুষের শরীর ভাঙবার পক্ষেও। লোহার শরীর হ'লে বোধ হয় আগেই ভাঙ্গত। মানুষের শরীরে সামর্থ্যের চেয়ে ইচ্ছাটা বড় কথা বলেই আজও দাঁড়িয়ে আছেন এই ব্রাহ্মণ। খেটেছেন যত খেয়েছেন সেই পরিমাণে কম। যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণ সৈনিকের খাদ্য তাদের সঙ্গে ভাগ ক'রে খেয়েছেন বরাবর। বিশ্রাম তো নেন নি বললেই হয়। যে কটি মুহূর্ত তাঁর মস্তানীর সাহচর্যে কাটে সেইটিই তাঁর বিশ্রাম, সেই আনন্দ থেকে সঞ্জীবনীরস গ্রহণ করে তাঁর প্রাণ-মক্ষিকা।

কিন্তু এইটেই বিশ্বাস করতে চাইছে না অনেকে। বিশেষ ক'রে পেশোয়ার বাড়ির লোক—তাঁর নিকট-আত্মীয়রা তো নয়ই। তাঁর মা, তাঁর স্ত্রী, তাঁর উপযুক্ত বীর যশস্বী ভাই আপ্তাজী বা চিমনজী—তাঁর কিশোর পুত্র বালাজীরাও, সকলে একদিকে এককাট্টা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস মস্তানীই তাঁর প্রাণরস শুষে খাচ্ছে, ডাকিনী কুহকিনীর মতো। আসলে সে সেই রূপকথার রাক্ষসী, দিনে মোহিনী সেজে ভুলিয়ে রাখে—রাত্রে নিদ্রিত বীরের বক্ষরক্ত পান করে। তা যদি নাও হয়—ওর বলিষ্ঠ যৌবনের কামনা-হুতাশনে অবিরাম ইন্ধন যোগানোর ফলেই বীর পেশোয়ার প্রাণশক্তি নিঃশেষিত। অর্থাৎ তথ্যে কিছু কিছু গোলমাল থাকলেও সত্যটা এক। এ ভগ্ন স্বাস্থ্যের, এ অকাল-বার্ধক্যের কারণ যে ঐ রমণী তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওকে না সরাতে পারলে—পেশোয়ার চোখের আড়াল করতে না পারলে—ওঁর জীবনের আর আশা নেই।

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাস করতেই তো চায় সকলে। সুতরাং বিশ্বাসও করল সবাই। ফলে যে বিরোধী শক্তিকে এককালে হাস্যে পরিহাসে ধিক্কারে উড়িয়ে দিয়েছিল দুজনে, সেই শক্তিই তার বিকট চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। ছেলে এসে এক রকম বন্দীই করল তার পিতাকে, বীর বিজয়ী পুত্রকে শাস্তি দিতে হাত

উঠল না দিগ্বিজয়ী বীর পিতার। বালাজী সরিয়ে নিয়ে এল পেশোয়াকে —তাঁর শানওয়ার ওয়াড়া প্রাসাদ থেকে, সেই অবসরে বিধবা মহিষী রাধাবাঈ, স্বর্গত পেশোয়ার স্ত্রী ও বর্তমান পেশোয়ার মা—নিজে হাতে বন্দী করলেন মস্তানীকে, দুর্ভেদ্য পাষাণ কারায় পুরে নিজে হাতে তালা দিয়ে চাবি রেখে দিলেন নিজের কাছে। ভরসা ক'রে আর কারও ওপর সে ভার ছাড়তে পারেন নি তিনি।

তবু, তাতেও কি আটকাতে পারলেন রাধাবাঈ? মায়াবিনী যেন ভেল্‌কী দেখিয়ে দিল সবাইকে। সেই নিরেট নিশ্ছিদ্র কঠিন লৌহদ্বার যেমন বন্ধ তেমনিই রইল, তার সুকঠিন প্রস্তর প্রাচীরের কোথাও কণামাত্র খসল না—শুধু মস্তানী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তার মধ্য থেকে—যেন কর্পূরের মতো উবে গেল।

না গিয়ে উপায়ও ছিল না অবশ্য তার। বাপ ছেলের ওপর সংহার-মূর্তিতে খড়্গ উদ্যত করেছে দেখে সে-ই বাধা দিয়েছিল। অনুরোধ করেছিল ছেলের কাছে হার মানতে, তার ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছা বিলিয়ে দিতে। ছেলে নিয়ে আসতে চেয়েছিল এই পাটাসের সৈন্য শিবিরে, বিনাপ্রতিবাদে তাই আসতে বলেছিল তাঁকে। আর সেই সময়ই অভয় দিয়েছিল সে বাজীরাওকে যে, যেমন ক'রে হোক, অচিরকাল মধ্যে সে এসে মিলিত হবে তার মালিক, তার রাজার সঙ্গে। কোন রাজ্যের কোন কারাগার তাকে ধরে রাখতে পারবে না, বাধা দিতে পারবে না কারও কোন অসূয়া।

এবং পারেও নি। যখন, মাত্র তিন চার দিনের অদর্শনেই উন্মত্ত অধীর হয়ে উঠেছিলেন বাজীরাও—ত্রিভুবনের সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে বিরোধ ক'রে প্রিয়তমাকে মুক্ত ক'রে আনবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন—ঠিক সেই চরম মুহূর্তে এসে হাজির হয়েছিল মস্তানী। কিন্তু সে আসাতে তত বিস্মিত হন নি, কারণ, এই মেয়েটি সম্বন্ধে বরাবরই তাঁর অসীম আশা অগাধ ভরসা ছিল। তিনি জানতেন যে সব কিছুই করতে পারে তাঁর মস্তী। অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই

তার অভিধানে। তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন অন্য কারণে। বিস্মিত আর মুগ্ধ। বহুদিন ধরে এই বিলাসিনী নারীর বহু রূপসজ্জা তিনি দেখে আসছেন! কিন্তু এমন বেশে যে তাকে এত সুন্দর দেখায় তা কোন-দিন ধারণা করতে পারেন নি। সাধারণ শ্রমজীবী মারাঠী বালকের পোশাক, অতি সামান্য পাগড়ি—তবু তাতেই কী অসামান্য সুন্দর দেখিয়েছিল, বাজীরাও-এর মনে হয়েছিল ওকে এই প্রথম দেখলেন। ……সেদিন সেই আবেগ-উন্মত্ত মুহূর্তে বাহুবদ্ধ বক্ষলগ্ন প্রিয়তমার কানে কানে গদ্‌গদ কণ্ঠে এই কথাই বলেছিলেন তাই, 'মস্তি, তুমি আমার নব-জীবনদায়িনী, তুমি আমার জীবনকাঠি, তোমাতেই আমার প্রাণ। তুমি কাছে না থাকলে আমার আর কোন অস্তিত্ব থাকে না, তখন দেহটাই শুধু থাকে, আত্মা মৃত জড় হয়ে যায়। তুমি যাই কেন না করো খুশিবাঈ এই কথাটা শুধু মনে রেখো, যদি বীরের মতো, শাসকের মতো না বাঁচতে পারি তো আমার কাছে বাঁচার কোন অর্থই নেই। আর তেমন ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারো তোমার এ সেবককে একমাত্র তুমিই। তুমি শুধু আমরণ আমার পাশে থেকো, তাহলেই আমার বাহুতে বল, হৃদয়ে শক্তি অটুট থাকবে। তুমি যেন আর কোনদিন, কোন কারণে আমাকে ছেড়ে যেও না, তাহ'লে আর আমি বাঁচব না।……বলো, যাবে না?'

সেদিন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মস্তানীকে সায় দিতে হয়েছিল, একরকম প্রতিজ্ঞাই করেছিল সে। তার এ তুচ্ছ প্রাণ বা দেহের মূল্যই বা কি—যদি মালিকের কাজে না আসে?……সে সেই কথাই সেদিন জানিয়েছিল তাঁকে। তার নিজের রক্ত দিয়ে—সে রক্ত ওঁর ধমনীতে সঞ্চালিত ক'রে দিয়েও যদি পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিতে পারে বাজীরাও-এর তো, সে এখনই শেষ বিন্দু পর্যন্ত হাসিমুখে উৎসর্গ করতে রাজী আছে। শুধু উনি বাঁচুন, উনি সুস্থ হোন, ওঁর বাহিনীর পদভরে সুদূর হিমাচল ও গান্ধার দেশ পর্যন্ত প্রকম্পিত হোক!

মস্তানীর আর কোন কাম্য নেই, জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই!……

॥ ১৭ ॥

কিন্তু হঠাৎ যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। এ সব প্রতিজ্ঞা, সব শুভ সঙ্কল্পই বুঝি অঘটনের বন্যায় ভেসে তলিয়ে যেতে বসল। এমন একটা অকল্পিতপূর্ব পরিস্থিতি এগিয়ে এল সামনে যার জন্য স্বপ্নেও কোন প্রস্তুতি ছিল না তার। ভাগ্যের সে আঘাত মস্তানীর প্রখর বুদ্ধি ও অবিচল আত্ম-বিশ্বাসকে পর্যন্ত টলিয়ে দিল। এই প্রথম নিজেকে অসহায় ও বিপন্ন বোধ করল সে।

রাধাবাঈ তাঁর এই উপ-পুত্রবধূটির কাছে সমস্ত লড়াইতে হেরে শেষ অবলম্বন হিসেবে আশ্রয় নিতে গিয়েছিলেন ছত্রপতির কাছে। সেখানেই চরম মার খেয়েছেন আবার। শুধু যে মস্তানীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সহায়তা করেন নি তিনি তাই নয়—প্রকাশ্যেই প্রশ্রয় দিয়েছেন তাকে। যে তরুণ যুবকটি তার পলায়নে সাহায্য করেছিল বা পলায়ন আদৌ সম্ভব করে ছিল—সে যুবকটিকে স্বয়ং ছত্রপতি তাঁর ছত্রছায়ায় গ্রহণ করেছেন, শুধু তাকে নয়—তার সমস্ত পরিবার, সাহায্যকারী এবং বান্ধবদেরও। মাতুশ্রী রাধাবাঈ ও পেশোয়ার বীরকেশরী ভ্রাতার রুদ্ররোষ সেই সুকঠিন রাজ-প্রশ্রয়ের প্রাচীরে প্রহৃত হয়ে ফিরে এসে আঘাত করেছে ওঁদেরই—ক্ষতির চেয়ে অপমান বেশী বেজেছে তাঁদের।

আর তাইতেই যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন তাঁরা। এমন কাজই করেছেন, যা এই হিন্দুস্থানে তো নয়ই—সারাদুনিয়ায় কেউ কখনও শুনেছে কিনা সন্দেহ। জননী রাধাবাঈ, মহিষী কাশীবাঈ, এবং চিমনজী আপ্পা—তাঁদের যেসব ব্যক্তিগত রক্ষী, প্রহরী ও দেহরক্ষী ছিল—যেসব অনুগত জনকে বুঝিয়ে ভরসা দিয়ে আনতে পেরেছেন

—তাদের এক বেশ বড় একটি বাহিনী নিয়ে এসে হানা দিয়েছেন পাটাসের উপকণ্ঠে—এখান থেকে অদূরে ছাউনি বা থানা ফেলেছেন। পুত্র বালাজী প্রকাশ্যে এসে এ বিদ্রোহে যোগ দেন নি—কিন্তু প্রায় দুশ' আড়াই শো লোক পাঠিয়েছেন তিনিও।

অবশ্য এদের সমস্ত মিলিত শক্তিও বাজীরাও-এর শক্তির কাছে নগণ্য, তুচ্ছ। এখানে আপাতত তাঁর যা সেনা আছে শুধুমাত্র তাঁদের মিলিত নিঃশ্বাসেই উড়ে যাবার কথা ওদের। কিন্তু শক্তি নয়, সামর্থ্য নয়—এখানে প্রশ্ন অন্যত্র। এ অসমযুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, বাজীরাও-এর পরাজয় অনিবার্য। মা স্ত্রী ও ভাই—এদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা মানেই তো ঘোরতর লজ্জা, বিপুল অবমাননা। আর তাই কি পারবেন তিনি, তাদের ওপর কামান-বন্দুক চালাবার হুকুম দিতে, দিলেও সৈনিকেরা কি সে হুকুম তামিল করবে? যদিই করে—অপরপক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর তারা এবং তাদের প্রভু মুখ দেখাবে কি ক'রে জনসমাজ-সংসারে?

না, না—তা হয় না, হ'তে পারে না। ছিঃ!

অথচ কী যে হয়, তাই-তো বুঝতে পারছে না মস্তানী কোনমতে। এই প্রথম তার উপস্থিত বুদ্ধি এবং সকল-অবস্থাতেই-অবিচল তীক্ষ্ণ সহজ কৌতুকবোধ যেন ত্যাগ করেছে তাকে। এই প্রথম আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব ঘটেছে তার, সে বিচলিত ও বিহ্বল হয়ে উঠেছে।

তাই মালিকের ঈপ্সিত বাহুবন্ধনে থেকেও স্বস্তি পেল না সে, তাঁর প্রজ্বলন্ত প্রণয় চুম্বনেও আবেশ আর সুখের সেই অভ্যস্ত মধুর ঘোরটি নামল না চোখে। কী একটা অস্বস্তিতে যেন ছটফট ক'রে উঠল সে, আস্তে আস্তে, ঈষৎ শ্রান্তির সুযোগে সে বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিল, তারপর যেন কোমল লতার মতো, সর্পিল সরীসৃপের মতোই পিছলে নেমে বাজীরাও-এর পায়ের কাছে বসে পড়ল। বাজীরাও বাধা দিলেন না, কোন অনুযোগও করলেন না, বিগত-আবেগ পরিশ্রান্তির তৃপ্তিতে চোখ বুজে এলিয়ে বসে রইলেন

নিজের দিওয়ানে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে একটা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন, তা তাঁর সেই নিমীলিত-নেত্র মুখের ওপরের সামান্য একটু স্নায়ু-কুঞ্চনেই টের পেল মস্তানী। সে এবার নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল তাঁর দুটি পা, ভারী জুতোসুদ্ধ শীর্ণ অথচ লৌহ-কঠিন সেই চরণযুগল নিজের নবনীত-কোমল বক্ষে চেপে ধরে খুব মৃদু অথচ গাঢ় স্বরে ডাকল, 'মালিক !'

'বলো মস্তি।'

'মালিক, অনেকদিন সেবা করলুম, কখনও কিছু চাই নি। যা দিয়েছেন তা নিজেই দিয়েছেন—হয়ত আশার অতিরিক্তই দিয়েছেন, নিজে চেয়ে নিলে অত চাইতে পারতুম কিনা সন্দেহ—তবু কিছু চেয়ে নিতে সাধ যায় বৈকি !···আজ, আজ একটা ভিক্ষা চাইব ভাবছি, দেবেন ?'

'মস্তি, যে দুটো জিনিস মানুষের সবচেয়ে প্রিয়, যা দেবার আগে বহু বিবেচনা করে সে, যার জন্য হুঁশিয়ারীর অন্ত নেই তার—সেই প্রাণ আর ভবিষ্যৎ—তোমাকে নিঃশেষে দিয়ে বসে আছি। বাকী আর কী আছে যা নেবে তুমি ?'

'যদি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আর সযত্নে রক্ষণীয় বস্তু দুটিই খরচ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো আর এত হুঁশিয়ারীর কিছু নেই। আমাকে কথা দিন তাহলে যে, আমি যা চাইব তা-ই দেবেন ?'

'যে দুটি জিনিসের নাম করলুম, সে ছাড়া এমন দু-একটা জিনিস আছে মস্তিবাঈ যা মানুষ দিতে পারে না। অন্তত পুরুষ পারে না। সে হচ্ছে তাঁর পৌরুষ, মনুষ্যত্ব, ধর্ম, আর আত্মমর্যাদা-বোধ। এ তার জীবনের সাথী, এ-জন্মের এই তার যথার্থ উত্তরাধিকার। অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা এগুলো তার ভাগ্য আর ভবিষ্যতের সঙ্গে। এ দেওয়া যায় না রানী আমার।'

'কাউকেই না, আমাকেও না ?'

'না কাউকেই নয়, তোমাকেও না।'

'বেশ, আপনি বহুদিনের অঙ্গীকার-ঋণে বদ্ধ আছেন, সে ঋণ শোধ করুন এবার। আমার আজকের যাচ্‌না পূরণ করলেই আপনার সে ঋণ শোধ হবে। দাসীর কাছে ঋণ থাকা বড় লজ্জার কথা প্রভু। আশা করছি সে ঋণের কথা ভোলেন নি আপনি ?'

'না ভুলি নি। সামশের বাহাদুরকে আমি বালাজীর সঙ্গে সমান মর্যাদা দিতে পারি নি। কিন্তু সে আর ঋণ নেই, সে এখন অপরাধে পরিণত হয়েছে। প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অপরাধ। সে প্রতিশ্রুতি পালনের কাল চলে গেছে চিরদিনের মতো।···কিন্তু আমাকে এখনই বাইরে যেতে হবে মস্তি, তোমার প্রার্থনাটা জানালে না তো। অসম্ভব না হ'লে তোমার কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না—সেটা তুমি বিশ্বাস করো।'

'আমাকে ত্যাগ করুন প্রভু—বহুদিন তো সেবা করেছি, আমাকে ছুটি দিন। সামশেরকে যে জায়গীর, আর দুর্গ দুটো দিয়েছেন—তাতেই আমাদের মায়ে-বেটার বেশ কুলিয়ে যাবে, আমরা খুব সুখে আর শান্তিতে থাকব—ঈশ্বরের কাছে নিত্য দোয়া মাগব। যদি চিরদিনের মতো নাও ছাড়তে পারেন—অন্তত এক বছরের জন্য ছুটি দিন।'

'না, তা হয় না। তোমাকে ছাড়া মানে আমার শক্তি, আমার বীর্য ত্যাগ করা। তুমি না থাকলে, আর আমার দ্বারা কোন কাজই সম্ভব নয়।'

'বেশ' পাদুটো আরও জোরে—সেই বুঝি দেবতারও আকাঙ্ক্ষিত বক্ষে, চেপে ধরে বলল মস্তানী, 'বেশ তবে চলুন এসব ছেড়ে দূর কোন দেশে—কোন অখ্যাত পল্লীতে কি কোন তীর্থস্থানে চলে যাই, যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না, সাধারণ দুটি নর-নারীর মতো সাধারণ জীবন যাপন করব! আপনি পাবেন বিশ্রাম আর শান্তি —যে দুটোর একান্ত অভাব এখানে। কোন উদ্বেগ কোন চিন্তা রাখবেন না—আমিই যেমন ক'রে পারি—অন্তত ভিক্ষা ক'রে খাওয়াব আপনাকে। চলুন।'

'না, তাও হয় না।' শান্ত অথচ অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দেন বাজীরাও, 'ধর্ম আর পৌরুষের মতো কীর্তি ও কর্মও পুরুষের কাছে অত্যাজ্য মস্তি। আমার এই কর্মক্ষেত্র এবং নব নব কীর্তি স্থাপনের আশা যদি আমাকে ত্যাগ করতে হয় তাহলে সেই মুহূর্তেই আমার মৃত্যু ঘটবে। বরং তোমাকে ত্যাগ করলেও হয়ত কিছুদিন বাঁচব—কিন্তু এই কাজ এই রাজগী ছাড়লে বোধহয় এক দণ্ডও বাঁচব না।'

মস্তানী যেন অকস্মাৎ আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেল, আস্তে আস্তে পা ছুটো ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঈষৎ হাসি-হাসি মুখেই বলল, 'আমার উত্তর আমি পেয়ে গেছি মহান পেশোয়া—আমার থেকেও প্রিয় কোন মানুষ কিম্বা বস্তু আছে কিনা সেইটেই জানতে চাইছিলুম।'

পেশোয়াও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, উত্তেজিত-ভাবে ওর হাত ছুটো চেপে ধরে বললেন, 'পাগলামী ক'রো না মস্তি—আর ওরকম কিছু করার চেষ্টাও ক'রো না। তোমাকে আমি ছাড়ব না, ছাড়তে পারব না। তার জন্যে যদি মা ভাই স্ত্রী পুত্র—এমন কি জগৎ-সংসার বাদী হয়—তা হ'লে বরং জগৎ-সংসারের সঙ্গেই বাদ করব—সেও আমার সইবে।···মা এসেছেন সসৈন্যে ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে—স্ত্রী এসেছে স্বামীকে পরাজিত করতে—এতে কেন ভয় পাচ্ছ মস্তি, এত বিচলিতই বা হচ্ছ কেন ? যুদ্ধক্ষেত্রে যে আক্রমণ করে সে শত্রু, তার আর কোন পরিচয় নেই। আরও একটা কথা কী জান, মার কাছে এখন সন্তানের কল্যাণ-কামনার চেয়েও নিজের জিদ এবং ব্যক্তিগত অপমানের কথাটাই বড় হয়ে উঠেছে। আর তাই যদি উঠে থাকে তো আমারই বা কি এত মাথাব্যথা তাঁর মর্জির কাছে নিজের সমস্ত আশা ভরসা ভবিষ্যৎ বিলিয়ে বসে থাকবার ! তুমি আর ওকথা নিয়ে মাথা ঘামিও না মস্তি—আমি নিষেধ করছি।'

॥ ১৮ ॥

পেশোয়া যত সহজে নিশ্চিন্ত হ'লেন মস্তানী তত সহজে পারল না। সে যতই নিজের শিবিরে বদ্ধ থাকে, তার প্রখর বুদ্ধি, আর পরিবেশ-সচেতনতা তাকে বার বার সতর্ক ক'রে দিচ্ছে যে সব ঠিক ঠিক, ঠিকমতো চলছে না। কোথায় কী একটা বড় রকম গোলমাল থেকে যাচ্ছে। সে একটু বাইরেও বেরিয়েছিল, আড়াল থেকেও দেখেছে—ঝি চাকরের মুখেও শুনেছে অনেক কথা। সেনামহলে খুব আলোড়ন ও আলোচনা শুরু হয়েছে—ফিসফিসিনির অন্ত নেই সেখানে। তারাও একটা মহা অস্বস্তি ও অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, একদিকে পেশোয়া বাজীরাও-এর তুর্লঙ্ঘ্য আদেশ আর অনমনীয় দৃঢ়তা—অপর দিকে তাদের পেশোয়ারই সহধর্মিনী, ধর্মপত্নী এবং দেবতার মতো পেশোয়া স্বর্গত বালাজী বিশ্বনাথ রাও-এর বিধবা। শেষে কি তারা স্ত্রী-হত্যার দায়ে দায়ী হবে? আর সে স্ত্রীলোক ব্রাহ্মণ কন্যা, তাদের মনিবের স্ত্রী, জননী—নিজেদেরও মাতৃস্বরূপা?…এক সঙ্গে ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা মাতৃহত্যার পাপ!

অথচ, আদেশ লঙ্ঘন করার কথাও কল্পনাতীত। বাজীরাও-এর ভয়ঙ্কর ক্রোধ এবং সে ক্রোধের পরিণাম—ওদের জানা আছে। তার সামনে দাঁড়াবার মতো সাহস কারও নেই। তুই বিপদের এই দোটানায় পড়ে তাদের রাত্রের ঘুম ও দিনের আহার চলে গেছে, আর—আর তার জন্যে ওরা দায়ী করছে এই মস্তানীকেই, এই মেয়েটা তাদের এবং তাদের রাষ্ট্রনায়কের জীবনে যেন মূর্তিমতী অভিশাপ,—শুধু অশান্তির বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। যদি স্ত্রী-হত্যা করতেই হয়—ঐ আপদটাকেই তো সরিয়ে দেওয়া ভাল—সব গণ্ডগোলের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ওদের মনোভাব অনুমান করতে পারে বৈ কি মস্তানী, ওদের কাছে না গিয়েও পারে। কী বলছে তাও তার অজানা নেই। তবু কাছে গিয়েও শুনল। নিজের কানেই শুনল। যে পুরুষ বেশটি তার প্রিয়তমের অত নয়নাভিরাম মনে হয়েছিল, সেই পুরুষ বেশেই বেরিয়ে পড়ল সে—সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে। নিজেদের ছাউনি-ঘরের আশেপাশে, হেমন্তের ঈষৎ-শিশিরার্দ্র সন্ধ্যায় কেউ কেউ বা শুকনো পাতার আগুন ক'রে গোল হয়ে বসেছে, কোথাও বা কোন একটা গাছতলায় জড়ো হয়েছে কয়েকজনে। কিন্তু কোনটাই খোশগল্পের আসর নয়, তা বুঝতে দেরি হ'ল না একটুও। সর্বত্রই একটা চাপা উত্তেজনা, সর্বত্রই একটা আব্‌ছা অস্পষ্ট উদ্বেগের উপস্থিতি। পিছন থেকে কিছু কিছু ওদের কথাবার্তা শুনল মস্তানী নিজের কানেই। শুনল যে এবারের এ অভিযানের নায়িকা স্বয়ং কাশীবাঈ। গতবারের পরাজয়ের পর এবারে রাধাবাঈ যেন নেতৃত্বটা পুত্রবধূর ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। কাশীবাঈ নাকি কাল প্রত্যূষেই স্বামীর শিবির আক্রমণ করবেন বলে কৃতসঙ্কল্প। সেই জন্য নাকি আজ থেকে উপবাস ক'রে ভগবান বিনায়ক ও দেবাদিদেব বিশ্বনাথের পূজা করছেন। উপবাসী অবস্থাতেই কাল নাকি যুদ্ধে নামবেন তিনি। মস্তানীকে বন্দী করতে না পারলে আর মুখে জলবিন্দু দেবেন না—এই প্রতিজ্ঞা করেছেন। সারারাত পূজা আর হোম করবেন আজ। সেই আসন থেকে উঠে এসে অশ্বপৃষ্ঠে চাপবেন। সেই রকমই আয়োজন হচ্ছে। স্বয়ং মহিষী কাশীবাঈ ও মাতুশ্রী রাধাবাঈ বাহিনীর পুরোভাগে থেকে বাহিনী চালনা করবেন। আর থাকবেন ভাই আপ্তাজী। যাতে আগে তাঁদের আঘাত না ক'রে ও বাহিনীর ওপর অস্ত্র বর্ষণ করা না যায়।

আরও শুনল মস্তানী যে, এরা কেউ ওঁদের দিকে একটি গুলি কি একটি বর্শা কিম্বা একটি তীরও নিক্ষেপ করবে না। সেটা এদের পঞ্চায়েতে স্থির হয়ে গেছে। বরং মরবে সবাই : ওঁদের অস্ত্রে কিম্বা

বাজীরাও-এর ক্রোধে—তবু মহিষী কাশীবাঈ বা জননী রাধাবাঈ-এর দিকে লক্ষ্য ক'রে কোন অস্ত্র ত্যাগ করতে পারবে না।…দু-এক জায়গায় এ-ও শুনল যে, তাঁরা যা করছেন পেশোয়া তথা সমগ্র মহারাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যই করছেন—তাতে ওদের সহযোগিতা করাই উচিত। যদি প্রয়োজন হয় তো কিছু আত্মত্যাগও। পেশোয়া বাজীরাও ওদের গৌরব—দেশের গৌরব। তাঁকে রাহুমুক্ত ক'রে পূর্ণ গৌরবে প্রদীপ্ত ক'রে তোলবার ব্যবস্থা যাঁরা করছেন, তাঁরা ওদের কৃতজ্ঞতার পাত্রই।

আর শুনল না মস্তানী, শুনতে পারল না। আস্তে আস্তে নিজের তথা পেশোয়ার আবাসের দিকে ফিরল। পুরনো কোন্ নবাবের ইমারৎ এটা, বাগানবাড়ি—এইটেই এখানকার আবাস ক'রে নিয়েছেন পেশোয়া, এই বাড়ি ঘিরেই সমগ্র ছাউনি। এখানে —এখানে কেন, পুনা বা সাতারা ভিন্ন সর্বত্রই—পেশোযা আজকাল একত্র বাস করেন মস্তানীর সঙ্গে। তবু নিজস্ব একটা ঘর থাকে তার সব জায়গাতেই। যখন তাঁবুতে থাকতে হয়—তখনও ওরই মধ্যে একটু ব্যবধান রচনা ক'রে পৃথক কক্ষ নির্দিষ্ট হয়। রাত্রে শয়নের সময় শুধু পেশোয়া সে ঘরে যান, বাকী দিনরাতের অন্য সময় —মস্তানীই যায় ওঁর ঘরে, প্রয়োজনমতো, তেমন কেউ বাইরের লোক এলে বেরিয়ে আসে।

মস্তানী নিজের ঘরে এসে আয়নাটার সামনে দাঁড়াল। সুরাট থেকে এসেছে আয়নাখানা, সাদা-চামড়া ফিরিঙ্গীদের তৈরী। গোটা চেহারাটা দেখা যায়—এত বড়। মাথার ওপরে বিপুল ঝাড়, সেও ফিরিঙ্গী দেশ থেকে আমদানী—তার আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর সেই পূর্ণ প্রতিবিম্ব।

অনেকক্ষণ বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। নিজেরই বিচিত্র সুন্দর একজোড়া চোখের দিকে। সে দৃষ্টিতে কী? বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ, উপেক্ষা

—গোটা জগৎসংসারটাকে—না কি শুধুই এক ধরনের দুর্জ্ঞেয় আত্মানুভূতি ?

কী সে ? জাদুকরী ? কুহকিনী ? সর্বনাশিনী ?

সর্পিনী সে—যা তার শাশুড়ি বলে থাকেন ?

না কি, যথার্থ কল্যাণাকাঙ্ক্ষিনী, অর্ধাঙ্গিনী ?

সে তো জানে তার জীবন মরণ, তার ভাগ্য ভবিষ্যৎ, তার ইহকাল পরকাল সব জড়িয়ে গেছে ঐ মানুষটির সঙ্গে চিরদিনের মতো। ওঁর কল্যাণেই তার কল্যাণ। সে ওঁর স্ত্রী, ন্যায়ত ধর্মত। ঈশ্বরের চোখে অন্তত। যে গোধূলি লগ্নে ওদের মিলন ঘটেছিল সে লগ্নঅনন্ত গোধূলিতে বিস্তারিত হয়ে গেছে ওর জীবনে—ওদের জীবনে। এর ব্যতিক্রম নেই, ব্যত্যয় নেই। সে স্ত্রী। স্ত্রী কি কখনো স্বামীর সর্বনাশ করতে পারে ? সে তো নিজেরও সর্বনাশ।

না, তা সে পারবে না।

কল্যাণই করবে সে। যদিও জানে যে তাতে ওঁর আখেরী কল্যাণ কিছু হবে না। সে পাশে না থাকলে একদিনেই ভেঙ্গে পড়বে মানুষটা। কিন্তু তবু সে একরকম ভাল, ইহকালে না হয় পরকালে মিলিত হ'তে পারবে তারা, রোজ-কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তো বটেই—আত্মা থাকবে আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে, সেখানে কারও সাধ্য নেই তাদের বিচ্ছিন্ন করে।

আর সে তো পাশে থেকেও বাঁচাতে পারবে না। পুরুষের পৌরুষ সবচেয়ে বড়, সর্বাপেক্ষা রক্ষণীয়। যে কর্তা যে নায়ক তার কর্তৃত্ব তার জীবনের চেয়েও বড়। কাল প্রভাতে যদি সত্যিই বাজীরাও-এর সেনারা বাজীরাও-এর আদেশ পালন না করে, যারা চিরদিন অলঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখেও তাঁর আদেশে এগিয়ে গেছে, নির্বিচারে বিনা প্রতিবাদে—সে রকম কল্পনাতীত অঘটন যদি ঘটে সত্যিই—তখন যে ঐ মানী মানুষটার আত্মহত্যা করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকবে না। সে অপমান উনি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না, তা মস্তানী ভাল রকমই জানে।…

সে দুর্গতি কিছুতেই হ'তে দেবে না সে—তার রাজা তার মালিক তার প্রিয়তমের। তাতে ওর এবং ওঁর অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক।

বহুক্ষণ সেইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পেশোয়ার বসবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল মস্তানী সেই বেশেই। কোন প্রসাধন করল না কিম্বা পোশাকটাও বদলাবার চেষ্টা করল না। পেশোয়া বহু রাত্রি পর্যন্ত জেগে কাজ করেছেন। করবেন তাও বলেছিলেন। বিভিন্ন সেনাধ্যক্ষদের বৈঠক বসেছিল ওঁর ঘরে। তারা বিদায় নিতে নিজের গদিআঁটা কুর্সিতেই একটু এলিয়ে পড়েছিলেন পেশোয়া—একান্ত ক্লান্তিতে চোখ দুটো বুজে এসেছিল মাত্র। ঘুমিয়ে পড়েন নি, চোখের পাতা ভারী হয়ে এলেও ঘুম আসা তখন সম্ভব নয়। তাই পুরু কার্পেটে লঘু পদশব্দও কানে গেল তাঁর। চমকে চোখ খুললেন, এবং সোজা হয়ে বসলেন।

'পরে এসেছ পিয়ারী সেই পোশাকটা? বাঃ, বলিহারী। সত্যিই, কে জানত যে সামান্য এই গাঁওয়ার চাষার পোশাকে তোমাকে এত সুন্দর দেখায়—নইলে এতদিনে শ'খানেক এমনি পোশাক করিয়ে দিতুম।'

উচ্ছ্বাসে যেন ছেলেমানুষ হয়ে ওঠেন পেশোয়া।

মস্তানী কিন্তু এ প্রশংসায় অন্য দিনের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল না, শুধু আর একটু কাছে সরে এসে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'শুতে যাবেন না?'

'না। আজ আর তোমার ঘরে নয়, এইখানেই এই বড় কুর্সিটাতে পড়ে ঘণ্টা দুই গড়িয়ে নেব।...কাল শেষ রাত্রে উঠতে হবে একটু। দত্তাজি পিংলে আর লখোজী আংড়েকে তৈরী থাকতে বলেছি, শেষ রাত্রেই একটু কাজে বেরোব ওদের নিয়ে।'

তখনও এক বিচিত্র দৃষ্টিতে বাজীরাও-এর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল মস্তানী, তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ বলেই সেটা অত লক্ষ্য করেন নি

বাজীরাও—সে এবার শান্ত কণ্ঠে শুধু প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবে হাতেই পেশোয়া ওদের নিয়ে? শুধুই কি ওরা—না ওদের ফৌজও থাকবে?

একটু ইতস্তত করলেন পেশোয়া, কথাটা বলতে চাইছেন না ঠিক, অথচ মিথ্যা বলতেও অভ্যস্ত নন—দ্বিধাটা সেইখানেই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বলেই ফেললেন, 'ফৌজও থাকবে। মা আর ভাই ঠিক করেছে কাল ভোরবেলা অনুরাধা নক্ষত্র উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা আমাদের এই বাড়ি আক্রমণ করবেন। সামনে থাকবেন মা আর কাশীবাঈ। ওঁদের দেখলে আমার সেনারা সহজে অস্ত্র ছুঁড়তে চাইবে না। তাই আমি ঠিক করেছি—শেষরাত্রে—ওঁরা প্রস্তুত হবার আগে আমি পিছন দিক থেকে ঘুরে গিয়ে আক্রমণ করব। যাদের ওঁরা সঙ্গে এনেছেন তারা কেউ কোনদিন লড়াই করে নি, দত্তাজি পিংলের মাওয়ালী সৈন্যদের সামনে দু মুহূর্তও টিকবে না। ওঁদের তেজ শেষ ক'রে দিয়ে আসব—মা বা কাশীবাই-এর কেশাগ্রও স্পর্শ করব না যেমন—কোন সহায়সম্বলও রাখব না ওঁদের।'

শিউরে উঠল মস্তানী, বলল, 'তবু সেও মা আর স্ত্রীর সঙ্গেই লড়াই পেশোয়া, পরাজয় তাঁদেরই হোক আর আপনারই হোক, সমান অপমানের। আর অপমান ছাড়াও, ব্যথাই কি কম বাজবে!'

'তুমি শুতে যাও মস্তানী, ওসব কাব্য-কথা শোনবার আমার সময় নেই। হাতে পায়ে চোট লাগলে মানুষের ব্যথা কম বাজে না, তবু সময়-বিশেষে, দূষিত ক্ষত দেখা দিলে সেই হাত-পাই কেটে বাদ দিতে হয়, ইচ্ছে ক'রে। আর তাঁরাও—জেনে শুনেই আগুনে হাত দিতে এসেছেন, হাত পুড়লে আগুনের দোষ দেবেন না আশা করি। তুমি যাও, শুয়ে পড়ো গে।'

কণ্ঠের এ কঠিন স্বর মস্তানীর পরিচিত। এখন আর কারও কোন কথাই শুনবেন না। সে-চেষ্টাও সে করল না। একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে আরও কাছে এসে দাঁড়াল। মাথা থেকে পাগড়িটা

গ্লাস নিয়ে পাশের একটা মেজ্-এ রেখে, মাথায় কপালে অভ্যস্ত লঘু অভীষ্ট স্পর্শে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আপনি একটুও শোবেন না পেশোয়া ?'

'না মস্তি, তাহলে জোর ঘুমিয়ে পড়ব, ঠিক সময়ে আর ওঠা হয়ে উঠবে না। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই কুর্সিতে বসেই চোখ বুজব একটু।'

আর কথা কইল না মস্তি, বোধ করি চোখের জল ধরা পড়বার ভয়েই। সে আস্তে আস্তে লাঠির ডগায় বসানো পিতলের ঠুলি দিয়ে ঝাড়ের অধিকাংশ বাতি নিভিয়ে ঘর অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ক'রে তেমনি নিঃশব্দেই বেরিয়ে গেল।

সত্যিই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন বাজীরাও। নইলে এ আচরণ তাঁর কাছে অস্বাভাবিক বলেই তো ঠেকবার কথা। কাছে থাকার জন্য জিদ করল না, শয়নগৃহে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করল না— যাওয়ার সময় কোনরকম সম্ভাষণ জানিয়ে গেল না, এমন কি অভ্যস্ত চুম্বনটার কথাও মনে রইল না তার।...

আর, সেটুকু লক্ষ্য করলেন না বলেই তাঁর ক্লান্তি ও অসুস্থতার পরিমাণটা যেন বেশী ক'রে দেখতে পেল মস্তানী। সঙ্গে সঙ্গেই মন থেকে সমস্ত দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা জোর ক'রে ঠেলে সরিয়ে দিল। বাইরে এসে ওড়নায় চোখ মুছে, বার বার ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিয়ে সদ্যোদ্গত অশ্রুর সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করল। তারপর সোজা আস্তাবলে গিয়ে নিজের ঘোড়া বার ক'রে যতদূর সম্ভব সন্তর্পণে এ বাড়ি থেকে, শিবির থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিনকার রাত্রের 'ছাড় শব্দ' ওর নিজেরই তৈরী, সুতরাং বাধা পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ওর গলার আওয়াজও সান্ত্রীদের পরিচিত, বিনা প্রতিবাদেই পথ ছেড়ে দিল তারা।

সোজা গিয়ে থামল মস্তানী রাধাবাঈদের ছাউনীতে। বিস্মিত হতচকিত প্রহরীকে বলল যে, মাতুশ্রী দেবী রাধাবাঈকে বলো মস্তানী

এসেছে তাঁকে প্রণাম জানাতে। কোন ভয় নেই,একা নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই এসেছে সে!'

বিস্মিত রাধাবাঈও বড় কম হলেন না, তাঁরও মুখে কথা সরল না বেশ কিছুক্ষণ। তাঁকে কথা বলার সুযোগও দিল না মস্তানী ; বলল, 'আমি স্বেচ্ছায় বন্দী হতে এসেছি মা, আর আমি স্বয়ং পেশোয়া কি আমার ছেলের নামে শপথ করছি—আমি পালাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করব না। শুধু একটা অনুরোধ, এখনই—রাত্রি শেষ হওয়ার অনেক আগে আমাকে নিয়ে আপনারাও এখান থেকে সরে যান নইলে, নইলে এক প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাবে। আপনারাও বাঁচবেন না— যাঁকে বাঁচাবার জন্য আপনাদের এত কাণ্ড তাঁকেও বাঁচাতে পারবেন না!'

পেশোয়া বাজীরাও-এর জননীও সেটুকু বোঝেন বৈকি! বোধ করি এই প্রথম তাঁর পুত্রের উপপত্নীর সঙ্গে একমত হলেন তিনি। তখনই সেই হুকুম ছড়িয়ে গেল শিবিরের সর্বত্র—দ্রুত ও নিঃশব্দ গতিতে। ঠিক এক প্রহর কালের মধ্যে অন্ধকারেই সকলে রওনা হয়ে গেলেন। শুধু সাদা তাঁবুগুলো পড়ে রইল—এই অবিশ্বাস্য অভিযানের সাক্ষ্য স্বরূপ।

সংবাদটা এরা পায় নি অনেকক্ষণ পর্যন্ত। একটু আধটু যা শব্দ অন্ধকারে ঘোরাফেরা করা কি ঘোড়া তৈরী করার আওয়াজ, সেটাকে শেষ রাত্রের সম্ভাব্য আক্রমণের উদ্যোগপর্বই মনে করেছিল। তাই পেশোয়া বা তাঁর সচিব—কাউকেই সে সম্বন্ধে সতর্ক করার প্রয়োজন বোঝে নি। তাছাড়া এ শিবিরেও কিছু উদ্যোগপর্ব ছিল, সেজন্যও অন্যমনস্ক ছিল সকলে।

পেশোয়াই বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা— বাইরে বেরিয়ে একবার মাত্র চেয়ে দেখে। তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি যেন অন্ধকারের পর্দা ভেদ করে ভিতরের শূন্যতা দেখতে পেল। তখনই চার পাঁচজন লোক পাঠালেন খবর নিতে। তারা দুই দণ্ডকালের মধ্যেই ফিরে এল, খবর দিল-

শূন্য খাঁচা সব কটাই পড়ে আছে, কিছু কিছু আসবাব বা তৈজসও আছে—কিন্তু পাখী একটিও নেই।

বাজীরাও তার আগেই আশঙ্কা করেছেন ব্যাপারটা। তবুও স্খলিত মন্থর গতিতে মস্তানীর—তাঁদের শয়নকক্ষে গেলেন একবার। আস্তাবলে লোক পাঠালেন। অবশেষে প্রহরারত সান্ত্রীর মুখে নিশ্চিত খবরটা পাওয়া গেল। তারা রানীসাহেবার গলার আওয়াজ পেয়েছে, ঘোড়াটাও চিনতে পেরেছে অন্ধকারেই। হ্যাঁ, তিনি ঐ দিকেই গিয়েছেন বটে। সন্দেহ বা সংশয়ের কোন অবকাশ নেই কোথাও।

সচিবের ইঙ্গিতে সকলেই নীরবে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তিনি নিজেও। বিশাল বিস্তৃত বহু মধুস্মৃতিভরা সেই শয়নকক্ষে একা বসে রইলেন বাজীরাও। তাঁদের বহু প্রণয় রজনীর সাক্ষী এই শূন্য ঘর। বহু রভসের সঙ্গী এ। ঐ তো চারিদিকেই তার স্পর্শ লাগা কত অসংখ্য জিনিস। তার বিপুল কৃষ্ণ কেশ-বন্ধনীর চুলে বোনা দড়ি ও সোনার কাঁটা এক গাদা। কত রকমের আতরের শিশি। রেশমের আর সুতীর অসংখ্য পোশাক। তারই লোভনীয় পরিপূর্ণ অধরের স্পর্শসিক্ত আলবোলার নল—। সবই ঠিক আছে, শুধু সে-ই নেই।

বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন বাজীরাও। পাথরের মতো স্থির হয়ে। বোধ করি পলকও পড়ছিল না তাঁর। অস্বাভাবিক বিবর্ণ তাঁর সে সময়কার মুখের দিকে চাইলে আত্মীয় বন্ধু ও সেবকরা ভয় পেয়ে যেত।

অবশেষে পূর্ব গগন উদ্ভাসিত ক'রে নতুন আশার বাণী নিয়ে উষা দেখা দিলেন, ক্রমশ তাঁর আবির্ভাবের দীপ্তি এই অন্ধকার শয়নকক্ষেও প্রবেশ করল এসে। কিন্তু বাজীরাও-এর সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি তাকিয়েছিলেন ঊর্ধ্বমুখে। ঝাড়ের বাতিগুলো নিভছে একে একে। তেল ফুরিয়ে গেছে, ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে

আসছে তাই, একেবারে শেষ মুহূর্তে একবার একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেই নিভে যাচ্ছে সম্পূর্ণ।

এ যেন একটা খেলা পেয়ে গেছেন বাজীরাও। উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছেন আলোগুলোর দিকে। শেষ বাতিটিও নিভে যেতে চোখটা নামিয়ে আবার ঘরের দিকে চাইলেন একবার। দিনের আলোয় সেই চিরপরিচিত জিনিসগুলো আরও স্পষ্ট, আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি জিনিস তার ব্যবহৃত, কোন কোনটা সন্ত-ব্যবহার করা—তার স্পর্শ তার ঘ্রাণ লেগে থাকা প্রতিটি বস্তুও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই সঙ্গে।

সেগুলো সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও রূঢ়, আরও তীব্র একটা আঘাত পেলেন বাজীরাও। যন্ত্রণায় বুকের মধ্যেটা যেন কুঁকড়ে উঠল অকস্মাৎ। চোখ বুজে দুহাতে বুক চেপে ধরে প্রাণপণে সামলাতে হ'ল সে আঘাত। বুকের এ যন্ত্রণাটা আরও দু-একবার টের পেয়েছেন ইদানীং—কিন্তু এমন তীব্র আর কখনও হয় নি। বেদনায় কপালে বড় বড় স্বেদবিন্দু ফুটে উঠেছে—সামনের বড় আয়নাটায় দেখতে পেলেন পেশোয়া। এই আয়নায় গালে গাল রাখা অবস্থায় দুজনের মুখ কতবার দেখেছেন দুজনে। মস্তি বলত, 'ঘামলে আপনাকে বড় সুন্দর দেখায় মালিক।' সে থাকলে এতক্ষণে নিজের বুক দিয়ে মুছে নিত এ ঘাম। ··

আঃ, আবার! তড়িৎস্পৃষ্টের মতোই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। থাক্ ওর কথা। সে জেনে শুনেই তো তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে গেছে। তার কথা কেন ভাববেন মিছিমিছি?

তখনই ডেকে পাঠালেন সচিবকে, ডেকে পাঠালেন সেনানায়কদের। বড় ভুল হয়ে গেছে তাঁর। মুঙ্গী সেবগাঁওয়ের সন্ধি-শর্ত অনুযায়ী হান্দিরা আর খারগন জেলা তাঁকে ব্যক্তিগত জায়গীর হিসেবে দেবার কথা ছিল নিজামের। নানা টালবাহানা ক'রে আজও সে তা দেয় নি। পেশোয়া এবার গায়ের জোরে আদায় করবেন নিজের প্রাপ্য।

সেনা যা তৈরী আছে তা নিয়ে এখনই তিনি রওনা হবেন, বাকী সবাই যেন পিছনে পিছনে রওনা হয়।

'আজই ?' সেখানে উপস্থিত সকলের বিস্ময় প্রতিধ্বনিত ক'রে প্রশ্ন করলেন মুখ্য সচিব, 'এই অবস্থায় ? কিন্তু আপনি যে এখনও রীতিমতো অসুস্থ পেশোয়া !'

'যোদ্ধার স্বাস্থ্য বিবেচনা ক'রে যুদ্ধ করতে গেলে আর যাই হোক, লড়াই হয় না। ওকথা এখন থাক। যদি আমি মরি—আপ্তাজী আছে, বালাজী আছে, লড়াই বন্ধ হবে না। আপনি যান, যা বললুম সেই মতো করুন গে।···আমি পূজা সেরে দুই দণ্ডের মধ্যেই ঘোড়ায় সওয়ার হবো, দেরি না হয়।'

সবাই চলে গেলে পেশোয়া আবারও আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ব্যাকুল চোখ বোধ করি বারেক নিজের মুখের পাশের শূন্য স্থানে আর একখানা প্রিয় পরিচিত ও অভ্যস্ত মুখের প্রতিচ্ছবি অন্বেষণ করল, তারপর সেই শূন্যতাটার দিকে চেয়েই অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন, 'তাই হোক, তাই হোক পিয়ারী।···তোমার অভাব বরং সইবে, যুদ্ধক্ষেত্রে নূতন কীর্তির আস্বাদে সে আঘাতও সহ্য হবে বলেছিলাম—সেই অভিমানে আমাকে জেনে শুনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে ! কিন্তু আমার কথাই সত্য করব, আমি বাঁচব, নূতন কীর্তি নূতন বিজয় গৌরবের মধ্যে বাঁচব। আর তার মধ্যেই কান পেতে থাকব তোমার আশাভঙ্গের দীর্ঘনিঃশ্বাসটুকু শোনবার জন্যে !'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই যেন শিউরে উঠলেন বাজীরাও, 'না না, না, তুমি আমার কল্যাণের জন্যই গিয়েছ পিয়ারী তা আমি জানি। তোমাকে একটুও ভুল বুঝি নি, বিশ্বাস করো। তাই আমি বাঁচতেই চেষ্টা করব, প্রাণপণে চেষ্টা করব তোমার এ আত্মত্যাগ সার্থক ক'রে তুলতে।'

ভাগ্যে তখন আর কেউ সে ঘরে ছিল না, নইলে লৌহ-মানব মহাক্রোধী মহান্ পেশোয়া বাজীরাও-এর বজ্রাধারসদৃশ চোখের

কোল থেকে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়তে দেখে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকত না তাদের।

॥ ১৯ ॥

ছত্রপতি খবরই পেয়েছিলেন একটু দেরিতে। নইলে তাঁর স্বভাবজ কর্মবিমুখতায় কালহরণ ঘটে নি আদৌ, অন্তত এ ব্যাপারে নয়। রাজ্যের সব সংবাদই তাঁর খাস দপ্তরে যায়, বেছে নিয়ে প্রধান প্রধানগুলো জানানো হয় তাঁকে। এই নির্বাচন ব্যাপারে কিছুটা দেরি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাও হয় নি বিশেষ। সংবাদটা প্রতিনিধির কাছে পৌঁছনো মাত্র তিনি বুঝেছিলেন যে এটা ছত্রপতিকে অবিলম্বে জানানো দরকার। তাঁর অত স্নেহের পেশোয়ার কাণ্ডটা দেখুন তিনি।

আসলে বাধাবাঈ-এর এই অস্বাভাবিক অভিযানের সমস্ত আয়োজনটাই হয়েছিল অতি দ্রুত এবং অতিশয় নিঃশব্দে। দলবল বেরিয়ে পাটাসের দিকে রওনা হবার আগে কেউ জানতে পারে নি। বাইরের লোককে জানানোর মতো নয় বলেই সংবাদটা তাঁরা চেপে রেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত। ঈর্ষা ও বিদ্বেষ যদি হিতাহিত বিবেচনার বাধা ছাপিয়ে না উঠত মনের পাত্রে, মানসিক সমস্ত স্থৈর্যের মর্মমূল পর্যন্ত যদি বিচলিত হয়ে না উঠত, তাহলে এ কাজ তাঁরা করতেই পারতেন না। এর লজ্জা এবং গ্লানি সম্বন্ধে তাঁরা অচেতন ছিলেন না কিছুমাত্র। তাই সে বোধ তাঁদের এ কাজে বাধা দিতে না পারুক কিছুটা সংযত ও সংহত রেখেছিল।

খবর ছত্রপতির কাছে যাওয়া মাত্র, যাবতীয় ঝঞ্ঝাট ও সক্রিয়তা সম্বন্ধে অনিচ্ছা তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন একমুহূর্তে। এ অভিযানের পরিণাম সম্বন্ধে তাঁর ধারণায় কিছুমাত্র অস্পষ্টতা ছিল না। বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটবে। বাজীরাও-এর অনুচর ও সৈন্যরা

বিশ্বনাথরাও-এর বিধবাকে, বা বাজীরাও-এর মহিষীকে আক্রমণ করতে রাজী হবে না নিশ্চিত, হয় অস্ত্র ত্যাগ করবে নয় তো দাঁড়িয়ে মার খাবে। সে ধরণের 'আদেশ পালনে পরাঙ্মুখতা'য় অভ্যস্ত নন বাজীরাও—সে অপমান সহ্য করতে পারবেন না তিনি। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হয় নিজের সৈন্যকে নিজে আক্রমণ করবেন, নয় তো একাই ঝাঁপিয়ে পড়বেন বিপক্ষপক্ষের সামনে—তাঁকে মারবে না কেউ—কিন্তু মাতুশ্রীর হাতে একান্ত অনভিপ্রেত বন্দীদশা ঘটবে। অথবা—ক্রোধে ক্ষোভে বিচলিত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করাও অস্বাভাবিক নয় বাজীরাও-এর পক্ষে।

আরও যেটা ঘটতে পারে—তাও ভেবে দেখেছেন ছত্রপতি, প্রিয়তমকে এই অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে রক্ষা করতে নিজে এসে ধরা দেবে হয়ত মস্তানী—কিম্বা আত্মহত্যার চেষ্টা করবে। সেটাও পেশোয়ার কাছে মৃত্যুতুল্য হবে।

অথচ তাঁরই বা কি করার আছে। নিতান্তই পারিবারিক ব্যাপার এটা, একটি পরিবারের একান্ত ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ কলহ। তার মধ্যে ছত্রপতির হস্তক্ষেপ তাঁর পক্ষে রীতিমতো মর্যাদাহানিকর। সে পরিবারও সামান্য তুচ্ছ কোন প্রজার নয়—সেখানেও মর্যাদার প্রশ্ন আছে। সম্ভ্রমে তাঁরা ছত্রপতির সমকক্ষ না হ'লেও খুব অনেকখানি নিচেও নন। ছত্রপতির হুকুমে যদি বিশ্বনাথরাও-এর মহিষী এবং বাজীরাও-এর জননীকে বন্দী করা হয় তাহলে রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত সামন্ত পরিবারে বিক্ষোভ ও আলোড়ন দেখা দেবে।

নাঃ, এসব কিছুই করা যাবে না। যা করা যাবে তাই করলেন তিনি। প্রথমেই প্রয়োজন একটি বিশ্বস্ত লোক—যে এ কাজ করবে কেবলমাত্র আদেশপালন হিসেবে নয়, কিছুটা প্রাণের গরজেও। কারণ তিনি যে কাজ করতে যাচ্ছেন তার মধ্যে তাঁর হাত আছে এ কথা অপর কারুর জানাটা আদৌ অভিপ্রেত নয়। রাজকার্যে রাজ-আদেশে যাচ্ছে তাঁর বিশ্বস্ত কাজের ভার পেয়ে, অথচ সে তথ্যটা

সগর্বে কাউকে জানাবে না, সাধারণ সেবকের মধ্যে এ লোক পাওয়া কঠিন—তা ছত্রপতি ভাল ক'রেই জানেন। আর অসাধারণ বা বিশিষ্ট সেবকদের আদৌ জানাতে চান না তিনি। সুতরাং যে ব্যক্তি নেহাৎই নগণ্য হবে, অথচ নিজের গরজে কাজ করবে এমন কাউকে প্রয়োজন। এবং সে লোক খোঁজ করতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ল তাঁর রঘুজীর কথা।

হ্যাঁ—রঘুজীই তো আছে। ঐ লোকটিই ঠিক এ কাজের উপযুক্ত। পেশোয়ার নিমক খেয়েছে, রাধাবাঈয়ের কাছে সপরিবারে ঋণী, মস্তিকে ভালবাসে এবং সম্প্রতি ছত্রপতির কাছে বিশেষ উপকৃত। তার সমগ্র পরিবারের প্রাণ রক্ষা করেছেন তিনি। সে উপকার এত শীঘ্র ভুলবে—ঠিক সে ধরণের মানুষ নয় রঘুজী, সেটুকু ওর মুখ দেখেই শাহু বুঝতে পেরেছেন ঃ বহুদর্শী লোক তিনি, মানুষের মুখ দেখে তার চরিত্র অনেকখানি বুঝতে পারেন। আবেগ মুছে যাবার বয়সও হয় নি রঘুজীর—আর আবেগ থাকলে কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ গুলোও থাকবে বৈকি খানিকটা। সৌভাগ্যক্রমে রঘুজী কোথায় আছে তা তিনি জানতেন। সাতারার কাছেই একটি দুর্গে আছে সে। সেখানে খবর দিতে বা সেখান থেকে আসতে কয়েক দণ্ডের বেশী সময় লাগবে না।

রঘুজীকে ডেকে আনতে ঘোড়সওয়ার রওনা করিয়ে দিয়ে একান্তসচিব ও কলম্‌চী গনেশজী পন্থকেও ডেকে পাঠালেন ছত্রপতি। নিজের জবানীতে দুখানি চিঠি লেখালেন তাকে দিয়ে। একটি মস্তানীকে ও একটি পেশোয়া বাজীরাওকে।

মস্তানীকে লিখলেন ঃ

'কন্যা, তুমি এই পত্র পাঠ-মাত্র, এই পত্রকে আদেশনামা জেনে রঘুজীর সঙ্গে সাতারায় চলে আসবে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। এ পত্রের কথা কেউ না জানতে পারে। সেজন্য বেশী লোকলস্কর নিয়ে বা শিবিকায় না আসাই শ্রেয়। অল্প দুচার জন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী নিয়ে যতদূর সম্ভব গোপনে শিবির ত্যাগ করবে এবং অশ্বারোহণে আসবে।

খুব জরুরী প্রয়োজন বুঝে সত্বর রওনা হবে। ইতি, আশীর্বাদক শাহু ছত্রপতি।'

আর বাজীরাওকে লিখলেন,

'বৎস, বিশেষ প্রয়োজনে মস্তানীকে আমি সাতারায় আসতে বলেছি। আমার ইচ্ছা ও আদেশ যে সে আমার আশ্রয়ে মাসখানেক বা মাস দুই থাকুক। তার যত্নের কোন ত্রুটি হবে না, আমি তাকে কন্যা সম্বোধন করেছি, সে কন্যার মতোই থাকবে এখানে। এই কাল উত্তীর্ণ হ'লে আমি তোমার নির্দেশমতো স্থানে রক্ষী সমেত নিরাপদে পৌঁছে দেব। যদি সম্ভব হয় তো তুমিও এসে এই সময়টা আমার এখানে বিশ্রাম করে যাও, তাতে তোমার দেহ ও মন দুইই বিশ্রাম পাবে। ইতি, নিয়ত আশীর্বাদক শাহু ছত্রপতি।'

লেখা শেষ হ'লে স্বাক্ষর ও মোহর পর্ব সমাপ্ত ক'রে চিঠি দুটি নিজের কাছে রেখে গনেশজীকে বললেন, 'তুমি এবার যেতে পারো।'

হতবাক গণেশজী বহু কষ্টে কণ্ঠস্বর সংগ্রহ ক'রে বললেন, 'কিন্তু এ চিঠি—পাঠাতে হবে না?'

'সে ব্যবস্থা আমি করেছি। তুমি যাও, বিশ্রাম করো গে।'

অগত্যা গণেশজীকে চলে আসতে হ'ল। ব্যাপারটার আগা ও গোড়া, পূর্ব এবং পর—কিছুই বুঝতে পারলেন না গণেশজী। ইদানীং ছত্রপতির কী একটা হয়েছে, ক্রমশ যেন তাঁর আচরণ ও কার্যকলাপ কতকটা দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠছে। বিশেষত এই বিজাতীয়া স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে কী যে দুর্বলতা একটা দেখা দিয়েছে। বয়স এবং সম্পর্ক বিরোধী না হ'লে এ দুর্বলতার কদর্থই করতেন গনেশজী, অন্তত করলে কেউ তাঁকে দোষ দিত না। তিনি মনে মনে বেশ একটু অসন্তুষ্ট হয়েই চলে গেলেন রাজসন্নিধান থেকে। এইভাবে কিছু না বুঝতে দিয়ে বা বুঝিয়ে না বলে হঠাৎ ডেকে আনা এবং হঠাৎই সরিয়ে দেওয়াটা তাঁর প্রতি রীতিমতো অবিচার বলে মনে করলেন গণেশজী পন্থ। অভি-মানও বোধ করলেন সেই পরিমাণে—তাঁর এতদিনের বিশ্বস্ত সেবার

যদি এই পুরস্কার হয়, পথ-থেকে-ডেকে-আনা দিনমজুরের প্রতি যেমন আচরণ—তেমনি করার উপযুক্তই যদি মনে ক'রে থাকেন ছত্রপতি তো আর কিছু বলবার নেই তাঁর। উনি মালিক, যা খুশি করতে পারেন বৈকি!

রঘুজী আদেশ পেয়ে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসেই ছুটে এসেছিল। শাহু তাকে তলব করেছেন, কোন রকম শাস্তি দিতে নিশ্চয়ই নয়—কারণ তেমন কোন গর্হিত কাজ সে করে নি, সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্তই আছে —ডেকে পাঠিয়েছেন কোন জরুরী কাজ আছে বলেই। আর গুরুতর রাজকার্যের জন্য তাকে নির্বাচন করায় তাঁর বিশ্বাস ও আস্থাই প্রকাশ পেয়েছে—সে জন্য তার গর্বেরও সীমা ছিল না। কিন্তু এখানে এসে ছত্রপতির আদেশ শুনে তার সমস্ত আনন্দ মিলিয়ে গেল, দুশ্চিন্তায় মুখ শুকিয়ে ললাটের কোণে কোণে ঘাম দেখা দিল।

দুশ্চিন্তা নিজের জন্য নয়, কাজের গুরুত্ব বিবেচনা ক'রেও নয়। তার যা বয়স তাতে কাজ যত কঠিন হয় সম্পন্ন করায় তত আনন্দ, ভার যত গুরু হয় বহন করায় তত সুখ। না—নিজের জন্য নয়, প্রাণ দিয়েও সে প্রভুকার্য সমাধা করবে, আর সেই মহিমময়ী নারীর জন্য প্রাণ দেওয়া তো আনন্দের—সেই তো যথার্থ বাঁচার মূল্য পাওয়া এ জীবনে। না, তার দুশ্চিন্তা মস্তানীর বিপদের কথা শুনে। এসব কিছুই জানত না সে। এত কাণ্ড হয়ে গেছে সে কোন খবরই পায় নি। ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে তো সে? সে-ই শুধু ভাবনা, এর মধ্যে কিছু ঘটে যাবে না তো?

তার কাজ এবং গোপনীয়তার কারণ বুঝিয়ে দিয়ে ছত্রপতি প্রশ্ন করলেন, 'ভেবে দেখ, পারবে তো?'

হেঁট হয়ে তাঁর পদধূলি নিয়ে রঘুজী উত্তর দিল, 'আমার নিজের শক্তি সামান্য, আপনার আশীর্বাদেই পারব। আপনার আদেশ ব্যর্থ হবে না।...আমাকে অনুমতি দিন, এখনই রওনা হই।'

স্মিত প্রসন্ন হাস্যে স্নেহও বুঝি প্রকাশ পায় ছত্রপতির, এই সুদর্শন তরুণটিকে যত দেখছেন তত খুশী হচ্ছেন। বললেন, 'এখনই রওনা হবে ? সামান্য একটু বিশ্রাম করবে না ? কিছু খেয়ে নেবে তো অন্তত ?'

'এখন যত শীঘ্র যেতে পারব ততই শান্তি, আর মনে শান্তি না থাকলে বিশ্রামের মূল্য কি ? আমার কথা ভাববেন না একটুও, দু চার দিন না খেলে কি না ঘুমোলে কোন অসুবিধা হবে না আমার। শুধু যদি ঘোড়ার ডাক বদল করার ফরমান্ দেন একটা তো সময় আরও সংক্ষেপ করা যায়, ঘোড়ার বিশ্রাম করানোর জন্য সময় নষ্ট করতে হয় না।'

তৎক্ষণাৎ আবার গনেশজীকে ডেকে সেই মতো হুকুমনামা দিতে বলে ও কিঞ্চিৎ অর্থ দেবার আদেশ দিয়ে ওকে বিদায় দিলেন ছত্রপতি। আর একদণ্ড কালের মধ্যেই—ওপরে পূজার ঘরে যেতে যেতে একটা গবাক্ষকোণ থেকে দেখতে পেলেন—তাঁর দুর্গের প্রবেশপথ ধরে তীর বেগে ছুটে চলেছে এক অশ্বারোহী—চিনতেও বিলম্ব হ'ল না, রঘুজী।

সত্যিই পথে কোথাও বিশ্রাম করে নি রঘুজী। ঘোড়া বদলাতে মধ্যে দুবার যা থামতে হয়েছিল, তাতেও সাকুল্যে একদণ্ডের বেশী দেরি হয় নি। সেই সময়ই জল খেয়ে নিয়েছে নিজে একটু একটু—আর পোড়ানো ভুট্টা সংগ্রহ ক'রে ঘোড়ার পিঠে বসেই খেতে খেতে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের কিছু পরে, পাটাসের কাছাকাছি পৌঁছে অকস্মাৎ একটা পাথরে হোঁচট লেগে ঘোড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। অন্ধকারে নক্ষত্রের ঝাপ্সা আলোতে যতটা দেখা গেল বিরাট একটা পাথর কে যেন ইচ্ছা ক'রে পথে রেখে দিয়েছে, আশে পাশে আর কোথাও সে ধরনের পাথর নেই। তখনই যেন কেমন একটা হতাশা বোধ করল রঘুজী—কে যেন মনের মধ্যে বলল, এ নিতান্তই ভাগ্যের খেলা, অদৃশ্য অদৃষ্ট-দেবতাই এ পাথর ফেলে রেখেছেন পথের মধ্যে !

কিন্তু হতাশা বোধ করারও সময় নেই তখন। ঘোড়াটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখল তার আঘাত গুরুতর, সম্ভবত একটা পা ভেঙ্গে ফেলেছে বেচারী! তাকে সুস্থ ক'রে তুলে যাওয়া যাবে না, সারারাত অপেক্ষা করলেও না। সে চেষ্টাও সে আর করল না, সোজাসুজি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে শুরু করল নিজের পায়ের ওপর ভরসা ক'রেই।

তবু, মানুষের সাধ্যে আর ঘোড়ার সাধ্যে অনেক তফাৎ। ঘোড়ার দমের থেকে দমও কম তার। যে পথটা ঘোড়াতে চেপে গেলে এক প্রহরে চলে যাওয়া যেত সেই পথ যেতেই রাত দ্বিতীয় প্রহরও পার হয়ে গেল। আরও বাধা পেল শিবিরের কাছাকাছি পৌঁছে। অকস্মাৎ অন্ধকার পথে বহু অশ্বপদশব্দ শোনা গেল। সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী পথ, দুদিকে কোথাও সরে পড়ার জায়গা নেই। কারা আসছে তা যখন জানা নেই, তখন আত্মগোপন করাই ভাল। আর কোন উপায় না দেখে তাড়াতাড়ি একটা গাছের ওপর উঠে পড়ল রঘুজী। দেখল বিপুল এক বাহিনীই চলেছে, ঘোড়ার ওপরই বেশীর ভাগ— তিন-চারখানা শিবিকাও আছে। সশস্ত্র লোক সব, বেশ একটি সৈন্যদলের মতো এদের ভাবভঙ্গী, অথচ সঙ্গে আলো নেই, একটা মশাল পর্যন্ত কেউ আনে নি। কথাও কইছে খুব কম, সামান্য যা দু-একটা বলছে চাপা গলাতে। তবু তার মধ্যেই অকস্মাৎ একটা চেনা গলা কানে এল রঘুজীর। সঙ্গে সঙ্গেই বুকের মধ্যে একটা হিম হতাশা বোধ করল সে—এ দল মাতুশ্রী রাধাবাঈ-এর। নিশ্চয় তাঁরই বাহিনী ফিরছে পুনার দিকে।

কিন্তু এমন নিঃশব্দ গোপনে, এমন অন্ধকারে কেন?

তবে কি তাঁরা আক্রমণ ক'রে হেরে গেছেন—সেই পরাজয়ের লজ্জা ঢাকতেই এমন চুপিচপি এমন অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন? · না কি—

'না কি'টা যে কী হ'তে পারে তা আর ভাবতে পারল না রঘুজী। ভাবতে চাইল না। যেন কী এক ভয়ঙ্কর শত্রুর কাছ থেকে দূরে

সরে যেতে চাইছে এই ভেবেই সে চিন্তাটাকে দূরে ঠেলে দিয়ে আবার পাটাসের পথ ধরল। খুব জোরে দৌড়নোর ফলে মনটাকে যদি এক ঐ ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার চিন্তা থেকে দূর করানো যায়। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও আর দৌড়তে পারল না, কে যেন তার বুকের দম ও পায়ের বল দুই-ই হরণ ক'রে নিয়েছে।

বোধ করি সেই ভাগ্য-দেবতাই, যে পথের মধ্যে পাথরটা ফেলে রেখেছিল।

তার পর, পাটাসের শিবিরে পেঁ ৗছে আর কোন প্রশ্নই করতে হ'ল না কাউকে। যা জানবার তা জানা হয়ে গেল আশপাশের লোক দের উত্তেজিত আলোচনা থেকেই। দেখল খুশীই হয়েছে এরা, যেন এদেরই ব্যক্তিগত বিজয় লাভ হয়েছে একটা।·· আর বেশী দূর চলতে পারল না সে, এই গত দুদিনের সমস্ত ক্লান্তি পাহাড়ের মতো চেপে বসেছে তার ওপর—অবসন্নের মতো একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল পথের পাশেই।

বহু—বহুক্ষণ তেমনি বসে থাকবার পর মনে হ'ল পেশোয়াকে একবার দেখা দরকার। ছত্রপতির চিঠিটা আছে, তা থাক, সে চিঠি আর না দিলেও চলবে—কিন্তু আজ তাঁর এই অসহায় অবস্থার মধ্যে, একান্ত নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবনে সেবক একজন কাছে থাকা যে নিতান্ত দরকার। এ শিবিরে ওঁর জন্যই সকলে চিন্তিত, ওঁর কল্যাণ হবে মনে করেই তারা এত উৎফুল্ল, তবু এখানে ওঁর যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সমব্যথী একজনও নেই তা বুঝেছে রঘুজী। না জানি কি অপরিসীম দুঃখ একাই সইতে হচ্ছে তাঁকে, কী দুঃসহ বেদনা বহন করতে হচ্ছে।

স্খলিত মন্থর পা দুটোকে টেনে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল রঘুজী। তখন ভোর হয়ে গেছে, ঘর-বাড়ি চিনে বুঝে যাওয়া যায়। পেশোয়া কোথায় এ প্রশ্ন সে করল না কাউকে, এদের সঙ্গে কথা

কইতে ঘৃণা বোধ হ'ল তার। আন্দাজে আন্দাজে ওঁদের মহল খুঁজে নিল, আন্দাজে আন্দাজেই পেশোয়ার ঘর দেখে এক সময় তাঁর প্রিয়তমার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই পেশোয়া বেরিয়ে আসছেন সে ঘর থেকে। ততক্ষণে বেশ আলো হয়ে গেছে চারদিকে, দেখার কোন অসুবিধা হ'ল না, ভাল ক'রেই সে চেয়ে দেখল পেশোয়ার দিকে। দেখে চমকে উঠল রঘুজী। অনেক কিছুই দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিল সে—কিন্তু ঠিক এ দৃশ্য নয়। মানুষের মুখে এক রাত্রে এত পরিবর্তন হ'তে পারে জানা ছিল না তার। বহুদিন থেকেই শীর্ণ ও রুগ্ন দেখছে সে পেশোয়াকে, রক্তহীন ও বিবর্ণ হয়েছে তাঁর মুখ বেশ কিছুদিন আগে থেকেই—কিন্তু এমন বিবর্ণতা এমন শ্রীহীনতা যে চিন্তারও বাইরে। সর্বস্বহারার হতাশা ও দৈন্য কী নিষ্ঠুর ছাপই না এঁকে দিয়েছে সামান্য একটি প্রহরে।

পেশোয়ার দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ছিল, তিনি ওকে দেখতে পেলেন না, কিন্তু পাশ দিয়েই চলে গেলেন বলে রঘুজী ওঁর আর্দ্র পল্লব লক্ষ্য করল। কিন্তু বিস্মিত হ'ল না সে। নিজের মন দিয়ে অপরের মন অনেকখানি বোঝা যায়। নিজের হতাশা দিয়ে ওঁর হতাশার পরিমাণ করতে পারছে সে। যে নারী ওঁর এতকালের নিত্য সঙ্গিনী ও সেবিকা ছিল তাকে সে দেখেছে। সে মেয়েকে যে এমন আপন ক'রে পেয়েছে সে এমনি আঘাতই পাবে বৈকি তাকে হারিয়ে। এ তো ক্ষণেকের বিরহ নয়—হয়ত বা চিরকালের মতোই হারানো।

ঠিক সেই তখনই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের কোন চেষ্টা করল না রঘুজী; অকারণে লজ্জা পাবেন হয়ত। একটু সামলে নেবার সময় দিল সে। বাইরের সূর্যালোকে এসে পেশোয়া নিজেই সম্বিৎ ফিরে পেলেন, তাড়াতাড়ি চোখ মুছে মুখের প্রশান্তি ফিরিয়ে আনবারও চেষ্টা করলেন খানিকটা। সেই অবসরে রঘুজী তাঁর সামনে গিয়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল।

'কে ? কী চাও ?' রূঢ়, বিরক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন পেশোয়া।

'আমি রঘুজী, ছোট রানীসাহেবার সেবক !'

রঘুজী! নামটা খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে না ? ও হ্যাঁ হ্যাঁ— মস্তানীর মুখেই তো শুনেছেন···ছোটরানীসাহেবা—মানে মস্তানী !

চকিতে মনে পড়ে গেল কথাটা। দৃষ্টি কোমল ও প্রসন্ন হয়ে উঠল। ছোট রানীসাহেবা বলাতে যেন একটু কৃতজ্ঞও বোধ করলেন ওর কাছে। বললেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মস্তিকে তুমি ভালবাসো, তাকে তুমি দিদি বলেছ। কিন্তু—কিন্তু বড় অসময়ে এলে যে ভাই ! সে তো আর নেই !'

'ছত্রপতি পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে—দিদিকে আর আপনাকে সাতারায় তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। সেইমতো আদেশনামা নিজে হাতে লিখে দিয়েছিলেন। সে চিঠি আমার কাছেই আছে এখনও—দেখবেন আপনি ?'

কেমন যেন খাপছাড়া খাপছাড়া ভাবে বলে রঘুজী।

'তাঁর পত্র সকল অবস্থাতেই আমার শিরোধার্য—কিন্তু আর কি হবে এখন সে চিঠি !' হৃদয়াবেগ সংযত ও মনোভাব গোপন রাখার দীর্ঘকালের .অভ্যাস সত্ত্বেও, একটা দীর্ঘশ্বাস কিছুতেই চাপতে পারেন না, সেটা ঢাকতেই বুঝি হাত বাড়িয়ে দেন, 'কৈ দেখি সে চিঠি !'

চিঠি পড়তে পড়তে আবারও সেই শুষ্ক কঠিন চোখ বুঝি সজল হয়ে আসে পেশোয়ার, ঝাপ্‌সা হয়ে আসে দৃষ্টি। চিঠি দুটো মাথায় ঠেকিয়ে বলেন, 'তিনি আমার পিতৃবন্ধু, ওর পিতা। তাঁর উপযুক্ত কাজই করেছেন। তবু এ ঋণ কখনও ভুলব না। হয়ত এ জন্মে আর এ ঋণ শোধের অবসর বিশেষ থাকবে না, তাঁকে ব'লো যে এ কৃতজ্ঞতা আর ঋণ সগৌরবে সানন্দে পরজন্ম পর্যন্ত বহন করবে তাঁর সেবক সন্তান বাজীরাও।'

যেন চলে যাবার জন্যই ঘুরে দাঁড়ান—তার পরই মনে পড়ে যায়

কথাটা, বলেন, 'দাঁড়াও—তোমার কিছু পুরস্কার প্রাপ্য। আর একটু বিশ্রামের ব্যবস্থাও—'

যেন চমকে শিউরে ওঠে রঘুজী, 'না না না, কোন পুরস্কার আমার প্রাপ্য নেই। হতভাগ্য আমি—একপ্রহর আগে এসে পৌঁছুতে পারলুম না! আমারই দোষ, ঘোড়াটা শেষ মুহূর্তে পাথরে চোট লেগে পা ভেঙ্গে পড়ে গেল, প্রাণপণে দৌড়েও ঠিক সময়ে আসতে পারলুম না।'

হাহাকারের মতো করুণ শোনায় তার কণ্ঠ।

পেশোয়া একটু এগিয়ে এসে—যা কখনও করেন না সামান্য পরিজনদের বেলায়—সস্নেহে ওর কাঁধে একটা হাত রাখেন, বলেন, 'দোষ আমার ভাগ্যের ভাই, তোমার কোন দোষ নেই। তুমি অনেক কষ্ট করেছ, অনেক চেষ্টা করেছ, পুরস্কার ঠিকই প্রাপ্য হয়েছে তোমার।'

তিনি একটু ইতস্তত ক'রে—আঙরাখার জেবে হাত ঢুকিয়েও টেনে নেন, হাত বাড়ান নিজের গলার প্রবালের মালাটার দিকে।

রঘুজী বোধ করি দুঃখে ক্ষোভে দিশেহারা হয়েই সাহস সঞ্চয় করে শেষ মুহূর্তে। দুহাত জোড় ক'রে বলে, 'প্রভু, মালিক, যদি পুরস্কার দেনই তো ওসব কোন সম্পদ নয়, আমাকে আমার প্রার্থিত পুরস্কার দিন।'

বিস্মিত হন বাজীরাও। ভ্রূও কুঞ্চিত হয় বোধ করি ঈষৎ। এ ধরনের বাধা পাওয়ায়, উত্তর-প্রত্যুত্তরে ঠিক অভ্যস্ত নন তিনি। তবু কোনপ্রকার বিরক্তি প্রকাশ না ক'রেই বলেন, 'বলো, তোমার কি প্রার্থনা— ?'

'আমাকে আজ থেকে আপনার সেবার অধিকার দিন, কাছে কাছে থাকতে দিন আমাকে। শুধু এইটুকু—আর কিছু নয়।'

ছলাৎ ক'রে যেন গরম জল খানিকটা উপ্‌চে উঠতে চায় কোটরগত চোখের কোলে কোলে। পেশোয়া কি এর সামনেই এই

সামান্য মানবজনোচিত দুর্বলতা·প্রকাশ ক'রে ফেলবেন শেষ পর্যন্ত! হে ভগবান গণপতি, সে দীনতা থেকে রক্ষা করো অন্তত!

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে সামলে নেন নিজেকে। তারপর গাঢ় কণ্ঠে বলেন, 'কিন্তু ছত্রপতি ? তাঁর কাছে ফিরে যাবে না।'

'তাঁর শতসহস্র সেবক আছে; আমার জন্য কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না তাঁর। তাঁর অসীম করুণা, আমার প্রাণ রক্ষার জন্যই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর কোন প্রয়োজনে নয়। আর আপনার সেবা তো তাঁরও সেবা, আপনার কাছে আছি জানলে তিনি খুশীই হবেন।'

আবারও একটা নিঃশ্বাস ফেলেন বাজীরাও, কিন্তু এ নিঃশ্বাস দুঃখের নয়। অস্ফুট কণ্ঠে প্রায় মনে মনে বলেন, 'বুঝেছি মস্তি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো নি। তোমারই উদ্বেগ তোমারই দুশ্চিন্তা এর উৎকণ্ঠা আর আগ্রহের রূপ ধরে এসেছে!'

তারপরই এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ক'রে বসেন তিনি। রঘুজীকে দুহাতে টেনে একেবারে নিজেব রোগ-ও চিন্তা-শীর্ণ বুকে চেপে ধরে বলেন, 'সেবক নয় ভাই, আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু, আমার যথার্থ ছোট ভাই। কিন্তু তবুও বলছি, তুমি সাতারাতেই ফিরে যাও। আমার জন্মলগ্নের বিধি-নির্দেশ, আমার ওপর অভিশাপ,—শেষ সময়ে আমার কাছে আমার কোন আপনজন থাকবে না। আজ আর কেউ আমার আপন নেই দেখছ না! একমাত্র যে ছিল তাকেও হারাতে হ'ল। তুমি থাকলে তোমার হয়ত আবার কোন অনিষ্ট হবে, সে আমি সইতে পারব না। মস্তি তোমাকে যথার্থ ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করে। তুমি ছত্রপতির কাছে থাকো—কে জানে, সেখানে থাকলে হয়ত এখনও তোমার দিদির কোন উপকার হ'তে পারে, তার কোন কাজে লাগতে পারো তুমি। আমার কাছে থাকলে তো তা হবে না।'

তবু রঘুজী ব্যাকুল কণ্ঠে কি বলতে যায়, বাধা দিয়ে ম্লান একটু হেসে বলেন, 'মনে করো এইটেই আমার সেবা। আর যদি তোমার

দিদির কোন উপকারে লাগতে পারো—তার চেয়ে আমার প্রিয়সাধন আর কি আছে!'

আর কোন কথারও অবসর থাকে না। একজন রক্ষী ঘোড়া নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ইতিমধ্যে, রঘুজীকে আর কোন উত্তরের অবকাশ না দিয়ে পেশোয়া ঘোড়ায় চেপে বসেন একেবারে।

দেখতে দেখতে তাঁর ঘোড়া অন্য সমস্ত অনুসঙ্গীকে পিছনে ফেলে বহু দূর এগিয়ে যায়।

॥ ২০ ॥

'জনার্দন!' 'জনার্দন'! চাপা আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন বাজীরাও।

বালক জনার্দন পন্থ নিদ্রালু চোখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে—ওঘর থেকে ছুটে আসেন কাশীবাঈ।

'এই যে, এই যে বাপুজী, এই তো আমি।'

'আলো, আলো—আরও আলো জ্বালাও জনার্দন, দিনের আলো ক'রে দাও ঘরে। নইলে—নইলে আর যে আমি পারছি না!'

বিকৃত ভগ্নকণ্ঠে বলেন বাজীরাও। প্রবলপ্রতাপ পেশোয়া প্রথম বাজীরাও। যিনি জলদ্‌মন্দ্র কণ্ঠের জন্য বিখ্যাত—তাঁর গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না, কেমন যেন অদ্ভুত রকম ভেঙ্গে গেছে। চেঁচাবার শক্তি নেই—তবু চেঁচাবারই চেষ্টা করছেন প্রাণপণে। ফলে অদ্ভুত শোনাচ্ছে গলাটা নিজের কাছেই, নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছেন নিজের ক্ষীণ কণ্ঠে।

এইবার নিয়ে তিন বার হ'ল আজ রাত্রে। ক'রাত্রিই হচ্ছে এই রকম। বোধ হয় চারদিন হ'ল পর পর। দিনে রাতে ঘুমোতে পারছেন না একবারও। কী যেন সব বিভীষিকা দেখছেন, দিনের বেলা বলেন ঘরের দরজা জানলা সব খুলে দিতে, রাত্রে বলেন কেবল আলো জ্বালাতে। আরও আলো। সন্ধ্যায় কিছু হয় নি,

রাত গভীর হ'তেই শুরু হয়েছে পাগলামি। এইটুকু ঘর—ঘরই তো পাবার কথা নয়, তাঁবুর ছাউনি ফেলে ফেলেই তো বেড়াচ্ছেন। এই কঠিন অসুখটা হবার খবর পেয়ে যখন কাশীবাঈ এলেন, তিনিই খোঁজ-খবর ক'রে এক ব্রাহ্মণের এই বাড়িটি খালি করিয়ে নিলেন তাকে টাকাকড়ি দিয়ে। দুটি মাত্র ঘর এ বাড়িতে, নিতান্তই সাধারণ বাড়ি, ঘরও সাধারণ মাপেরই—দুটি শয্যা পড়ে আর খুবই সামান্য জায়গা খালি আছে। পাশের ঘরে কাশীবাঈ আর তাঁর দাসী থাকেন—এছাড়া আর একটুও কোথাও জায়গা খালি পড়ে নেই। নিতান্ত এই বাড়িকে কেন্দ্র ক'রে অসংখ্য স্কন্ধাবার পড়েছে চারিদিকে —শিবিরের নগরী তৈরী হয়ে গেছে তাই রক্ষে, লোকজন সেবক অনুচর সকলকেই হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে। নইলে এমন বাড়িতে তো একটা দিনও থাকতে পারতেন না মহিষী কাশীবাঈ।

তাও, এই ঘরেও বড় বড় ঝাড়ে বোধ হয় দু'শো বাতি জ্বালানো হয়েছে, অসহ্য তাপে ঘরে থাকাই দায় হয়ে পড়েছে এদের। বালক জনার্দন ঠিক স্নান করার মতো ঘেমেছে ; কাশীবাঈয়ের জামা কাপড় ভিজে সপসপ করছে তবু তিনি তো এ ঘরে থাকছেন না বেশীক্ষণ। তাঁর উপস্থিতিটা যে স্বামীর বিশেষ প্রীতিকর বা সুখকর নয়—তা তিনি জানেন। তিনি তাই পাশের ঘরেই থাকছেন সাধ্যমতো। তবু যা দু'-একবার আসতে হচ্ছে তাতেই অসহ অবস্থা। দোর জানলা সব খোলা আছে, বাজীরাও-এর চোখের সামনের দরজাটা দিয়ে সোজা নর্মদা পর্যন্ত অবারিত খোলা সমস্তটা, তিনি নদীর দিকে চেয়ে থাকতে চান এবং একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দরকার বলেই ওই দরজার সামনে কোন তাঁবু ফেলতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু তাতেও ঘর কিছু মাত্র ঠাণ্ডা হচ্ছে না। প্রথম বৈশাখের অগ্নিঝরা দিবসের শেষ উষ্ণ-নিঃশ্বাসটুকুর মতো মধ্যে মধ্যে এক আধ ঝলক যা বাতাস আসছে তাও গরম। নইলে প্রকৃতি একেবারে যেন স্থির হয়ে আছে, যাকে বলে নিবাত নিষ্কম্প। এর মধ্যে আবার কোথায় আলো জ্বালা হবে ?

কাশীবাঈ কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে বলেন, ‘ছ’শো মোমবাতি জ্বলছে মালিক, এর পর আবার আলো জ্বাললে তো আপনি গরমেই ঘুমোতে পারবেন না। আপনি বরং চোখ বুজুন, আমি বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিই—।’

‘না থাক। তুমি শোওগে।’ কেমন যেন অভিমানাহত স্বরে বলেন পেশোয়া, কতকটা বায়নাদার ছেলেমানুষের মতোই, ‘আমার এখন ঘুম হবে না, চেষ্টা করলেও। আমি জেগেই থাকব। জনার্দন, ওদের বলো তো এই দরজা থেকে ঐ নর্মদা পর্যন্ত সার সার মশাল জ্বেলে দিক্—আমি একটু চেয়ে থাকি। অন্ধকাব আমার মোটেই ভাল লাগছে না।’

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কাশীবাঈ এ ঘবে চলে এলেন। আর দেরি নেই, মোটেই দেরি নেই। সকাল থেকেই এই গলাটা ভেঙ্গেছে। বুকে সর্দি বসেছে চেপে—সাঁই সাঁই শব্দ উঠছে নিঃশ্বাসেব সঙ্গে সঙ্গে। এসব লক্ষণ তিনি জানেন। তাঁর পিতামহ যখন মাবা যান তখন তিনি খুব ছোট। তবু সব মনে আছে তাঁর। এই সব লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর বেলাতেও। তিনি কালই লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন বিশেষ ফর্মান দিয়ে, ঘোড়ার আর ঘোড়-সওয়ারের ডাক বদলে বদলে যাবে, সংবাদ থামবে না কোথাও। খবর পাঠিয়েছেন তিনি দেবর আস্তাজীর কাছে আর বড় ছেলে বালাজীর কাছে কোলাবায়। এসে পড়ুক তাবা, এসে পড়া দরকার—দু’-একদিনের মধ্যেই অন্তত। যেন ঠিক সময়ে এসে পেঁাছতে পারে—মনে মনে বোধ করি এই সহস্রবারের মতো প্রার্থনা জানালেন ভগবান বিনায়কের কাছে।···

স্বামীর একেবারে এই অন্তিম সময়ে পাশে থাকাই উচিত, সকলেই তাই বলবে। কাশীবাঈও তা জানেন। কিন্তু দুটি প্রবল কারণে থাকতে পারছেন না। প্রথমত তাঁর উপস্থিতি প্রেয় নয়

স্বামীর কাছে। স্বামীর এই দশার প্রত্যক্ষ কারণ যা-ই থাক, তার পরোক্ষ অথচ মুখ্য কাবণ যারা—তাদের মধ্যে কাশীবাঈও একজন। তাঁর প্রিয়তমা, পুরুষসিংহের উপযুক্ত সিংহিনী, ভারত-ত্রাস পেশোয়া বাজীরাও-এর যোগ্য সঙ্গিনী মস্তানীকে তাঁরা জোর ক'রে সরিয়ে দিয়েছেন পেশোয়ার কাছ থেকে। অজুহাত স্বাস্থ্যের—কিন্তু সে স্বাস্থ্য কি রক্ষা করা গেল আদৌ ? বরং বাঁচাতে গিযে তো আরও জোর ক'রে ঠেলে দিলেন তাঁরা মৃত্যুর মুখেই। কাশীবাঈ ক'দিন আগে এসে পর্যন্তই—নিজেকে নিজেই স্বামীহন্ত্রী বলে ধিক্কার দিচ্ছেন মনে মনে। যা করবার তা তো কবেইছেন, শেষ ক'রেই তো এনেছেন অমিতবীর্য মানুষটাকে—এর পর শেষ সময়টাতে আর অপ্রীতিব কাবণ ঘটিয়ে লাভ কি ?

আরও একটি কারণ আছে ও ঘবে না যাবার।

স্বামীর দিকে চাইতে পাবছেন না তিনি।

ঐ যে সূক্ষ্ম চামড়ায় ঢাকা কঙ্কালটা পড়ে আছে—ঐ কি তাঁব সেই ভুবনমোহন সুন্দর স্বামী ? সেই পেশোয়া বাজীরাও, যাঁর রূপেব খ্যাতি সারা ভারতে—এই মাত্র বৎসর-কতক আগেও—আলোচনার বস্তু ছিল ! যাঁকে দেখার জন্য মুঘল অন্তঃপুর থেকে শুরু ক'রে নিজামের হারেম পর্যন্ত সমস্ত পুরনাবী আকুল হয়ে উঠেছিলেন ! যার জন্য, অন্তঃপুরিকাদের ঐকান্তিক অনুরোধে স্বয়ং দিল্লীশ্বর বাদশা মুহম্মদ শাহ্‌কে সুদূর দাক্ষিণাত্যে শিল্পী পাঠাতে হয়েছিল এঁর ছবি এঁকে নিয়ে যাবার জন্য ! এই সেই দুর্ধর্ষ বীর, দীর্ঘদেহ বিশ্বখ্যাত কান্তিমান্ পেশোয়া বাজীরাও ?

এ যে দেখেও বিশ্বাস হয় না।

চাইতে পারেন না, চাইতে পারছেন না কাশীবাঈ খাটটার দিকে—দিনে রাতে কখনও ভাল ক'রে চেয়ে দেখতে পারেন না। দেখতে গেলেই চোখ জ্বালা করে' দু'চোখে জল ভরে আসে, ঝাপ্‌সা হয়ে যায় দৃষ্টি।

এ কী হাল হ'ল পেশোয়া বাজীরাও-এর।

এ কী করলেন তিনি! কী করলেন তাঁরা!

তাঁরা কি প্রকাণ্ড একটা ভুলই ক'রে বসলেন না শেষ পর্যন্ত—তিনি আর তাঁর শশ্রুমাতা রাধাবাঈ?

চিরকালের মতো একটা অনুশোচনারই কারণ হয়ে রইল না কি তাঁদের এই কাজ?

ভাবেন আর নিঃশব্দে ললাটে করাঘাত করেন কাশীবাঈ।

'জনার্দন!' স্খলিত ভগ্ন কণ্ঠ আরও যেন চেপে আসছে ক্রমে ক্রমে। পাশে বসেই শোনা কষ্টকর। গলা কেমন জড়িয়েও যাচ্ছে কথা কইতে গেলে! আরও ক্ষীণ আরও করুণ শোনাচ্ছে কথাগুলো।

তবু জনার্দন শুনতে পায়। সে পাশেই বসে ছিল তার বাপুর একটা হাত নিজের দু'হাতে ধরে। সে মুখ নামিয়ে পেশোয়ার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'কি বলছেন বাপুজী!'

'এখন ক'টা বাজল বলতে পারো?'

'এই মাত্র রাত চারটের ঘণ্টা পড়ল কোথায় বাপুজী, ভোর হবার আর দেরি নেই। পূর্বাকাশ ফরসাও হয়ে এসেছে!'

'এসেছে? আঃ, বাঁচা গেল। নর্মদার জল দেখতে পাচ্ছ জনার্দন?'

'পাচ্ছি বাপুজী।··মশালগুলো এবার সরিয়ে নিতে বলব?'

'আর একটু, আর একটু পরে।'

ক্লান্তিতে কিম্বা স্বস্তিতে—কিম্বা দুই কারণেই—চোখ বুজলেন বাজীরাও। জ্বরটা কমে আসছে, সর্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিয়েছে। আঠার মত চট্‌চটে ঘাম। পা দুটো যেন হিম হয়ে আসছে ক্রমশ। এ সব লক্ষণ জানেন বাজীরাও। টের পাচ্ছেন নিজেই। একটু একটু ক'রে এগিয়ে আসছে মৃত্যু, এগিয়ে আসছে মুক্তি। আর দেরি নেই, এবার সব জ্বালার অবসান আসন্ন! শুধু যদি এই শেষ মুহূর্তে একবার মস্তিকে দেখতে পেতেন—

আঃ। আবার ঐ কথা! তার কথা আর ভাববেন না বলে তিনি যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এ তো শুধু মুক্তির দিনই নয়—তার সঙ্গে মিলনেরও দিনও যে। সে বলেছে এ জন্মে বা জন্মান্তরে সে ওঁরই, জীবনে মরণে ওঁর সেবিকা। কারও নাকি সাধ্য নেই তাকে ওঁর কাছ থেকে চিরদিনের মতো দূরে সরিয়ে রাখতে পারে—। তবে, তবে তার কথা ভাববেন কেন তিনি ?

অতি কষ্টে আস্তে আস্তে বাজীরাও পাশ ফিরলেন। অথবা বলা উচিত—এতক্ষণ বাইরের দিকে, নদীর দিকেই পাশ ফিরে শুয়েছিলেন—এবার সোজা হয়ে, চিৎ হয়ে শুলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই ছাদটা নজরে পড়ল। কুৎসিত শ্রীহীন ছাদ। প্রকাণ্ড কাঠের কড়ি দু'খানা—কালো রং মাখানো। কড়ি বা দেওয়ালের মধ্যে বড় বড় পাথর বসানো ছাদ। একদা তাতে চুনকাম করা হয়েছিল—কিন্তু এখন কালি ও ঝুলে সে চুনের শ্বেতগরিমা বিলুপ্ত হতে বসেছে। এত কালি ছিল না অবশ্য—এই গত চারদিনেই পড়েছে এটা। এইটুকু ঘরে এত আলো ও মশাল, কালি তো পড়বেই। যারা আসে তাদেরই চোখ জ্বালা করে ধোঁয়ায়—এত ধোঁয়া! সবই জানেন পেশোয়া, তবু আরো আলো জ্বালাতে বলেন। আরো আলো। কেবলই মনে হয়, অন্ধকার হ'লেই সে আসবে, সেই বালক শ্রীপৎ। একটুও অন্ধকার করা চলবে না তাই, কোথাও এতটুকু অন্ধকার রাখা চলবে না।

তবু, তাকে কি আটকাতে পারবেন ? সে আসবেই। সে যা যা বলেছিল সবই তো ফলে গেল।

সে বলেছিল, 'এত কাণ্ড ক'রে যে প্রাসাদ তৈরী করছ সে প্রাসাদে শান্তিতে বাস করতে পারবে না কোনদিন। মৃত্যুকালে শেষ নিঃশ্বাসটুকুও ফেলতে পারবে না এখানে। দূর প্রবাসে পরের ঘরে নির্বান্ধব অবস্থায় মরতে হবে। অন্তিমকালে, যারা প্রাণাধিক প্রিয়, তাদের কারও দেখা পাবে না।'

আর বলেছিল, 'আমি যেখানেই থাকি, যে জন্মই নিই আবার, মৃত্যুকালে আমাকে ভুলতে পারবে না। আজ লুকিয়ে রইলে, কিন্তু শেষ সময়ের সেই শান্তি ও সুপ্তি বিঘ্নিত করতে ঠিক এসে হাজির হবো আমি। একটুও শান্তি পাবে না, অব্যাহতি পাবে না অনুতাপের জ্বালা থেকে।'

সেদিন শক্তিমদে মত্ত হয়ে মনে হয়েছিল পেশোয়ার যে কথাগুলো কথার কথা শুধু। মনে হয়েছিল বালকের ব্যর্থ আস্ফালন। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আরও অতটা গ্রাহ্য করেন নি, কারণ তিনি ঠিক দায়ীও তো ছিলেন না ঘটনাটার জন্য। মনে হয়েছিল ঈশ্বর অন্তর্যামী—তিনি সত্যটা উপলব্ধি করবেন। পেশোয়ার মনের কথাটা বুঝবেন অন্তত।

আজ বুঝছেন ঈশ্বর সত্যিই অন্তর্যামী, সত্যটা ঠিকই উপলব্ধি করেছেন। বাজীরাও ঠিক দায়ী ছিলেন না—কিন্তু কাজটা বন্ধ করতে পারতেন। বাধা দিতে পারতেন সেই শেষ সময়েও। না হয় বিলম্বিত হ'ত প্রাসাদের ভিত্তিস্থাপন। না হয় হ'তই না! কিন্তু একটা নিষ্পাপ নিরপরাধ প্রাণ রক্ষা হ'ত! পেশোয়াকে অমন ক'রে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে মাথা হেঁট করতে হ'ত না!

আজও মনে আছে শ্রীপৎরাও-এর সে দৃষ্টি। একই সঙ্গে কি পরিমাণ বিস্ময় ও বেদনা ফুটে উঠেছিল সরল ডাগর তার দুটি চোখে —যেন বিশ্বাস হ'তে চাইছিল না কথাটা। আর যখন বিশ্বাস হ'ল কী পরিমাণ ধিক্কার ভরে এল সেই দৃষ্টিতেই। নীরব ও নিঃশব্দ ধিক্কার।

সেই প্রথম আর সেই বোধহয় শেষ, লজ্জাতে মাথা হেঁট করতে হয়েছিল পেশোয়া প্রথম বাজীরাওকে।

আজ সমস্ত স্মৃতি মুছে গিয়ে সেই কটা দিনের কথাই বা এমন ক'রে মনে পড়ছে কেন? এই বিশ বৎসরের বহু বিজয়, বহু

গৌরবের অসংখ্য ঘটনা সব যেন লুপ্ত হয়ে গেছে মন থেকে—শুধু সেই দিনটার কথাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে আরও—

সে কী এই সামান্য গৃহে, পরাশ্রয়ে, এই কষ্টকর শয্যায় শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হচ্ছে বলে? তাঁর অত সাধের এবং সকলের ঈর্ষার বস্তু শানওয়ার-ওয়াডা থেকে এতদূরে এমন দীন দরিদ্রের মতো এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে বলে?

শানওয়ার-ওয়াড়া—শনিবারের প্রাসাদ। যার খ্যাতি তাঁর মনিব স্বয়ং ছত্রপতি শাহুকে পর্যন্ত বিচলিত করেছিল! তিনি আর কোন যুক্তি না পেয়ে বাদশার দোহাই দিয়েছিলেন, বলেছিলেন উত্তর দিক বা দিল্লীর দিকের ফটকটা বাকী থাক, নইলে বাদশা কি ভাববেন! বাদশার গৌরব ম্লান হয়ে যাচ্ছে যে! সেই কারণেই উত্তর দরওয়াজা অসম্পূর্ণ রাখতে হয়েছিল—আজও তেমনি পড়ে আছে সেটা। কিন্তু তা হোক, তবু এমন প্রাসাদ বোধকরি সারা দক্ষিণ ভারতে আর নেই। এ প্রাসাদ শেষ করতে বিপুল ঋণ করতে হয়েছে তাঁকে—কিন্তু তার জন্য অনুতপ্ত নন তিনি। শুধু যদি সেই প্রাসাদে এই শেষ নিঃশ্বাসটা ফেলতে পারতেন!

অবশ্য পারলেন না যে—সেও তো এই প্রাসাদের কারণেই। ঐ প্রাসাদকে সুদৃঢ় করতে, তাঁর বংশের প্রভাবকে চিরস্থায়ী করতেই তো—

আজও মনে আছে কথাটা।

ইচ্ছাটা জেগেছিল বহুদিনই। সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। মনের মতো জায়গাও খুঁজছিলেন। পুণাটাই পছন্দ ছিল মনে মনে—প্রথমত দুটো নদী দু'দিকে, দ্বিতীয়ত কাছেই দুটো বড় বড় দুর্গ—সিংহগড় আর পুরন্দর।

যেদিন দিনটা স্থির করেন, সেদিনটাও শনিবার, বেশ মনে আছে তাঁর। ঘোড়ায় চেপে ঐ দিকটা দিয়ে যাচ্ছিলেন, মুটানদীর ধারে ধারে। একটা পাঠান আমলের ভাঙ্গা প্রাসাদ দুর্গ ছিল। বহুদিনের

দুর্গ—বন জঙ্গল এবং বন্য জন্তুর বাসগৃহে পরিণত হয়েছিল। এ দুর্গ আগেও বহুবার দেখেছেন যাতায়াতের পথে, সেদিন কী হ'ল—সেই দিকেই ঘোড়া চালালেন। প্রাসাদ-দুর্গের ভাঙ্গা ফটক পেরিয়ে ভেতরের প্রাঙ্গণে পড়তেই অকস্মাৎ তাঁর ঘোড়া—এতদিনের শিক্ষিত ও সতর্ক ঘোড়া, এর আগে ও পরে বহু যুদ্ধজয়ের সাক্ষী সে—সম্পূর্ণ অকারণেই পা দুমড়ে পড়ল এবং তিনিও ছিটকে পড়লেন মাটিতে। সৌভাগ্যক্রমে খুব লাগে নি কারুরই। বিরক্ত ও বিস্মিত হ'য়ে হাতে ভর দিয়ে উঠতে যাবেন বিচিত্র এক দৃশ্য চোখে পড়ল তাঁর। না, স্বপ্ন নয়, মায়াও নয়—মতিভ্রম তো নয়ই, সোজা চোখ চেয়েই দেখেছিলেন তিনি—এখানকার বাসিন্দা একটা খরগোশ একটা প্রকাণ্ড কুকুরকে তাড়া করেছে আর সে কুকুর প্রাণভয়ে দৌড়োচ্ছে!

এ দুটো ঘটনাই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হ'ল তাঁর, মনে হ'ল ভগবান গণপতিরই প্রত্যক্ষ নির্দেশ। অকারণে এইখানকার মাঠে এসে পড়লেন, মানে এই মাটিই তাঁর ভাগ্যদেবতা চিহ্নিত ক'রে রেখেছেন তাঁর জন্য। আর ঐ যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন তার অর্থ এই মাটিতে যে বাস করে বা করবে সে অপরাজেয়। সে সামান্য প্রাণী হ'লেও বৃহত্তর প্রাণীরা তাকে ভয় ক'রে চলবে।

সেই মুহূর্তেই মন স্থির ক'রে ফেললেন।

সেই প্রাচীন দুর্গ আর দু'পাশের দুটি ছোট গ্রাম চেয়ে নিলেন ছত্রপতির কাছ থেকে, তারপর সেই বিপুল জায়গা জুড়ে এই বর্তমান প্রাসাদ উঠল।* বিচিত্র ব্যাপার এই যে—প্রাসাদের স্থান নির্বাচন, বাস্তু যজ্ঞ, গৃহনির্মাণ শুরু এবং শেষ যেদিন হ'ল—প্রত্যেকটাই শনিবার। এ সবই দৈবের যোগাযোগ, পরিকল্পিত কিছু নয়। আরও সেই জন্যই কতকটা তিনি নাম রেখেছিলেন প্রাসাদের, শনিবারের প্রাসাদ—এবং বোধ করি সেই জন্যেই, গোড়া থেকে শনির দৃষ্টি এসে

* ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রাসাদটি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে

পড়ল—একদিনের জন্যও সুখ কি শান্তি পেলেন না ঐ বাড়ি হওয়ার পর থেকে।

কিন্তু সেই শনির দৃষ্টি কি তিনিই টেনে আনলেন না বলতে গেলে!

কী কুক্ষণে যে পুরোহিত বিধান দিয়েছিল নরবলি বা জীবন্ত নরসমাধি দেবার, বলেছিল ধরিত্রীদেবতাকে তৃপ্ত করতে হ'লে একটি ব্রাহ্মণ বালকের প্রাণ নিবেদন করতে হবে। বুঝিয়েছিল যে তাকে জীবন্ত সমাধি দিয়ে যক্ষ ক'রে রাখলে সে-ই চিরদিন এই প্রাসাদ পাহারা দেবে, কোন শত্রু কোনদিন ঘেঁষতে পারবে না এদিকে!

সে না হয় মূর্খ কিন্তু বাজীরাও তো মূর্খ নন। তিনি রাজী হলেন কী ক'রে! এ কী দুর্বুদ্ধিতে পেয়ে বসেছিল তাঁকে। ছি-ছি-ছি, আজও কথাটা মনে হ'লে লজ্জায় মাথা কাটা যায় তাঁর নিজের কাছেই। চিরদিনের মতো রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয় তাঁর। মনে হয় এ গুরুভার বহনের তিনি অনুপযুক্ত, এ আসন তিনি কলঙ্কিত করেছেন।

নিয়তি। নইলে এত ব্রাহ্মণ বালক থাকতে শ্রীপৎকেই বা ওরা ধরে আনবে কেন!

শ্রীপৎও অকস্মাৎই আবির্ভূত হয়েছিল ওঁর জীবনে।

সেই ভাঙ্গা দুর্গে—সেই প্রথম দিনটিতেই, মাটিতে পড়বার সময়।

অবাক হয়ে বসে বসে শশক আর কুকুরের বিচিত্র অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছেন—কে যেন খিলখিল ক'রে হেসে উঠল কোথা থেকে।

কেউ ছিল না এ দুর্গের ধারে কাছে, যখন ফটক পেরিয়ে ভেতরে পা দেন বাজীরাও। তবে এ হাসি কে হাসল? দুর্ধর্ষ বীর বাজীরাও-এরও সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তারপরই চোখে পড়েছিল অবশ্য।

একটি দশ-বারো বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে হাসছে। দীন মলিন বেশ, কতকটা চাষীর ঘরের ছেলের মতোই—

কিন্তু কানে কুণ্ডল, কপালে চন্দন তিলক এবং খাটো পিরানের মধ্য থেকে যজ্ঞোপবীতটাও দেখা যাচ্ছে।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ।

আরও দেখলেন, ওদিকের পোড়ো ভিটেগুলোর গা ঘেঁষে গোটা দুই-তিন গোরুও চরছে—শীতের তৃণ-শূন্য প্রান্তরে খাদ্যের আশা নেই দেখে গোরুগুলোকে নিয়ে এখানে ঢুকেছে, পোড়ো ভাঙ্গা দেওয়ালগুলোর খাঁজে খাঁজে যে আগাছার জঙ্গল গজিয়েছে, যদি সেখান থেকে খাওয়ার মতো কিছু পায় এই আশায়। গরুগুলো শীর্ণ কঙ্কালসার। ছেলেটাও প্রায় তাই। কোন হতদরিদ্র ঘরের ব্রাহ্মণ সন্তান, প্রাণের দায়ে রাখালের বৃত্তি গ্রহণ করেছে।

কিন্তু ওর ঐ বেশভূষা, চেহারা এবং গোরুগুলোর সঙ্গে বর্তমান হাসিটা একেবারেই বেমানান। এ হাসি স্পর্ধিতের হাসি,—সমানে সমানে যেমন হাসি চলে তেমনি। ও ছোকরা কি তাঁকেও ওর সমগোত্রীয় ভাবল নাকি? খুব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন পেশোয়া। কাছে এসে ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, 'এই! অত হাসছিস কেন?'

সে ভ্রূভঙ্গী ও সে কণ্ঠস্বরে বোধ করি খোদ নিজাম-উল-মুলুকের প্রাণও কেঁপে উঠত কিন্তু ছেলেটি নির্বিকার। আরও খানিকটা হেসে নিল সে। বলল, 'হাসব না, বা রে! কী রকম বোকার মতো পড়লে তুমি—কোন কারণ নেই, পাথরে ঠোকরও খায় নি তোমার ঘোড়া। স্রেফ বেকুবের মতোই পড়াটা হ'ল তোমার, আর পড়লে তো পড়লে অতবড় সাজোয়ান লোকটা তাড়াতাড়ি কোথায় উঠে পড়বে, না বেড়ালের মতো দুটো থাবা সামনে পেতে জুলজুল ক'রে চেয়ে বুদ্ধুর মতো বসে বসে খরগোশের খেলা দেখছ! এতে কার না হাসি পায় বলো!'

রাগ হওয়া উচিত ছিল না—কিন্তু বাজীরাও-এর রাগটা বেশী বলেই তিনি যেন অকস্মাৎ দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়লেন। কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ারটা খুলে নিয়ে ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললেন, 'বটে,

আমার সঙ্গে দিল্লাগী! আমি বোকা, আমি বুদ্ধু—! জানিস আমি কে?'

ছেলেটা কিন্তু খোলা তলোয়ারেও ভয় পেল না, বলল, 'না—তা কি ক'রে জানব বলো। তবে বিক্রম দেখাবার লোক না পেয়ে যে বীরপুরুষ এক ফোঁটা ছেলের ওপর তলোয়ার ঘোরায় সে আবার বুদ্ধু নয় তো কি? আলবৎ বুদ্ধু, একশো বার বুদ্ধু! ঘোড়ায় চড়তে জানে না তো প্রথম কথা। নইলে অমন ভাবে পড়তে না! দ্বিতীয়ত তলোয়ার ধরতেও জানো না! যে ধরার মতো ধরতে জানে সে সমান যোদ্ধা দেখে খাপ থেকে তলোয়ার খোলে—মেয়েছেলে কি ছেলেমানুষ দেখে বীরত্ব ফলায় না!'

যেমন হঠাৎ রক্ত চড়েছিল বাজীরাও-এর মাথাতে, তেমনি হঠাৎই নেমে এল। খুশী হয়ে উঠলেন তিনি ছেলেটার নির্ভয় এবং সত্যভাষণ দেখে। যুক্তি অকাট্য—তা তাঁকেও মানতে হ'ল মনে মনে। তবু তিনি পূর্ববৎ উগ্রস্বরেই বলতে চেষ্টা করলেন, 'আমি তোমাদের পেশোয়া—এ রাজ্যের শাসক!'

'ও!' ছেলেটা একটা কৃত্রিম সমীহের ভাব আনল মুখে, 'তুমিই পেশোয়া বাজীরাও!…আমি ভেবেছিলুম পেশোয়া বুঝি খুব বীর—এখন তো দেখছি খেলাঘরের সেপাই তুমি!'

'খুব যে লম্বা লম্বা কথা শিখেছিস দেখতে পাই! বামুনের ঘরের ছেলে লেখা পড়া নেই—চাষার ছেলের মতো গরু চরিয়ে বেড়াচ্ছিস, বড় বড় কথা বলতে লজ্জা করে না! বামুনের ঘরের মান ডোবালি তোরা!'

'ওঃ!' ছেলেটাও সমান তেজে জবাব দেয়, 'তুমি যদি সত্যিই পেশোয়া হও, তুমিও তো ব্রাহ্মণ, তা তুমি ব্রাহ্মণের কোন্ কাজটি করো শুনি? লড়াই ক'রে মানুষ মেরে বেড়ানোই বুঝি বামুনের কাজ, না? আমার ঠাকুর্দা বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর মুখে আমি অনেক শাস্ত্রকথা শুনেছি—যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, দান আর

প্রতিগ্রহ, ব্রাহ্মণের এই ছ'দফা কাজ। কোন্‌টা করো তুমি? আর তোমার রাজত্বে ব্রাহ্মণের ছেলে খেয়ে পরে পড়াশুনো নিয়ে থাকতে পারে না, গোরু চরিয়ে খেতে হয়—এ তো তোমারই লজ্জার কথা!'

জীবনে এই প্রথম হতবাক্‌ হয়ে গেলেন পেশোয়া। অপ্রতিভ তো হলেনই—বিস্মিতও। এ কি কোন দশ-বারো বছরের ছেলের মুখের কথা? এ মানুষই তো,—না কোন দেবতা তাঁকে ছলনা করতে এসেছে? তাঁর মুখের রেখাগুলো দেখেই যেন মনের ভাবটা অনুমান ক'বে নিল ছেলেটি। হেসেই বলল, 'আমার অমনি পাকা-পাকা কথা ছেলেবেলা থেকেই। বাড়িতে আমার বয়সী ছেলে কেউ নেই, আমার দাদারা কাকারা সবাই বড় বড়—তাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে এমনি হয়ে গেছে। তাছাড়া বয়সও যা ভাবছ তা নয়, আমাব এখন ষোল বছর বয়স চলছে আমি বাবার মুখে শুনেছি তুমি এই বয়সেই লড়াই করতে শিখে গিয়েছিলে। ছত্রপতি শিবাজী এই বয়সে রাজগী শুরু করেছিলেন। আমাকে তো প্রায়ই বকাবকি করেন তাই—বলেন এবার তোর রোজগার-পাতি শুরু করা উচিত!'

বাজীরাও প্রসন্ন হয়ে উঠলেন, ছেলেটিকে ভারী ভাল লাগল তাঁব। আরও কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম কি ভাই?'

'শ্রীপৎরাও।'

'বাঃ—আমি বাজীরাও, তুমি শ্রীপৎরাও। আমরা দুজনে মিতে, কেমন?'

'দূর, বড়লোকে গরীবে কখনও মিতে হয়! আমার বাবা বলেন, ও তেলে জলে মিশ খায় না। যাই হোক রাগ করো নি আমার ওপর এই ঢের। আমার মুখটা বড় খারাপ, কিছুতেই সামলাতে পারি নে—যেখানে সেখানে যা খুশী বলে ফেলি। বাবা বলেন, এই রোগেই মরবি তুই। তা নেহাৎ মিথ্যেও নয়—এই তো তুমি তলোয়ার উচিয়ে

কাটতে এসেছিলে আমায়। নেহাৎ লোকটা খুব খারাপ নও বলেই শেষ অবধি ক্ষমা ক'রে নিলে– নইলে কি আর প্রাণটা বাঁচত!'

বাজীরাও এ খোঁচারও কোন জবাব না দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার কাছে কাজ করবে? ফৌজে ঢুকবে?'

'না। ফৌজে ঢুকে লড়াই করার মতো চেহারা নয়, দেখছই তো এই বাঁটকুল—বামন আমি। তা ছাড়া ও ভালও লাগে না। এই বেশ আছি, একা একা বনে জঙ্গলে গরু চরিয়ে বেড়াতে আমার বেশ লাগে।'

'এই ভাবেই জীবন কাটাবে?'

'না—এর সঙ্গে একটু পড়াশুনো করতে মন্দ লাগত না, যদি সে সুযোগ পেতুম। এখন এই বয়সে আর পাঠশালে যেতে ইচ্ছে করে না।'

'তুমি কি কিছুই লেখাপড়া জানো না?'

এই প্রথম একটু লজ্জিত হ'ল শ্রীপৎরাও। মাথা নামিয়ে বললে, 'না জানার মতোই। বাবার কাছ থেকে শিখতে পারতুম কিন্তু মনও ছিল না খুব। পাঠশালায় দেবেন এমন অবস্থা ছিল না বাবার। এখন দাদা ছত্রপতির দপ্তরে তশীলদারী কাজ পেয়েছেন, তা তাঁরও খুব বড় সংসার, তবু এক সঙ্গে আছি বলে চলে যায়। কিন্তু এখন আবার নতুন করে পুঁথি খুলে পড়তে বসতে লজ্জা করে!'

'তা ফৌজে না হয় কাজ না নিলে, আমার কাছে অন্য চাকরি করবে? সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, ফায় ফরমাশ খাটবে?'

একটু যেন কি ভেবে নিয়ে বলল শ্রীপৎরাও, 'ফায় ফরমাস খাটা মানে চাকরের কাজ।···অবশ্য তুমি একে ব্রাহ্মণ তায় রাজা—তাতে দোষ ছিল না খুব, কিন্তু কী জানো, আমার ইচ্ছে করে না ঠিক। যতই তোমার সঙ্গে থাকি, দাঙ্গা লড়াইয়ের মধ্যে যেতে হবে তো—চারিদিকে মানুষ মরবে, জখম হয়ে কাতরাবে—এ সবও সহ্য করতে হবে। না-ই বা গেলুম'

বাজীরাও আবারও বিস্মিত হলেন। বললেন, 'তা তুমি এই ভাঙ্গা কেল্লার জঙ্গলে গোরু চরাতে আসো, তোমার ভয় করে না? আর কিছু না হোক বাঘ ভাল্লুক তো আছে!'

'তা আছে। তবে কৈ, আমাকে তো কেউ কিছু বলে নি এতকাল। একবার একটা ভাল্লুক তেড়ে এসেছিল, আমি তরতরিয়ে গাছে উঠে গিয়ে ইয়া বড় একটা পাথর ছুঁড়ে মারতেই ঘায়েল হয়ে গিয়েছিল। বাঘ আছে শুনেছি, দেখি নি কখনও।'

'ভূতের ভয় করে না।'

'ও মা, আমি না ব্রাহ্মণ! গলায় না আমার পৈতে আছে। ভূতকে আমার কী ভয়?"

'তা বটে। ভূত মানুষ কাউকেই তোমার ভয় নেই। তুমি নিজেই অদ্ভুত! না, তোমার সুখ-শান্তিকে বিঘ্নিত করতে চাই নে। আমার কাছে চাকরি নিলে তুমি সুখী হবে না—বেশ বুঝতে পারছি। তা তোমার দেখা পাব তো মধ্যে মধ্যে—এখানে এলে?'

'নিশ্চয়ই পাবে। আমি তো প্রায়ই এখানে আসি গোরু নিয়ে। বেশ হবে কিন্তু দেখা হ'লে—তুমিও বেশ লোক, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'···

দেখা হয়েও ছিল কয়েকবার।

বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল এই দুটি অসমবয়সী মানুষের।

পুরাতন দুর্গ ভাঙ্গা, গ্রাম দুটো নিশ্চিহ্ন করা—এসব কাজে কম সময় লাগে নি। বার বারই যেতে হয়েছে বাজীরাওকে। আর যখনই গেছেন খোঁজ ক'রে শ্রীপৎকে ডাকিয়ে এনেছেন। গল্প-গুজব করেছেন, নানা প্রসঙ্গ আলোচনাও করেছেন। ছেলেটির কথা শুনলে মনে হ'ত ওঁর, কোন বালকের দেহে পাকা মাথা এনে বসানো হয়েছে। অনেক সময় খুব ভাল পরামর্শও পেয়েছেন তার কাছ থেকে। এই বয়সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছেলেটির। দেখেছে অনেক। বুঝেছে আরও বেশী।

শ্রীপৎরাও অবশ্য এই দুর্গ ভাঙ্গা এবং গ্রামবাসীদের উৎখাত করায় খুশী হয় নি। যদিও বাজীরাও সমস্ত গ্রামবাসীকেই আগের অনুপাতে বেশী বেশী জমি দিয়ে বসত করিয়েছিলেন গ্রামান্তরে, শ্রীপতের বাবাকে বহু জমি ব্রহ্মোত্তর হিসেবে দান করেছিলেন—তাঁর প্রাপ্য ছাড়াও। তবু শ্রীপৎ খুশী হয় নি, কারণ এই নির্জন ভাঙ্গা দুর্গে তার যেন কোথায় একটা আশ্রয় ছিল, সেটাই নষ্ট হয়ে গেল। সে বলত, 'তোমার উৎপাতে জঙ্গলই তো রইল না, গোরু ছাগল চরবে কোথায়? খাবে কি ওরা?'

'কেন, একটু কষ্ট ক'রে শহরের বাইরে গেলেই তো দেদার জঙ্গল। তোমরা আসলে কুঁড়ে, নড়তে চাও না তাই!'

'ওগো মশাই, তা নয়। এই ভাঙ্গা কেল্লায় আগাছা জন্মাত সেগুলো থাকে অনেক দিন—তোমাদের এ পাথুরে দেশে, মাঠে ক'দিন বা ঘাস থাকে। বৈশাখ মাসে গোরুগুলো টাঙিয়ে থাকে একেবারে!'

বাজীরাও হেসে বলতেন, 'বা রে, তা হ'লে বলো তোমার গোরু চরাবার জন্যে বড় বড় কেল্লা কতকগুলো গড়ে আবার ভেঙ্গে দেওয়া যাক। তবে আগাছা জন্মাবে, তবে গোরু খাবে···। কেন, নদীর পাড়ে তো আগাছা থাকে ঢের—সেখানে যেতে পারো না?'

'তাই যেতে হবে এবার থেকে। তবে ছাখো, কেল্লা কাউকে কষ্ট ক'রে ভাঙ্গতে হয় না—ভগবানই ভেঙ্গে দেন। যে যখন খুব মাথা তোলে সে তখন বড় বড় বাড়ি করে—কেল্লা বানায়। তারপর? সে বংশের পতন হয়—সে বাড়িরও জেল্লা থাকে না, পরে যারা থাকে তাদের বাড়ি সারাবার পয়সা জোটে না।···তোমার এই নতুন প্রাসাদই বা কতকাল থাকবে? বড় জোর তিন পুরুষ কি চার পুরুষ—এই তো?'

আবার বলেছিল, 'ছাখো, এই ভাঙ্গা কেল্লাটায় গোরু চরাতে চরাতে আমার কেবল মনে হ'ত—এখানেই আমি একদিন মরব। মাকে বলেছিলুম—তা মা বলেছিল সেই অপঘাত মৃত্যুই তোর অদৃষ্টে

আছে। সাপের কামড়ে কি বাঘের মুখেই যাবি তুই। তা তুমি আমার মৃত্যুর জায়গাটাই ঘুচিয়ে দিলে !'

'ভালই তো হ'ল—অমর হয়ে থাকবে তুমি !' রসিকতা ক'রে বলেছিলেন বাজীরাও।

তারপর অবশ্য দেখাও হয় নি বহুকাল। এ গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার পর যোগাযোগ করাও মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তাদেরও নতুন জায়গায় বাড়ি তোলা, নতুন জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা—কাজ বেড়ে গিয়েছিল অনেক। শ্রীপৎরাওকে ব্যস্ত থাকতে হ'ত।

এদিকে পুরনো কেল্লা নিশ্চিহ্ন হয়ে নক্সা-জরীপ মাটি খোঁড়া পর্যন্ত হ'য়ে গেল। ভিত্তিস্থাপনের দিন এল। ধরিত্রী মাতার পূজা ক'রে গাঁথুনি শুরু হবে। এমন সময় ওঁদের পুরোহিত এই প্রস্তাবটি করলেন। ধরিত্রী মাতাকে খুশী করতে একটি জীবিত প্রাণী নিবেদন করতে হবে—বলি দিতে হবে। আর তা যখন হবেই, যদি একটি তরুণ ব্রাহ্মণ কুমারকে নিবেদন করা যায় তো আর আত্মা চিরদিন যক্ষ হয়ে ঐ পুরী পাহারা দেবে—কোনদিন কোন শত্রু এতে প্রবেশ করতে কি মহামান্য পেশোয়ার বংশকে উচ্ছেদ করতে পারবে না।

বলা বাহুল্য, পেশোয়া প্রথমটা কিছুতেই রাজী হন নি। শিউরে উঠেছিলেন প্রস্তাবটা শুনে। মানুষের প্রাণ তাঁর কাছে কিছু নয়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে মারা কিম্বা অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া এক জিনিস আর নিজের স্বার্থের জন্য একটা নিরপরাধ লোকের প্রাণ নেওয়া অন্য জিনিস। না, সে তিনি পারবেন না। কিছুতেই না।

অনেক বোঝালেন তাঁকে বংশের তান্ত্রিক সাধক-পুরোহিত। বোঝালেন রাধাবাঈকেও। তাঁকে দিয়েও বলালেন। এ সব ক্রিয়া চলেই আসছে। এতে নাকি দোষ নেই তত। তাঁদের বংশে নাকি এ প্রথমও নয়।

পেশোয়া তবুও ঠিক পূর্ণ সম্মতি দিতে পারেন নি, নিষেধই

করেছিলেন। কিন্তু, আজ স্বীকার করছেন—মনের অগোচর পাপ নেই, শেষ পর্যন্ত ঠিক অতটা জোর আর ছিল না সে নিষেধে।

পুরোহিত আর তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসাও করেন নি। গোপনে ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছিলেন। লোক পাঠিয়ে একটি ব্রাহ্মণ বালক ধরিয়ে আনালেন, তারপর যথারীতি ভিত্তিপূজার আগের দিন রাত্রে নানা অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াদি ক'রে সেই হাত-পা-মুখ বাঁধা কিশোর ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বালককে ধরিত্রীদেবতার কাছে নিবেদন ক'রে জীবন্ত সমাধি দেবার ব্যবস্থা করলেন।

বাজীরাও খবর পেয়েছিলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে, শ্রীপৎ রাওকে চিনতেও পেরেছিলেন—কিন্তু সে হত্যাকাণ্ডে বাধা দিতে পারেন নি। চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পুরোহিত এবং অন্যান্য হিতাকাঙ্ক্ষীরা ভয় দেখালেন—দেবতাকে উৎসর্গ করা জিনিস ফিরিয়ে নিলে বংশের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অসহায় নিরুপায় বাজীরাও ছুটে চলে গিয়েছিলেন সেখান থেকে। দেখতেও পারেন নি, বাধা দিতেও না।···

শ্রীপতের বাবা খবর পেয়েছিল অনেক পরে।

অন্তত পাঁচ ছ'দিন কেটে যাবার পর।

সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বুক-ফাটা হাহাকার আজও মনে পড়লে বাজীরাও অস্থির হয়ে ওঠেন! সে কলঙ্ক এবং সে লজ্জা কখনও ভুলবেন না তিনি।

'পেশোয়া মহারাজ! এ কী করলেন, এ কী করলেন আপনি। সে যে আপনাকে কত ভালবাসত, সাক্ষাৎ বিনায়কের অবতার বলে ভাবত, আপনি এই কাজ করলেন!'

লজ্জিত পেশোয়া শ্রীপৎরাও-এর বাবাকে আরও জমি এবং আরও অর্থ দিয়ে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলেন, সে নেয় নি। এর আগে বরং যা নিয়েছিল তাও ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিল—করতও, যদি

না পেশোয়া তার দুটি হাতে ধরে ক্ষমা চাইতেন। অনুতপ্ত পেশোয়ার সজল চোখের দিকে চেয়ে কোমল হয়ে এসেছিল তার মন—ক্ষমা করেছিল সে। কিন্তু তবু সন্তানের জীবনের মূল্য অর্থে বা জমিতে উশুল দিতে রাজী হয় নি কোনমতে।

আরও অনেক কিছু করেছিলেন পেশোয়া। নিজে অশৌচ গ্রহণ ক'রে নদী-তীরে বসে শ্রীপৎরাও-এর শ্রাদ্ধ করেছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রচুর স্বর্ণ, ধেনু, তিল ও কাঞ্চন দান করেছিলেন ব্রাহ্মণদের। শাস্ত্রে যা যা বিধান পেয়েছিলেন প্রায়শ্চিত্তের, সবগুলোই পালন করেছিলেন। ভেবেছিলেন এতেই তাঁর অপরাধ ধুয়ে মুছে গেল।

কিন্তু আজ বুঝছেন যে তা যায় নি।

আজ বুঝছেন যে কোন কোন প্রাণের মূল্য অনেক। অনেক কিছু দিয়ে সে মূল্য শোধ করতে হয়।

শ্রীপৎরাও-এর এ অভিশাপের কথা শুনেছিলেন তিনি বেশ কিছু দিন পরে। ভয়ে তাঁকে বলে নি কেউ। মুখ এবং হাত-পা বাঁধা ছিল বলে আগে সেও কিছু বলতে পারে নি। নদীর ধারে সন্ধ্যার সময় পর্যন্ত সে গোরু চরায়—দেখে রেখেছিল পেশোয়ার লোক। ব্রাহ্মণ কুমার, ব্রহ্মচারী, ষোল বছর বয়স—ঠিক ঠিক মিলে গিয়েছিল। ধরাও সহজ—নির্জন নদীতীর থেকে। এই ভেবে ওর সন্ধানেই ছিল তারা। জানত না পেশোয়ার সঙ্গে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালকের যোগাযোগের কথাটা। নদীতীর থেকে সেই দিনই বেঁধে এনেছিল তারা, সন্ধ্যার অন্ধকারে অতর্কিতে ধরে এনেছিল, একটা শব্দ করার পর্যন্ত সুযোগ পায় নি। কিন্তু উৎসর্গ করার আগে দেবীর প্রসাদ ও নির্মাল্য মুখে দিতে হবে বলে, একবার মুখটা খুলতে হয়েছিল ; সেই সময়ই চিৎকার ক'রে উঠেছিল সে, বলেছিল, 'সে বিশ্বাসঘাতক, সেই বেইমানটা কোথায় গেল ? সেই মিথ্যুক ব্রাহ্মণটা ! এই মনে ছিল বলে বুঝি আমার সঙ্গে অত ভাব জমিয়ে-

ছিল! সেই জন্যে বুঝি অত জমি আর টাকা দিয়েছিল বাবাকে! কিন্তু রাজা সে, ব্রাহ্মণ—মিথ্যা কথা বলল কেন? তার দরকার আমাকে বললে আমি তো স্বেচ্ছায় এসে প্রাণ দিতে পারতুম! তাকে যে আমি ভালবেসেছিলুম। সে এত ছোট হয়ে গেল কেন!'

তারপর, মুখে প্রসাদ গুঁজে দেবার ফাঁকে ফাঁকে ঐ কঠোর অভিশাপগুলো দিয়েছিল। আরও বলেছিল সে, 'চক্ষুলজ্জায় পালিয়ে বেড়ালেই বুঝি এর দায় এড়িয়ে যাবে মনে করেছে সে? হায় রে বুদ্ধি! এ দায়ে অব্যাহতি নেই তার—তাকে বলে দিও। মিত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোন ক্রমেই ক্ষমা করবেন না ঈশ্বর। পার পাবে না কোন মতেই। এর দাম তাকে কড়ায় ক্রান্তিতে শোধ করতে হবে!'…

অপরাজেয় ভারত-ত্রাস পেশোয়া বাজীরাও যেন হাঁফিয়ে ছটফট ক'রে উঠলেন একবার, 'শ্রীপৎরাও, শ্রীপৎরাও, বন্ধু আমার—অনেক দাম তো দিলুম জীবনভোর, এখনও কি প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না? এখনও পারলে না আমাকে ক্ষমা করতে?'

তিনি যথাসাধ্য চেঁচিয়েই বললেন হয়ত—কিন্তু কেউই কিছু বুঝল না, শুধু অস্থিরতাটা লক্ষ্য করল। জনার্দন আবারও কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'কিছু বলছেন বাপুজী, কিছু বলতে চান কাউকে? মাকে ডেকে দেব?'

'না, না! আর কাউকে দরকার নেই। এবার ছুটি পেয়ে গেছি আমি। শ্রীপৎরাও ক্ষমা করেছে আমাকে। অভিসম্পাৎ ফলে গেছে তার অক্ষরে অক্ষরে, আর তো তার কোন অভিযোগ থাকতে পারে না। খুশী হয়েছে সে, তৃপ্ত হয়েছে। হেসে ভগবানের নাম শুনিয়ে চলে গেল এই মাত্র। আর না। এবার আমি ঘুমোব। আলোগুলো নিভিয়ে দাও জনার্দন, দেখছ না সব অন্ধকার কেটে গেছে। প্রভাতের আলো ফুটে উঠেছে চারিদিকে! হে বিনায়ক ভগবান!'

সত্যি সত্যিই যেন আরাম ক'রে পাশ ফিরে শুলেন বাজীরাও, আর মনে হ'ল আস্তে আস্তে ঘুমিয়েই পড়লেন এবার।

॥ ২১ ॥

রাজপুরোহিত একটু কাশলেন একবার, কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নেবার চেষ্টা করলেন; বার-দুই পর পর উত্তরীয় প্রান্তে ললাটের স্বেদস্রোত মুছলেন—সম্পূর্ণ বৃথা প্রয়াস জেনেও, কারণ যে স্রোত উপস্থিত সকলের ললাটেই অবিরল ধারে প্রবহমান, রাজপুরোহিতের তো আরও—বার বার মুছেও বিন্দুমাত্র বিরতি মিলছে না, উত্তরীয়টাই ভিজে উঠছে শুধু; তবু খানিকটা অবসর—কিছুটা বা সাহস সঞ্চয়ের জন্যই যেন সেটা প্রয়োজন; এর মধ্যেই কয়েকবার ক্রমান্বয়ে ডান থেকে বাঁ এবং বাঁ থেকে ডান পা বদল ক'রে নিচের উত্তপ্ত উপল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছেন, পা জ্বলে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরেই—নর্মদার সেই উপলাস্তীর্ণ তীরভূমিতে এমন এতটুকু শষ্পাশ্রয় নেই যার উপর দাঁড়িয়ে পায়ের জ্বালা নিবারণ করতে পারেন—কিন্তু এ সবই করছিলেন অন্যমনস্কভাবে, হাত-পাগুলো আপনা আপনিই কাজ ক'রে যাচ্ছে যেন—তার সঙ্গে তাঁর মনের কোন যোগ নেই। মন তখন দ্রুত চিন্তা ক'রে যাচ্ছে, অপ্রিয় কর্তব্য থেকে অব্যাহতি লাভের চিন্তা, অধিকতর অস্বস্তি থেকে মুক্ত হবার চিন্তা—এ সব সামান্য দৈহিক ক্লেশ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় সেটা নয়, সে অবসর আর নেই। যাহোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে, অবিলম্বে—সত্বর। এদিকে যত দেরি হবে ওদিকে তত এই ক্লেশ এই দাহ বিলম্বিত হবে।

সুতরাং—যা করতে হবে, এখনই।

রাজপুরোহিত আবারও একবার কাশলেন, মাথা চুলকোলেন, তারপর ডাকলেন, 'মা!'

কিন্তু কাশীবাঈ নির্বাক। তিনি একদৃষ্টে একদিক পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—স্থির নিস্তব্ধ হয়ে।

না, স্বামীর চিতার দিকে নয়, তাঁর দৃষ্টি সে চিতা পেরিয়ে নর্মদার উপলাহত স্রোতোরেখার ওপর নিবদ্ধ। নিদাঘের উপবাস-শীর্ণা নর্মদা যেখানে ছোট ছোট পাথরে ঘা খেয়ে ছোট ছোট অসংখ্য ঢেউয়ে ভেঙ্গে পড়ছে, সহস্র সহস্র হীরক খণ্ডের মতোই প্রতিবিম্বিত সূর্য-রশ্মি সহস্রদিকে বিচ্ছুরিত ক'রে চোখ ধাঁধিয়ে। সে আলো নিশ্চয় মহিষীর চোখেও তীক্ষ্ণ সুচাগ্রভাগের মতো এসে বিঁধছিল, কিন্তু তা বিঁধলেও সে অনুভূতির কোন বাহ্য চিহ্ন কোথাও প্রকাশ পাচ্ছিল না, তাঁর মুখে বা চোখে। পাথরের মতোই ভাবলেশহীন তাঁর মুখ, নিষ্পলক শূন্য তাঁর দৃষ্টি।

সত্যিই কি পাথর হ'য়ে গেছেন কাশীবাঈ ?

নইলে কিছুই আজ তাঁকে বিচলিত করতে পারছে না কেন ? বৈশাখ মধ্যাহ্নের নিষ্করুণ সূর্য প্রখর রৌদ্রে অগ্নি-বৃষ্টি করছেন চারদিকে, সে অগ্নি মাথায় পড়ে যেমন প্রদাহের সৃষ্টি করছে, তেমনি পায়ের নিচের পাথরগুলোকেও তাতিয়ে তপ্ত কটাহের মতো অসহ ক'রে তুলেছে। সত্য বটে এ তাপ উপেক্ষা ক'রেই আজ এই নিভৃত নদীতীরে সকাল থেকে সহস্র সহস্র লোক এসে সমবেত হয়েছে, তাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য—এবং তারা এখনও পর্যন্ত দাঁড়িয়েই আছে দুঃখে, শোকে ও এই ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত স্তব্ধ হয়ে, কেউই ফিরে যায় নি তাদের শান্ত ছায়াচ্ছন্ন গৃহকোণে—কিন্তু তারা তো সকলেই দুঃখ-কষ্টে অভ্যস্ত, নিদাঘের খররৌদ্রও তো তাদের কাছে অপরিচিত নয়, তারা বেশির ভাগই দরিদ্র কৃষিজীবী নয়তো যুদ্ধজীবী,—শ্রমজীবী সকলেই। মহিষী কাশীবাঈয়ের মতো ভোগে ও বিলাসে, সুখে ও প্রাচুর্যে অভ্যস্ত রাজান্তঃপুরবাসিনী কেউই নয় তারা। তবু তো তারাও এই রাজ-পুরোহিতের মতো ক্ষণে ক্ষণে পা বদলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অপর

পাকে মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি দেবার চেষ্টা করছে, মুহুর্মুহু উত্তরীয়ে স্বেদ-মোচন করছে—কেউ বা সেইগুলো ঘুরিয়েই একটু হাওয়া খাচ্ছে। অর্থাৎ তাদের যে কষ্ট হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে—? রানী কেমন ক'রে সহ্য করছেন এই কষ্ট, তাঁর কি অনুভূতি বলে আর কিছু নেই?······

রাজপুরোহিত আবারও কেশে, গলা সাফ ক'রে ডাকলেন, 'মা!'

এবার গলার স্বর একটু উচ্চগ্রামে তুলেছেন তিনি—সব সঙ্কোচ দূর ক'রেই।

আর বোধহয় সেই জন্যই, সে স্বর পৌঁছেও গেল রাজমহিষীর কানে, তাঁর মস্তিষ্কে। এবার তিনি মুখ ফেরালেন, চোখ দুটি দূর নর্মদা স্রোত থেকে তুলে এনে নিবদ্ধ করলেন রাজপুরোহিতের মুখের ওপর।

'কিছু বলছেন ত্র্যম্বকজী?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কাশীবাঈ।

'হ্যাঁ মা। বলছিলাম,—মানে, দেরি হয়ে যাচ্ছে তো, বালাজীও ছেলেমানুষ, তার দৈহিক ও মানসিক অবসাদ বোধহয় সহ্যশক্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে, আর বোধহয় দেরি করা সঙ্গত নয়—এবার—'

একটু—সামান্য একটু অসহিষ্ণুভাবেই বললেন কাশীবাঈ, 'কিন্তু দেরিই বা আপনারা করছেন কেন—কার জন্য, কী জন্য!'

ঠিক যত সহজে তিনি প্রশ্ন করলেন, তত সহজে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় ত্র্যম্বকজীর। তিনি বিষম বিব্রত বোধ করলেন, তাঁর মুণ্ডিত মস্তক ও ললাটের স্বেদধারা বেড়ে গেল আরও।

অথচ দেরি করারও আর সময় নেই। মহিষী প্রশ্ন করেছেন—মহামান্য পেশোয়ার পট্টমহিষী, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি। মুহূর্তকয়েকের বেশী বিলম্ব করাটা অশোভন শুধু নয়, অপরাধ।

'মা—আপনি তো সবই জানেন—আপনাকে স্মরণ করাতে যাওয়াই আমাদের ধৃষ্টতা।···আমাদের যা প্রথা—কোনটা তো

আপনার অবিদিতও নেই—।···মানে—মহামান্য পেশোয়ার শেষ-কৃত্য সম্বন্ধে আপনার কোন আর নির্দেশ নেই তো ?'

প্রশ্ন ক'রে মাথা হেঁট করলেন ত্র্যম্বকজী, উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলেন। মহিষীর কাছেই উত্তর চান তিনি—কিন্তু তবু তাঁর চোখের দিকে চাইবার যেন সাহস নেই।

'নির্দেশ ?' বিহ্বলভাবে পাল্‌টা প্রশ্ন করেন কাশীবাঈ। তাঁর কিছু পূর্বের স্তম্ভিত বিহ্বলতাই আসলে হয়ত কাটে নি তখনও পর্যন্ত—কোন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত তাঁর মাথায় ঢুকছে না।

'কী বিষয়ে আমার নির্দেশ আপনি আশা করেন ত্র্যম্বকজী ?' একটু থেমে আবারও জিজ্ঞাসা করেন কাশীবাঈ।

আর না বললে নয়। তবু শেষ মুহূর্তেও যেন একটু ইতস্ততঃ করলেন ত্র্যম্বকজী, যদি শোকাচ্ছন্নতার কুয়াশা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক স্থির-বুদ্ধি ফিরে পান মহিষী—সেই আশায়।

কিন্তু কিছুই হ'ল না। বরং অসহিষ্ণুতার চিহ্নস্বরূপ ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল কাশীবাঈ-এর ললাটে। তখন প্রায় মরীয়া হয়েই বলে ফেললেন ত্র্যম্বকজী, 'বলছিলাম কি মা—মহামান্য পেশোয়ার চিতাতে তাহলে এইভাবেই—যেমন সাজানো আছে তেমনি অগ্নি সংযোগ করা হবে তো— ? মানে আর কোন রদ-বদলের সম্ভাবনা নেই— ?'

'রদ-বদল ? আর কি রদ-বদল হ'তে পারে ?···আপনার বক্তব্যটা একটু খোলসা ক'রে বলুন ত্র্যম্বকজী, আজ আর ঠিক আপনার রাজনৈতিক ভাষার প্যাঁচগুলো মাথাতে ঢুকছে না !'

কাশীবাঈ-এর কণ্ঠে বিরক্তি আর চাপা থাকে না।···

ত্র্যম্বকজী প্রমাদ গণেন। এ বিরক্তি এ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। এ বড় কঠিন ঠাঁই। এ কণ্ঠস্বরের সামনে অত বড় বীর রাজনীতিক বাজীরাও পেশোয়াও সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন, তা বহুবার ত্র্যম্বকজী নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। এই কিছুদিন আগেও তো—। হয়ত এতটা সমীহ না করলে স্ত্রীকে—আজ এই চিতাশয্যা

রচনারই প্রয়োজন হ'ত না। আরও ঢের দিন বাঁচতে পারতেন বাজীরাও।

তিনি তাড়াতাড়ি আরও কুণ্ঠিতভাবে হ'লেও আরও স্পষ্টভাবে বললেন, 'মহামান্য পেশোয়া তা হ'লে একাই পরপারের উদ্দেশে যাত্রা করবেন তো—মানে আর কেউ—'

বলতে বলতে থেমে যান আবার। কেমন যেন একটু উৎকণ্ঠিত-ভাবেই প্রতীক্ষা করেন ওপক্ষের উত্তর বা প্রতিক্রিয়ার।

'একা যাত্রা করবেন—তা-তার মানে?'

প্রশ্ন করেন একটু অবাক হয়েই, কিন্তু কথাগুলো বলতে বলতেই যে উত্তরটা তাঁর কাছেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে সেটা বোঝা যায় শেষের দিকে কথাগুলো গলাতে জড়িয়ে গিয়ে থেমে আসায়।

'ও, আপনি সহমরণের কথা বলছেন?'

ত্র্যম্বকজী আর উত্তর করেন না। আর কিছু বলবার নেই তাঁর। এটুকুও বলার প্রয়োজন ছিল না। কথাটা এঁদেরই ভাবার কথা, বলার কথা, আলোচনা করার কথা। তাঁকে যে বলতে হ'ল সেটা এঁদের পক্ষেই ত্রুটি বলে গণ্য হওয়া উচিত। যাই হোক—আর যখন কোন অস্পষ্টতা নেই ওঁদের মনে, তখন আবার কেন কথা কইতে যাবেন?

কিন্তু কাশীবাঈও তখনই কোন উত্তর দিতে পারেন না। আবারও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কঠিন দৃষ্টিতে একটা বিহ্বলতা ফুটে ওঠে। বিহ্বলতা —সেই সঙ্গে একটা অসহায় ভাবও। চারিদিক থেকে শিকারীর দল ঘিরলে হরিণীর চোখে যে অসহায়তা ফুটে ওঠে—হয়ত তেমনিই।

ঠিক এই প্রশ্নটাই এতক্ষণ ধরে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন তিনি প্রাণপণে। নিজের মনের কাছ থেকে, বিবেকের কাছ থেকে সরে সরে যাবার চেষ্টা করছিলেন।

ভাবছেন তিনি এই দুদিন ধরেই। সংবাদটা শোনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটা জেগেছে তাঁর মনে—সেই থেকে, একবারও সম্পূর্ণভাবে

তাঁর মনের বাইরে যায় নি। এ প্রশ্ন উঠবেই—তা তিনি জানেন। অবশ্য তাঁর শাশুড়ীও সহমরণে যান নি, দিদিশাশুড়ীও না। উত্তম নজীর আছে এ বংশে—তিনি না গেলে কেউই কিছু বলতে পারবে না।

তবু—

প্রশ্নটা থেকেই যায়। ঐ যে অগণিত লোক নিস্তব্ধ হয়ে চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রিয় পেশোয়ার চিতাশয্যার দিকে চেয়ে—তাদের মনেও হয়ত এই প্রশ্নটাই এখন অগ্রগণ্য। মহামান্য পেশোয়া বাজীরাও-এর মতো বীর, তাঁর মতো অরাতিদমন শিষ্ট-পালক জননেতা প্রায় সারাজীবনব্যাপী কঠোর শ্রমের পর এই অল্প বয়সে পরলোক-যাত্রা করবেন একা—সেখানে তাঁর পরিচর্যা করার জন্য, সেবা করার জন্য কেউ যাবে না? এ যে রীতিমতো অকৃতজ্ঞতা, পরলোকগত বীরের প্রতি অবিচার!······

প্রাণের মায়া? না, মোটেই না। নিজের মনকেই জোর ক'রে ধমক দেন কাশীবাঈ। প্রাণের মায়া তাঁর এত নয়। স্বামীর প্রতি অভিমানেও এই অবশ্য-কর্তব্য থেকে বিরত হচ্ছেন না তিনি। অভিমান করলে তিনি করতে পারতেন, কেউ দোষ দিতে পারত না তাঁকে। তাঁর স্বামী—উদার, বীর, বিবেচক, ন্যায়পরায়ণ, রাজ্যেশ্বর স্বামী—অপর সমস্ত মানুষের পাত্রে বিবেক-বিবেচনা, ন্যায়পরায়ণতা নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছিলেন, একটি মানুষের কথা খালি তাঁর মনে ছিল না। নিজের বিবাহিতা ধর্মপত্নীর কথাই ভুলে গিয়েছিলেন শুধু। যে স্ত্রী জীবনে কখনও তাঁকে প্রতারণা করে নি, কখনও তাঁর প্রতিকূলতা করে নি—চিরকাল যোগ্য সহধর্মিণীর কাজ ক'রে গেছে যথাসাধ্য, সেই স্ত্রীকেই তিনি ঠকিয়েছেন সবচেয়ে বেশী। কোথা থেকে ঐ মুসলমানী মেয়েটাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে তাঁর—তাঁদের মাথার ওপর বসিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, কাণ্ডাকাণ্ড ধর্মাধর্ম জ্ঞান বিসর্জন দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, একেবারেই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। নইলে তাঁর মতো স্থিরবুদ্ধি স্থিতপ্রজ্ঞ লোকের ঐ বিজাতীয়া কুলটা নারীকে সঙ্গে নিয়ে রাজসভায় রাজার সামনে যাবার দুর্বুদ্ধি হবে কেন? গণেশ চতুর্থীর দিন, ইষ্টদেবতা কুলদেবতা গণপতি পূজার সময় ব্রাহ্মণ সজ্জন রাজপুরুষদের নিমন্ত্রণ ক'রে এনে ভগবানের সামনে ঐ বেশ্যা নর্তকীটার নাচের ব্যবস্থা করবেন কেন?......

ছি ছি! সে কথা মনে হ'লে আজও তাঁর যেন লজ্জায় মাথা কাটা যায়, আজও মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে ইচ্ছা করে তাঁর।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি যে অবিচার করেছেন স্বামী, তা বোধহয় অতটা অসহ্য হয় নি তাঁর—যত এই আচরণগুলো হয়েছে। কারণ এটা তাঁর স্বামীর মানসিক অধঃপতনেব প্রমাণ, বুদ্ধিভ্রংশের প্রমাণ। এটা জানাজানি হয়েছে প্রজাসাধারণের মধ্যে, তাঁর অমন স্বামী লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছেন—ইতর লোকেরা এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছে, হাসাহাসি করেছে, টিটকারী দিয়েছে তাঁর স্বামীকে। সে কথা শোনবার আগে, সে দৃশ্য দেখবার আগে মরে যাওয়াও ঢের বেশী শ্রেয় ছিল, সেদিন মরবার কোন সুযোগ পেলে তিনি মুহূর্তকালও দ্বিধা করতেন না। নেহাত আত্ম-হত্যা মহাপাপ, শুধু তাই নয়—তিনি আত্মহত্যা করলে সে পাপ সে কলঙ্ক তাঁর বালক ও শিশু পুত্রদের ভবিষ্যতে ছায়াপাত করবে বলেই নিজে থেকে মরতে পারেন নি তিনি।

তবু আজ সে রাগ দুঃখ অভিমানই শুধু এসে স্বামীর প্রতি শেষ কর্তব্য পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

স্বামীর সে অপরাধ তিনি ক্ষমা করেছেন বহুদিন।

তিনি জানেন কি মর্মান্তিক অন্তর্দাহ তিনি ভোগ ক'রে গেছেন জীবনের এই শেষ ক'টাদিন। তাইতেই প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে তাঁর। আজ স্বামীর চিতাশয্যার সামনে দাঁড়িয়ে সেই সুপুরুষ বীর্যবান মানুষটার এই কঙ্কালসার শবদেহটার দিকে চেয়ে সেইটেই

অনুভব করছেন তিনি। মনে হচ্ছে বরং—এতটা হয়ত না করলেও চলত। হয়ত পাপের চেয়ে প্রায়শ্চিত্ত কিছু বেশীই হয়ে পড়ল—

তিনিই দায়ী—এটা ঠিক। সে কথা তিনি অকপটেই স্বীকার করছেন।

স্বামীকে সেই নিরতিশয় গ্লানি থেকে সে নিদারুণ লোকলজ্জা থেকে—সে একান্ত হীন উন্মত্ততা থেকে তিনিই টেনে তুলে সে অপরাধের মূলোচ্ছেদ ক'রে দিয়েছেন। কুৎসিত প্রবৃত্তির কাছে একান্ত আত্মসমর্পণের হীনতা থেকে তিনিই রক্ষা করেছেন বিধাতা-পুরুষের কাছে রাজ-সনদ পাওয়া তাঁর রাজ্যেশ্বর স্বামীকে।

সুতরাং সেদিক দিয়ে আর কোন ক্ষোভ কোন অন্তর-বেদনা তাঁর নেই।

হ্যাঁ, তাঁর শাশুড়ী রাধাবাঈ, স্বয়ং দেবর চিমনজীও তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন—এটা ঠিক। রাধাবাঈ বালাজী বিশ্বনাথরাও-এর যোগ্য সহধর্মিণীর মতোই বলেছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে—ছেলে আমার যতবড় বীর, যতবড় শাসক, যত দিগ্বিজয়ীই হোক—এই কলঙ্ক থেকে এই পাপ থেকে মুক্ত হ'তে না পারলে আমি ভগবান গণপতির কাছে তার মৃত্যু-কামনাই করব। তোমাকে আমি আদেশ করছি যেমন করে হোক এই অপযশ থেকে তাকে রক্ষা করো। তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তো তাকেই বন্দী করো—বিন্দুমাত্র দ্বিধা ক'রো না।··রাজা কি বলবেন ? সে দায়িত্ব আমার, শাহু ছত্রপতির কাছে আমি নিজে গিয়ে সে কৈফিয়ৎ দেব—আমি, তাঁর প্রাক্তন মহামাত্যের স্ত্রী।'

মার কাছ থেকে অমন নিঃসংশয় নির্দেশ না পেলে চিমনজী কাশীবাঈয়ের পাশে এসে দাঁড়াতে পারতেন কিনা সন্দেহ। চিমনজী আপ্পা বীর, চিমনজী আপ্পা বুদ্ধিমান—কিন্তু তবু, তিনি জ্যেষ্ঠের একান্ত অনুগতও। তা ছাড়া বাজীরাও-এর দুর্মর দুঃসাহস নেই চিমনজীর মধ্যে, দ্রুত মনস্থির করার শক্তিও না।

চিমনজী আপ্পা এবং রাধাবাঈয়ের উৎসাহ ও অভয় না পেলে তাঁর ছেলে বালাজীও সাহস পেত কিনা সন্দেহ—ঐ স্ত্রীলোকটাকে বন্দী করতে।

আর কাজটা খুব সহজও ছিল না তো।

শুধু রূপসীই নয়, শুধু নৃত্য-গীত-ছলাকলা পটীয়সী মোহিনীই নয়—বিধর্মী কুলটা স্ত্রীলোকটা অসাধারণ চতুরা এবং দুর্জয় দুঃসাহসিকাও বটে। সেটা তিনিও স্বীকার কবতে বাধ্য। জনকয়েক মাত্র শস্ত্রধারী সান্ত্রী পাঠিয়ে বন্দী করার মতো সাধারণ ছিঁচকাদুনে মেয়েছেলে নয় সে। তার পিছনে বাজীরাও-এর রক্ষাকবচ ছিল সত্য কথা—বিপুল একটা রাজশক্তি ছিল বলতে গেলে—কিন্তু তা না থাকলেও সে একাই একশ—অথবা শতাধিক।

বালাজীর কূটকৌশল, চিমনজীর বুদ্ধি এবং কাশীবাঈ-এর জিদ ও প্রচণ্ড উষ্মা মিলিত হয়েই সম্ভব হয়েছিল তাকে বন্দী করা। পোশায়ার দেহবক্ষীরা বালাজী ও চিমনজীর আদেশেও বিচলিত হয় নি—তাঁদের প্রতি যোগ্য সম্মান দেখিয়েও অনায়াসে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে পেশোয়ার আদেশ নির্দেশ তাঁদের আধিপত্যের থেকেও বড়। সে আদেশ পালনের জন্য প্রয়োজন হ'লে তারা তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতেও কুণ্ঠিত হবে না ··অস্ত্রধারণ কবেওছিল তারা—এবং তার ফলাফল কি হ'ত তা আজ কারুর পক্ষেই বলা সম্ভব নয়—শুধু শেষ মুহূর্তে স্বয়ং রাধাবাঈ আর কাশীবাঈ গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই সে উদ্যত অস্ত্র সম্ভ্রমে ও সঙ্কোচে নেমে এসেছিল্। প্রাক্তন ও বর্তমান পেশোয়ার সহধর্মিণী পট্ট' মহাদেবীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে, ওঁদের কাজে বাধা দিতে সাহসে কুলোয় নি তাদের।

তাই কি ওকে বন্দী ক'রেই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। বাল্য-কাল থেকেই শুনে আসছেন তিনি—কুলটা স্ত্রীলোকদের অসাধ্য কিছু নেই—কথাটার সত্যতা প্রত্যক্ষ বুঝে পেলেন তিনি। সেই শৃগালীর মতো ধূর্তা স্ত্রীলোকটা—সহস্র সতর্ক চক্ষুকে প্রতারিত করে

—অনায়াসেই বেরিয়ে এসেছিল আবার, পাটাসের ছাউনিতে গিয়ে মিলিত হয়েছিল তার প্রেমিক ও কামার্ত ক্রীতদাসের সঙ্গে—কাশীবাঈ-এর পূজনীয় স্বামী এবং বিস্তৃত মারাঠা সাম্রাজ্যের মহান অধিনায়কের সঙ্গে।

ধিক! ধিক!

মনে হ'লেও যেন সর্বাঙ্গ একটা নাম-না-জানা গ্লানিতে শির-শিরিয়ে ওঠে—কি যেন একটা ক্লেদাক্ত স্পর্শানুভূতি বোধ করেন কাশীবাঈ। সেই পুনর্মিলনের দিনে নাকি বাজীরাও সহস্রাধিক মুদ্রার মিষ্টান্ন বিতরণ করেছিলেন তাঁর সৈন্য এবং স্থানীয় প্রজাদের মধ্যে। ঘোড়ার ডাক বসিয়ে নাকি পুণার বিখ্যাত গোয়ালা বাড়ি থেকে 'শ্রীখণ্ড' আনিয়েছিলেন।

কিন্তু কাশীবাঈও অত সহজে হার মানবার পাত্রী নন। সিংহেরই যোগ্য সিংহিনী তিনি। সেদিন দেবর ও পুত্রকে নিয়ে তিনি নিজে সেই পাটাসের ছাউনিতে গিয়েছিলেন শানওয়ার ওয়াড়ার বন্দিনীকে দাবী করতে, কেড়ে আনতে। অন্য কেউ গেলে সম্ভব হ'ত না সেদিন, শুধু এই দুটি স্ত্রীলোকের জন্যই সমস্ত গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

পেশোয়াকে চরম অপমান থেকে রক্ষা করতে নিজে এসে ধরা দিতে হয়েছিল সেই শৃগালীটাকে। তারপরই এই ব্যবস্থা হয়েছিল, যে শানওয়ার ওয়াড়া প্রাসাদে একদা সর্বাধিক লক্ষণীয় ছিল মস্তানী-মহল ও মস্তানী-দরওয়াজা—মূল প্রাসাদ থেকে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন, উদ্যানের সুসজ্জিততম প্রান্তে অবস্থিত মস্তানী মহলে যাওয়ার ফটকটাই বহু মুদ্রা ব্যয়ে তৈরী করেছিলেন পেশোয়া—সেই প্রাসাদেরই ক্ষুদ্রতম প্রকোষ্ঠে, তিন হাত চওড়া ও পাঁচ হাত লম্বা—একটি খাটিয়ার মতো ঘরে, মস্তানী মহলের অধিষ্ঠাত্রী বাজীরাও-এর হৃদয়েশ্বরীকে পাঁচটি তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। আগে চাবি রেখেছিলেন রাধাবাঈ এবার একটি চাবি অন্তত সর্বদা মহিষী বা বালাজীর কাছে থাকবে—অর্থাৎ তাঁদের না জানিয়ে কোন কারণেই সে কারা-

প্রকোষ্ঠের লৌহ-কপাট উন্মোচিত হবে না—এই আদেশই দিয়েছিলেন কাশীবাঈ। ধূর্ত পশুকে খাঁচাতে চাবি দিয়ে রাখাই রীতি—এই সহজ নিয়মটায় আর ভুল করেন নি পেশোয়া মহিষী।

কিন্তু সত্যিই কি ভুল করেন নি কিছু?

আজ এই প্রথম—এই সাক্ষাৎ অনলবর্ষী উন্মুক্ত নীল আকাশের নিচে, তীর্থময়ী নর্মদার তীরে দাঁড়িয়ে তাঁর সমস্ত জীবন সমস্ত ইহকাল পরকাল সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্যের মালিক তাঁর স্বামীর চিতাশয্যার দিকে চেয়ে এই কথাটাই মনে হচ্ছে বার বার যে—হয়ত কোথায় একটা মস্ত বড় ভুলই হয়ে গিয়েছে তাঁর।

বহুদিন—মস্তানীকে দ্বিতীয়বার বন্দী করার আগে থেকেই আর দেখা হয় নি স্বামীর সঙ্গে। তারপর বলতে গেলে এই প্রথম দেখলেন কাশীবাঈ স্বামীকে।

অত সাধের নবনির্মিত শানওয়ার ওয়াড়া প্রাসাদ—দিল্লীশ্বরের ঈর্ষা উৎপাদনের ভয়ে যে প্রাসাদ নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে নিষেধ করেছিলেন ছত্রপতি শাহু—সেই ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদেও আর ফেরেন নি পেশোয়া বাজীরাও। জীবনের প্রচণ্ডতম ও উগ্রতম বাসনায় ব্যর্থ হয়ে, নিকটতম আপনজনদের দ্বারা প্রিয়তম ব্যক্তিটির সাহচর্যে বঞ্চিত হয়ে সে প্রাসাদে আর ফিরতে ইচ্ছা হয় নি তাঁর। ফিরলে অত সাধের প্রাসাদ তাঁর সাধকেই ব্যঙ্গ করত হয়ত। হয়ত লজ্জাটাই বড় হয়েছিল। এত বড় দুর্ধর্ষ মানুষটা দুটি স্ত্রীলোক, একটি বালক এবং একটি রুগ্ন তরুণ অনুজের কাছে পরাজিত ও অপমানিত হলেন—যে প্রাসাদে মহিষীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন নিজের প্রিয়তমাকে, সেই প্রাসাদেই আজ সে সাধারণ অপরাধিনীর জীবনযাপন করছে, খাঁচার মতো একটি ঘরে আজ সে বন্দিনী—তাঁর নিজেরই প্রাসাদে— ; একটি মাত্র আদেশে সে বন্দিদশা নিমেষে ঘুচে যাবার কথা ; অথচ তিনি এমন অসহায় যে সেই

আদেশটাই দিতে পারছেন না—এই অবিশ্বাস্য রকমের হাস্যকর অবস্থার মধ্যে তাঁর পুরাতন দাস-দাসী-অনুচরদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকার মতো লজ্জা আর কি আছে! তাদের কাছে মুখ তুলে কোন আদেশই আর কোনদিন দিতে পারতেন না যে তিনি। প্রতি মুহূর্তেই মনে হ'ত যে ওরা সবাই বিদ্রূপের চোখে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে—চোখের আড়ালে গেলেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে।...না, স্বামীর এ মনোভাব অনুমান করার মতো এটুকু বুদ্ধি কাশীবাঈ-এর আছে। তাই তিনি অনুরোধ ক'রেও পাঠান নি যুদ্ধক্ষেত্রের কঠোর জীবন থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে দুদিন বিশ্রাম ক'রে যাবার।

কিন্তু এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে, এই সামান্য ক'টা মাসে একটা মানুষের এত পরিবর্তন হ'তে পারে! সেইটেই যে কিছুতে বুঝতে পারছেন না তিনি। আজ সেই থেকে বর্তমানের আর সমস্ত প্রশ্ন ডুবে গেছে তাঁর মনে—সেই প্রথম এসে স্বামীর রুগ্নদেহের দিকে চাইবার সময়টি থেকে! এই কি তাঁর সেই সুন্দর স্বাস্থ্যবান স্বামী পেশোয়া বাজীরাও? না-না—নিশ্চয় এ আর কারও অর্ধমৃতদেহ ভুল ক'রে নিয়ে এসেছে ওরা। এ পেশোয়া নয়।...প্রথম দেখায় সেই প্রতিক্রিয়াই হয়েছিল তাঁর মনে। কিন্তু পরে, অনেক অভিজ্ঞান মিলিয়ে দেখে তবে বুঝতে পেরেছেন যে ভুল ওরা করে নি—তিনিই করেছিলেন।

কিন্তু এ কি-দেখলেন তিনি! এই চামড়ায় ঢাকা কঙ্কালটা, এই তাঁর মালিক—তাঁর স্বামী! সেই পেশোয়া বাজীরাও, যাঁর রূপ এবং কান্তির খ্যাতি শুধু এদেশে নয়—এদেশে তো পেশোয়া কোন পথ দিয়ে যাবেন শুনলে সে পথের দুপাশে পুরললনারা সমস্ত কাজ ফেলে এসে সকাল থেকে ঝরোকা বা গবাক্ষের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে—সুদূর হায়দ্রাবাদে নিজাম-উল-মুলুকের অন্তঃপুরেও পৌঁছেছিল। নিজাম তাঁর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব আলোচনা করবেন শুনে বেগমরা সকলে ধরে পড়েছিলেন নিজামকে—অন্তরাল থেকে সেই বিখ্যাত রূপবান

ব্রাহ্মণ মুখ্যমন্ত্রীকে দেখবেন বলে অনুমতি প্রার্থনা ক'রে। তাঁর রূপের খ্যাতি আরও দূর দিল্লীতেও গিয়েছিল নাকি—বাদশা সভা-শিল্পীকে পাঠিয়েছিলেন দূর থেকে বাজীরাও-এর চিত্র লিখে নিয়ে যেতে। তা নাকি নিয়েও গিয়েছিলেন সে শিল্পী। যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রার একটি ছবি—তেজী ঘোড়ার সওয়ার বাজীরাও, কিন্তু অশ্ববল্‌গা তাঁর হাতে নয়—ঘোড়ার পিঠেই পড়ে আছে, মাত্র পায়ের ইঙ্গিতে তাকে পরিচালনা করছেন তিনি, ভারী বর্শাখানা এমনভাবে কাঁধে ফেলা যে সম্পূর্ণ খোলা বর্শাও স্কন্ধচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে না—সেই অবস্থায় অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে দুহাতে ধরে ভুট্টা ছাড়িয়ে খেতে খেতে যাচ্ছেন বাজীরাও, অথচ দৃষ্টি তাঁর অগ্রে ও পশ্চাতে সেনাবাহিনীর দিকে সজাগ ও সতর্ক। সেই ছবি দেখেই নাকি বাদশা চিৎকার করে উঠেছিলেন –'এ যে সাক্ষাৎ শয়তান!···উজীর আপনি এখনই নিজামকে চিঠি লিখে দিন যে কোন শর্তে এর সঙ্গে সন্ধি ক'রে ফেলতে। এমন লোকের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কখনও জিততে পারব না আমরা!'

সেই কান্তির এই পরিণতি। সেই বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ এই কঙ্কালে পরিণত হয়েছে এই ক'মাসে!!

না, চোখের জল ফেললে চলবে না। এতগুলো লোকের কাছে এমনভাবে হার মানা চলবে না তাঁর।

তিনি অনুতপ্ত হ'লে, তাঁর চোখের জল পড়লে তাঁর দেবর ও পুত্র আর কোনদিন মাথা তুলে কারও দিকে তাকাতে পারবে না।

চোখের জল শাসন করেন কাশীবাঈ কিন্তু মনকে শাসন করতে পারেন না যেন কিছুতেই। এ কি হ'ল! এ তাঁরা কি করলেন! মন হাহাকার করতে করতে এই প্রশ্নই করে যায় শুধু।

এত যন্ত্রণা পেয়েছে লোকটা, এত আঘাত পেয়েছে—তা তাঁরা একবারও অনুমান করতে পারেন নি কেন, কেন খোঁজ করেন নি

ভাল ক'রে। কেন নিজে এসে জোর ক'রে প্রাসাদে নিয়ে যান নি, অথবা কেন কাছে থেকে এই বেদনার কিছুটাও অন্তত সেবার দ্বারা, মিষ্ট বাক্যের দ্বারা মুছে নেবার চেষ্টা করেন নি! এ কি দুর্বুদ্ধিতে পেয়ে বসেছিল তাঁকে! শেষে কি ভাবীকালের কাছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বামীর হত্যাকারিণী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন তিনি?

'মা'!

আবারও ডাকেন ত্র্যম্বকজী। এবার আস্তে, মৃদুকণ্ঠে। দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর নিবদ্ধ থাকলেও কাশীবাঈ যে বহু দূর চলে গিয়েছিলেন মনে মনে—সেটুকু বুঝতে পারেন ত্র্যম্বকজী। অথচ দিবাস্বপ্নের সময় সেটা নয়, আত্মবিশ্লেষণেরও নয়। অসহ্য হয়ে উঠেছে সকলকারই এই শারীরিক কষ্ট, মহামান্য পেশোয়ার মৃতদেহও পচে উঠতে শুরু করেছে, এই প্রখর রৌদ্রে চন্দন তৈলের অনুলেপনও কোন কাজ করছে না আর। অগুরু চন্দনের গন্ধ ছাপিয়ে একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

'মা!'

ত্র্যম্বকজীর ডাকে সম্বিত ফিরে পান কাশীবাঈ। চিন্তাসূত্রের খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন যেখানে সেখানেই ফিরে যান আবার।

মনে পড়েছে। সহমরণের প্রশ্ন তুলেছিলেন ত্র্যম্বকজী। সেই কথাটা ভাবতে ভাবতেই বহু দূর এসে পড়েছেন।

না, তিনি যেতে পারবেন না। যাওয়াই উচিত, বিশেষত জীবনের শেষ ক'টি দিন বিষময় ক'রে তুলে স্বামীর কাছে যে অপরাধ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত করতেও অন্তত যাওয়া উচিত ছিল সঙ্গে। ইহলোকের পাপ পরলোকে নিত্য অশ্রুজলে স্খালন করতে পারতেন। স্বামীর প্রতি আর কোন ক্ষোভ, কোন অভিমান নেই—আজ বরং তিনিই অপরাধী মনে করছেন নিজেকে। তবু মরা হবে না তাঁর এখনই। মরার কোন অধিকার নেই তাঁর। ছেলে এখনও বালক, তার

হাতেই হয়ত এই বিপুল সাম্রাজ্য শাসন, রক্ষা ও প্রসারের ভার পড়বে। ছেলের পিছনে সে সময় তাঁর থাকা দরকার, নইলে বড় অসহায় বোধ করবে সে নিজেকে। কে জানে পিতার এই শোচনীয় মৃত্যু দেখে তার মনে কোন অনুশোচনা দেখা দিয়েছে কিনা ইতিমধ্যেই। সেক্ষেত্রে তিনি যদি চলে যান—সমস্ত অপরাধের গুরুভার নিয়ে সে বিব্রত হবে, হয়ত সেও অসুস্থ হয়ে পড়বে। তিনি থাকলে সান্ত্বনা দিতে পারবেন, সাহস দিতে পারবেন, অভয় দিতে পারবেন।

আর যদি বালক বলে শাহু ছত্রপতি তার দাবী উপেক্ষা করেন, তাকে লঙ্ঘন ক'রে অপরকে অগ্রাধিকার দেন—তা হলেও কাশী-বাঈ-এর থাকা প্রয়োজন। অত সহজে তিনি ছেলের দাবী ছেড়ে দেবেন না, শেষ পর্যন্ত লড়বেন—ছেলের ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে যাতে সে বঞ্চিত না হয় তার জন্য চেষ্টা করবেন।

শুধু এই ছেলের প্রশ্নই নয়—আরও তিনটি ছেলে আছে তাঁর। বড়টিই তো বালক, এগুলি আরও ছোট, শেষেরটি জনার্দন পন্থ তো নেহাৎই শিশু। এদের শিক্ষা, এদের কর্মে ও সংসারে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বও আছে। চিমনজী আপ্পার ওপর যদি এই ভরসাটুকু করতে পারতেন তাহলেও আজ নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারতেন তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে। চিমনজী সৎ লোক, ধর্মভীরু, বীর। চিমনজী তাঁর ছেলেদের ঠকাত না। কিন্তু চিমনজী দুর্বল। চিমনজী রুগ্ন। তার মুখেও মৃত্যু-পাণ্ডুরতার ছায়া পড়েছে। আর কেউ না দেখলেও কাশীবাঈ দেখতে পাচ্ছেন। প্রত্যহ ঘুষঘুষে জ্বর হয় তাঁর, দেহ দিন-দিন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, এখনও যে যুদ্ধ করছে—সে শুধু একটা অভ্যাসে আর মনের জোরে। বোধহয় আর এক বৎসরও টিকবে না সে। এই অবস্থায় বৃদ্ধা শাশুড়ী এবং এই অপোগণ্ড শিশুদের ভার কার ওপর ছেড়ে যাবেন তিনি?

কাশীবাঈ মন স্থির ক'রে অথবা মনের কাছে জবাবদিহি শেষ

ক'রে স্থির দৃষ্টিতে চাইলেন ত্র্যম্বকজীর চোখের দিকে। শান্ত স্থির কণ্ঠেই বললেন, 'না ত্র্যম্বকজী, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবার দুর্লভ ভাগ্য আমার নয়। আপনি আপনার যা কাজ সেরে ফেলুন, মহামান্য পেশোয়ার সংকারে অযথা বিলম্ব করার আর প্রয়োজন নেই।'

'তাই হবে মা। যা আপনার আদেশ। আমি এখনই শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করছি। বালাজীকে তাহলে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি—'

ত্র্যম্বকজী ফিরে এসে চিতার পাশে দাঁড়ালেন। একজনকে ইঙ্গিত করলেন বালাজীকে ডেকে আনার জন্য।

উপস্থিত জনতার মধ্যেও ঈষৎ একটু চাঞ্চল্য জাগল। যা হোক এবার একটা কিছু হবে। শেষ হবে এতক্ষণের এই প্রাণান্তকর প্রতীক্ষা। চিতার চারপাশে প্রহরারত রক্ষীর দলও উশখুশ ক'রে উঠল, তাদেরও অসহ্য হয়ে উঠেছে, তারাও অব্যাহতি চাইছে এক মনে।

রক্ষীর দলে আরও একটু চাঞ্চল্য জাগল। চিমনজী আর বালাজী আসছেন। রক্ষী-বেষ্টনী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পথ করে দিল তাঁদের।

সেই দিকেই চেয়েছিলেন কাশীবাঈ। ছেলের জন্যই যেন বিশেষ একটু উদ্বেগ বোধ করছেন। ওর কিশোর মনে যে কত বড় আঘাত লেগেছে পিতার কঙ্কালসার দেহটা দেখে—তা তাঁর অবিদিত নেই।...

'কাশীবাঈ।'

অকস্মাৎ পিছন থেকে এই সম্মানহীন সম্বোধনে চমকে উঠলেন পেশোয়া মহিষী। চমকেই পিছন ফিরে চাইলেন। চেয়ে আরও চমকে উঠলেন।

পিছন থেকে ডাকছে তাঁকে মস্তানী! কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে রাক্ষসী। তাঁর সর্ব দুঃখের সর্ব সর্বনাশের মূল।

দেখা মাত্র যে প্রতিক্রিয়া হ'ল তা নিদারুণ ক্রোধের!

কী দুঃসহ স্পর্ধা! এখানে এসেছে—আবার তাঁকে নাম ধরে ডাকছে! সাহস তো কম নয়।

কে ছেড়েই বা দিল ওকে! কার এত দুঃসাহস যে তাঁকে না জানিয়ে—

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল যে তিনিই তো এ আদেশ দিয়েছিলেন। প্রহরিণী এসে যখন খবর দিল যে রুদ্ধদ্বারে মাথা কুটছে সে —শেষ দেখা পাবার জন্য আকুল হয়ে মিনতি জানাচ্ছে, গর্বিতা উদ্ধতা মস্তানী সামান্য ভিখারিণীর মতো দয়া প্রার্থনা করছে তাঁর কাছে—তখন তিনিই বলেছিলেন ছেড়ে দিতে, চাবিও দিয়ে দিয়েছিলেন। এখন তো আর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না—আর কেন!

মিছিমিছি শুদ্ধমাত্র নিষ্ঠুরতার আনন্দে নিষ্ঠুর ব্যবহার ক'রে যাওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন!

তাই বলে এত কাছে এসে এইভাবে তাঁকে সম্বোধন করতে এতটুকু সঙ্কোচ হ'ল না ওর! এ কি অসহনীয় ধৃষ্টতা!

আর, আর এসব কি— ?

আরও বিস্ময় বোধ করেন তিনি ওর দিকে চেয়ে।

এ কি বেশ ওর!

এ তো বৈধব্যের কাল বলতে গেলে। বাজীরাও স্পর্ধা ক'রে বলতেন—'মস্তানী আমার ধর্মপত্নী—ঈশ্বরের সামনে দেবতার সামনে ওকে গ্রহণ করেছি স্ত্রী বলে'—তা এই বুঝি তার নিদর্শন! এই কি ওদের বৈধব্যের বেশ? কে জানে, বিজাতীয়া বিধর্মী তার ওপর নর্তকী—ওদের ধর্ম ওদের রীতিনীতিই বুঝি আলাদা!

তবু একটা মনুষ্যত্বের প্রশ্নও তো আছে। আর সেটা তো মানুষের সর্ব স্তরেই এক বলে জানেন কাশীবাঈ। লোকলজ্জা, লোকাচার এগুলোও তো অন্তত মানতে হয় সমাজে থাকতে গেলে।…সদ্য-বিধবা সদ্য বিগতদয়িতের এই বেশ! সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সুবর্ণ-সূত্র-নির্মিত বেনারসী তাসার পোশাক তার পরনে, আপাদ-মস্তক মণি-মাণিক্যমণ্ডিত, সেই প্রখর দিবালোকে সে রত্নালঙ্কারের দীপ্তি প্রজ্বলিত অগ্নিকণার মতোই চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে

বার বার। অলঙ্কার একটিও বাদ দেয় নি বোধহয় সে, কেয়ুর, কঙ্কন, চন্দ্রহার, মুক্তার সপ্তলহরী থেকে পায়ের নূপুর অঙ্গুলিত্র পর্যন্ত কিছুই ভুল হয় নি ওর। একেবারে নব-বধূর বেশ! তবে কি ওর ভয় হয়েছে যে এগুলো এবার কাশীবাঈ কি বালাজী কেড়ে নেবেন, তাই সর্বাঙ্গে বহন ক'রে পাহারা দিতে চায়?

ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নেন কাশীবাঈ।

মুখ ফিরিয়েই প্রশ্ন করেন, 'কী চাই? আরও কি চাই তোমার এতেও কি সাধ মেটে নি!'

হয়ত বলা উচিত ছিল না কথাগুলো। বলে নিজের মর্যাদার হানি হ'ল হয়ত। তবু নিজেকে সামলাতেও পারলেন না কাশীবাঈ অন্তরের জ্বালাটা আপনিই বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

'সাধ!' মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ হাসিতে যেন ফেটে পড়ে মস্তানী, সে হাসি সেই স্থানকালের সঙ্গে এমনই বেমানান যে, উপস্থিত শ্রোতাদের কানে তা চাবুকের মতোই আঘাত করে। মস্তানী বলে, 'সাধ তো তোমার মেটবার কথা গো পট্ট-মহাদেবী! আমার সাহচর্যে, আমার আসঙ্গে পেশোয়ার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলেই না তোমরা—তাঁর স্ত্রী, তাঁর মা, ছেলে ভাই সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠে আমাকে সরিয়ে দিয়েছিলে! অন্তত সেই কথাই তো বলেছিলে তখন, সেই অজুহাতই দেখিয়েছিলে। শরীর ভাল হয়েছে তো তাঁর, সুস্থ হয়ে উঠেছেন তো?...তাকিয়ে দেখেছ স্বামীর দেহটার দিকে মহিষী কাশীবাঈ—কি অবস্থা হয়েছে তাঁর অমন সুন্দর কান্তি অটুট স্বাস্থ্যের? আমাকে তো সরিয়ে এনেছিলে তাঁর কাছ থেকে তাঁর সেবা থেকে; কৈ, সে স্থান পূর্ণ করতে তো কাছে [illegible] পারো নি! সে সাহসে বোধহয় কুলোয় নি—না? নাকি প্রবৃত্তি হয় নি অমন স্বামীর সেবা করবার?'

আবারও হাসে মস্তানী। চাপা লঘু হাসি, তবু সে হাসি যেন কানের মধ্য দিয়ে বুকের বহু দূর পর্যন্ত কাটতে কাটতে যায়।

শীবাঈ কোন উত্তর দিতে পারেন না চেষ্টা ক'রেও। বোধহয় াহস আর স্পর্ধায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

গান কাশীবাঈ, আমার জন্য আর বিব্রত হ'তে হবে না, দর কণ্টক বিদায় হচ্ছে এবারে। জীবনেই তোমার অধিকার, র্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার সাহসও তোমার নেই—তা ছাড়া ইহ- সংস্কার আর বিধি-নিষেধের পরলোকে কোন মূল্য নেই, মন্ত্রপড়া অধিকারের দাবী পেশ করতে সেখানে যেতে পারবে লও লাভ হবে না। যেখানে জাত নেই, ধর্ম নেই, বিবাহের প্রশ্ন সেইখানেই আমি যাচ্ছি আমার মালিকের পাশে, প্রভুর পাশে াঁড়াতে। সেখানেই আমাকে তাঁর প্রয়োজন বেশী। এখানে ছিল, রাজকর্ম ছিল—সেখানে শুধু ভালবাসার রাজ্য। ব আমিই তাঁর রানী। সেখানে আমাদের মিলনে কোন বাধা না; ঈশ্বরের রাজত্বে তাঁর মঙ্গলময় আশীর্বাদে ঘেরা বেহেস্তে আমাদের নিত্য বিহার। কোন ঈর্ষাতুর স্ত্রী-পুত্র-জননীর নই যে আমাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, সরিয়ে তাঁর পাশ থেকে।......কাশীবাঈ, জ্ঞানত কোন পাপ করি নি, আমাকে বহুবার গণিকা বলে গাল দিয়েছ—কিন্তু কৈশোরের ন্মেষে যাঁকে প্রভু বলে জেনেছি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে নে স্থান দিই নি, ঈশ্বর সাক্ষী। মান- ও প্রাণরক্ষাকারী কে পিতাজী পুত্র বলে স্বীকার সম্বোধন করেছিলেন, উপকারের বদলে নিজের অন্তঃপুরের শ্রেষ্ঠরত্ন হিসেবেই ন্টপহার দিয়েছিলেন, পুত্রকে প্রতারণা করেন নি, কোন া না। তবু যদি অজ্ঞাতসারে কোন পাপ কোনদিন স্পর্শ তো সেটুকুও আগুনে পুড়িয়ে অগ্নিশুদ্ধা হয়ে যাবো তাঁর দাঁড়াতে, আশাকরি তোমাদের ভগবান গণপতিরও ন: তাতে!

নকেই মুখের ভাষা আর মনের জোর খুঁজে পেয়েছে।